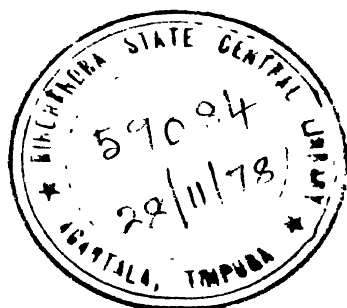
আত্মচরিতে সমাজচিত্র

ভারত খণ্ড প্রথম পর্ব

দক্ষিণারঞ্জন বসু



পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন ● কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৯৫৯২

প্রথম প্রকাশ—পয়লা বৈশাখ, ১৩৫৫

প্রচ্ছদ—প্রভাত কর্মকার

মূল্য : বারো টাকা

মুদ্রণ :
দি নিউ কমলা প্রেস
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
৫৭/২, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৫৭৩৯

উৎসর্গ

সাহিত্যাচার্য
ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)-এর করকমলে

এই লেখকের অন্যান্য বইয়ের কয়েকখানি

শতাব্দীর সূর্য (আলোচনা)
ছেড়ে আসা গ্রাম
সংস্কৃতির ধর্ম
বিদেশ বিভুঁই (ভ্রমণ কাহিনী)
আরও সূর্যের কাছে (কবিতা)
অলক্ষ্যে বিকেল
আশা যখন বৃষ্টি
পদ্মা আমার গঙ্গা আমার
সাঁকো প্রায় পেরিয়ে
সন্ধ্যারতি (গানের বই)
পরম্পরা (উপন্যাস)
রোদ জল ঝড়
বনহরিণীর সংসার
লাইলাক একটি ফুল
এক আকাশে অনেক তারা
প্লাবন
কদম কদম
জ্বালা শুধু জ্বালা
সুভদ্রার ভিটে (গল্প)
একটি পৃথিবী একটি হৃদয়
জীবন যৌবন
সাগর রানীর দেশে (কিশোর উপন্যাস)
কাকতাড়ুয়া
হট যাও হার্মাদ
কায়াহীনের কবলে
পেনাং-এর পাহাড়ে
যুদ্ধে গেলেন গিয়ং
ভিয়েতনামের রূপকথা (ছোটদের গল্প)
ঈশ্বরের সেনাপতি
উপকথার উপসাগর

ভূমিকা

ঐতিহাসিক মাত্রই কোনো না কোনো ইতিহাস-চেতনা ও ভাবনাদ্বারা, কোনো না কোনো জীবনধ্যান ও আদর্শদ্বারা চিহ্নিত, তা জ্ঞাতেই হোক বা অজ্ঞাতেই হোক। কেউ ইতিহাসের নামে রাজবংশাবলী রচনা করেন, কেউ বা রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ক্রিয়া কর্মের ; কেউ বা আচার্য পরম্পরায় ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবনী ও কৃতিকথা বর্ণনা করেন, কেউ বা একই কর্ম করেন একান্ত অর্থ ও ধনসম্বলগত, বস্তু সম্পর্কগত জীবন-বর্ণনায়। কেউ কেউ বা সমাজের কথাও বলেন, কিন্তু সে-সমাজ জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, বর্ণাশ্রমধৃত সমাজ, সংস্কারাশ্রিত, পুরোহিত-শাসিত সমাজ, অর্থাৎ যে সমাজের কথা তাঁরা বলেন সে-সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে সমাজ, সমগ্র সাংসারিক জীবনধৃত, দেশকালধৃত মানুষের সমাজ নয়। যেহেতু এই দীর্ঘজীবনের সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভাবনা নিয়েই আমার কেটেছে, সেইহেতু একটা কমবেশি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস-চেতনা ও ভাবনাও আমার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সেই চেতনা ও ভাবনায় মানুষের সমস্ত ইতিহাসই তার সমাজেতিহাস। একান্ত একক ব্যক্তিমানুষ কেউ কখনও ছিল না, এখনও নেই, থাকা সম্ভবই নয়। সমাজবদ্ধ মানুষেরই ইতিহাস আছে, একান্ত একক ব্যক্তি মানুষের কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না, কারণ তেমন মানুষ স্বপ্নকল্পনার বাইরে বিরাজ করে না। সেই সমাজবদ্ধ মানুষের রাজা ও রাজবংশাবলী, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ইতিহাস, অর্থগত, কামগত, একান্ত বস্তু-সম্পর্কগত ইতিহাস, সমস্তই সামাজিক ইতিহাস। আমার ইতিহাস-ভাবনায় সমাজেতিহাস ছাড়া দেশকালধৃত সমাজধৃত মানুষের আর কোনো অর্থবহ ইঙ্গিতময় ইতিহাস নেই, থাকতে পারে না।

ঠিক এই কারণেই সমাজেতিহাস, বিশেষভাবে ভারতীয় ও বাঙ্গালীর সমাজেতিহাস সম্বন্ধে যখনই, যেখানেই যা কিছু কেউ লেখেন বা বলেন, অবশ্যই কিছুটা অন্তত যুক্তিসাধ্য সাক্ষ্যপ্রমাণানুযায়ী, আমি আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে সে-সব রচনা পড়ি এবং তার ভেতর থেকে যতটা আত্মসাৎ করতে পারি, অবশ্যই আমার চেতনা-ভাবনা-বুদ্ধি-ভাবাদর্শানুযায়ী, তার চেষ্টা করি, লেখক-পরিবেশক যিনিই হোন, ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক নির্বিশেষে।

বন্ধুবর দক্ষিণারঞ্জন বসু মশায়কে আমি জানি বহু বৎসর যাবৎ কিন্তু জানি প্রধানত সার্থক সাংবাদিক রূপে। তিনি যে আবার ভারতবাসীর ও বঙ্গবাসীর সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু এ-তথ্য আমার জানা ছিল না। সেইহেতু এই বর্তমান গ্রন্থের ছাপা ফর্মাগুলি যখন আমার হাতে এলো, একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ নিয়ে, তখন একটু সানন্দ বিস্ময় বোধ না করে পারিনি। বইখানা পড়তে পড়তে বিস্ময় পরিণত হ'লো বিমুগ্ধতায়; এ-বিমুগ্ধতা ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য রস জনিত। "আত্মচরিতে সমাজচিত্র" গ্রন্থটি ঠিক যথার্থ ইতিহাস নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু আমাদের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান এতে নেই, একথা আমি কিছুতেই বলতে পারিনে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আত্মচরিতোক্ত নানা প্রসঙ্গের আশ্রয়ে লেখক অতীতের চলমান সমাজ-জীবনের সজীব আস্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের কালে এবং তার ফলে মৃত অতীত নূতন জীবন পেয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জন বাবু তাঁর গ্রন্থটি দাঁড় করিয়েছেন জীবনচরিত জাতীয় সাহিত্য-গ্রন্থের উপর নয়, আত্মচরিতের উপর এবং সেই আত্মচরিত সর্বত্র প্রত্যক্ষ আত্মচরিত নয়, বহুক্ষেত্রেই তা পরোক্ষ উপাদান থেকে আহৃত। এই সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদান থেকে আমাদের অতীত সমাজের জীবনযাত্রার বিচিত্র বহমান রূপ তিনি ধরতে চেষ্টা করেছেন, অপূর্ব নির্মাণক্ষমা বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে এবং এমন সুকৌশলে যাতে তথ্য ও যুক্তির একান্ত বিকৃতি না ঘটে। সর্বত্র তিনি সফল হ'য়েছেন, বলিনে, তবু স্বীকার করতে বাধা নেই, সাধারণভাবে তাঁর বর্ণনা ও বিবরণ আমাদের স্বীকৃতি দাবি করে।

আমার ধারণা, যাঁরা একই সঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্যের আস্বাদ পেতে চান তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ আদর ও মর্যাদা পাবে।

নীহাররঞ্জন রায়

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

বছর চব্বিশ আগে বাঙালীর সমাজ বিবর্তন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছে হয়েছিল। সে ইচ্ছে পূরণে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কাজও শুরু করেছিলাম এবং লেখায়ও হাত দিয়েছিলাম। হঠাৎ বিদেশ থেকে এক আমন্ত্রণ-পত্র এলো ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। কয়েকমাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষে দেশে ফিরি আমি পরের বছর জানুয়ারি মাসে। ফিরতি পথে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশও ঘুরে আসি। তখনই আমার সুযোগ হয় পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত মহাকবি গ্যেটের কর্মস্থল ফ্রাঙ্ক-ফুর্ট-অন-মেইন শহরে গ্যেটে ভবন ও গ্যেটে মিউজিয়ম পরিদর্শনের। ঐ ভবনে বসেই কবি তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'ফাউস্ট' ও অপর কয়েকখানি বই রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত সেই ভবনটিকে ঠিক পূর্বের মতো করেই নির্মাণ করে নেওয়া হয়েছে এবং তার পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে গ্যেটে মিউজিয়াম যেখানে সযত্নে রাখা হয়েছে কবির সমস্ত গ্রন্থের কপি ও তাদের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্যেটের জীবনী ও সাহিত্যের ওপর লেখা বিবিধ রচনা।

অন্য কোনো দেশের ভাষা জানা না থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই মিউজিয়ামের ইংরেজি গ্রন্থ-বিভাগেই সময় কাটছিলো। হঠাৎ চোখে পড়লো একখানি বই 'লাইফ এ্যাণ্ড ট্রুথ'—জার্মান ভাষায় লেখা গ্যেটের আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ। পড়তে খুব ইচ্ছে হলো। মিউজিয়ামে বসেই বইটির অনেকটা গভীর আগ্রহে পড়ে ফেললাম। কবির কালের জার্মান সমাজের চিত্র কী সুন্দরই না উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর আত্মকথায়। সে সব বিবরণ পড়তে পড়তে বার বার একটি প্রশ্ন আমার মনকে কেবলি আলোড়িত করছিল—শুধু বাঙালীর নয়, সমগ্র বিশ্ব-মানব সমাজের বিবর্তন বিশ্লেষণ করে একখানি মহাগ্রন্থ রচনায় হাত দিলে কেমন হয়? সেই চিন্তাই আমায় যেন পেয়ে বসলো। কিন্তু এত বড়ো কাজ আমাকে দিয়ে কি সম্ভব? মন যেন বললে, বিশ্বের প্রধান প্রধান আত্ম-চরিতগুলি পড়ার সুযোগ করে নিতে পারলে কেন তা সম্ভব হবে না? হ্যাঁ, বিশ্বের মহান লেখকদের আত্মকথাকে ভিত্তি করেই আমি পর পর এক একটি দেশের সমাজচিত্র কথায় এঁকে যেতে থাকবো স্থির করলাম। আমার অসম্পূর্ণতা পূরণ করবেন ভবিষ্যতের কোনো লেখক বা লেখকেরা, এই হলো আমার সিদ্ধান্ত।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের নামও ঠিক করে ফেললাম পরদিন স্বদেশ-যাত্রার প্রাক-মুহূর্তে। নাম ঠিক হলো 'আত্মচরিতে সমাজচিত্র'। কিন্তু কোন দেশের আত্মচরিত নিয়ে আমি বিশ্ব-মানবের সমাজচিত্র রচনা শুরু করবো? এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলো স্বদেশমুখী বিমান পথে এবং ঐ বিমানে বসেই আমি একটি পরিকল্পনাও স্থির করে ফেললাম। বিপ্লবের পর সমাজ-রূপের চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটেছে রাশিয়ায়। কাজেই সে দেশের কবি-সাহিত্যিকদের আত্মচরিতের ভিত্তিতে রুশ সমাজ-জীবনের রূপরেখাই প্রথমে আঁকা উচিত হবে বলে সেভাবে পর পর একটি সূচীও তৈরি করে ফেলা হলো। সেই অনুযায়ী গ্রন্থাদি সংগ্রহে উদ্যোগী হলাম এবং আত্মজীবনী ও দিনলিপি জাতীয় বইসমূহ পড়ে নোট নেওয়ার কাজও শুরু করলাম। মার্কিণ এবং ইয়োরোপীয় লেখকদেরও অনেকের আত্মকথা পেতে থাকলাম এবং এ ধরণের সব বইকেই উপন্যাসের চাইতেও আকর্ষণীয় বলে মনে হতে লাগলো। 'যুগান্তর সাময়িকী'তে বৎসরাধিক কাল ধরে রুশ সমাজ বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিত্র ১৯৬১ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকলে এই পরিকল্পনা নানা মহল থেকে অভিনন্দিত হতে থাকে। কবি পুশকিন থেকে শুরু করে ইলিয়া এরেনবুর্গ পর্যন্ত মনীষী রুশ লেখকদের আত্মকথার ভিত্তিতে রাশিয়ার সমাজ-রূপের বিবর্তন বিশ্লেষিত হলে সেই রচনাবলীকে উচ্চ প্রশংসা জানানো হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কারে পুরস্কৃত করে। এর পরেই একই ধারায় 'যুগান্তরে' আমেরিকা ও ইয়োরোপের কবি-সাহিত্যিকদের আত্মচরিতের পটভূমিকায় মার্কিন ও ইয়োরোপীয় দেশগুলির সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন প্রবাহকে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাই। এক বছরের বেশি কাল ধরে আত্মচরিতের ভিত্তিতে মার্কিণ সমাজধারা সম্বন্ধীয় লেখা লিখে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীর আত্মচরিতকারদের দৃষ্টিতে দেখা তাঁদের নিজ নিজ দেশের সমকালীন সমাজরূপ ব্যাখ্যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আলোচনা করতে থাকি। সে সময়েই সাপ্তাহিক 'অমৃতে' আমি ভারতখণ্ডের লেখাও আরম্ভ করি।

একের পর এক মহৎ লেখকদের আত্মকাহিনী পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছে, যে কোনো কালের কথা সেকালের মনীষীদের আত্মকথায় যেরূপ সার্থক ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায় তেমন আর কিছুতে নয়। দেশ-বিদেশের যে সব মনস্বী ব্যক্তি আত্মজীবনী লিখে রেখে গেছেন তাতে আমরা শুধু তাঁদেরই যে পরিচয় পাই তা নয়, তাঁদের নিজ নিজ কালের সমাজেরও ইতিহাস জানবার

সুযোগ পাই। রুশোর 'আত্মস্বীকৃতি' যেমন তাঁর কালের ফরাসী সমাজকে চিনতে আমাদের সাহায্য করে তেমনি কবি পুশকিনের আত্মকথা বা ঋষি টলস্টয়ের দিনলিপি পড়ে আমরা জারের আমলের রুশীয় সমাজের সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। ঠিক তেমনি করেই মার্কিন কবি-দার্শনিক এমার্সন বা ইংরেজ কবি বায়রণের আত্মচরিতেও আমরা যথাক্রমে তাঁদের যুগের আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সামাজিক চিত্র পেয়ে থাকি তাঁদের নিজ নিজ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রাচীন ভারতে অবশ্য আত্মচরিত রচনার রীতি তেমন ছিল না, তবুও বিশ্বের প্রাচীনতম আত্মকথা হিসাবে গীতার উল্লেখ করা যেতে পারে কারণ বহু শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের কথা বলেছেন। দূর অতীতের কোনো কোনো ভারতীয় কবি জনক-জননী ও জন্মগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থ-প্রস্তাবনায় উল্লেখ করলেও সেকালে আত্মপ্রচার নয়, আত্মঘোষণার সংযম পালনই ছিল কবিকুলের নীতি। তারই ফলে কালিদাসের মতো মহাকবির বিস্তৃত জীবনী আমরা সংগ্রহ করতে পারি না। কবি চণ্ডীদাস নিয়েও বিভ্রান্তি ঘটে আসছে। কোনো কোনো সমসাময়িক বা পরবর্তী কবি আত্মবিলোপ ঘটিয়ে চণ্ডীদাস নামের অন্তরালে আত্মলীন হয়ে যাওয়ায়। প্রকৃত ইতিহাস ও আত্মচরিতের মতো প্রকৃত দলিলের অভাবেই দূর অতীতের ভারত আজও আমাদের কাছে অনেকাংশেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন

ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রবর্তিত হলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলমান শাসকদের মধ্যে আত্মজীবনী রচনার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পাঠান সুলতান এবং ভারত বিজয়ের পর সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি অনেক বাদশাহই আত্মচরিত প্রণয়ন করে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন। মুঘল সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরি' এবং জাহাঙ্গীরের আত্মকথা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি' ইত্যাদি আত্মজীবনীগুলি বাস্তবিকই সুলিখিত। মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা, একদার ভারত-বিজেতা তৈমুরের 'মালফুজাত-ই-তৈমুরা'ও একখানি নামী আত্মকাহিনী। আকবরের অনুরোধে বাবর-কন্যা ও হুমায়ুন-ভগ্নী গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন-নামা' রচনা করেছিলেন। এসব গ্রন্থ থেকে আত্মজীবনীকারদের সম্বন্ধেই যে সবিশেষ জানা যায় তা নয়, তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থারও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি মুঘল মহিলা মহলেও আত্মকথা লেখবার একটা অনুপ্রেরণা দেখা দিয়েছিল।

শাহ্‌জাহান-নন্দিনী জাহানারা বেগমের মনোগ্রাহী আত্মচরিতখানা তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পাঠান সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলকের আত্মজীবনী এবং তার সঙ্গে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস প্রভৃতির আত্মচরিতমূলক রচনাবলী মিলিয়ে পড়লে সেকালের ভারত বিশেষ করে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থার মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যে অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্যের আত্মচরিতাংশে সে চিত্র আরো স্পষ্ট।

হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারতের প্রধান প্রধান আত্মচরিতকথার ভিত্তিতে প্রথমেই আমার পূর্ব পরিকল্পিত 'আত্মচরিতে সমাজচিত্র' সিরিজের 'ভারতখণ্ড প্রথম পর্ব' গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হলো, এর পরেই প্রকাশিত হবে 'ভারতখণ্ড দ্বিতীয় পর্ব' যার মধ্যে থাকবে ইংরেজ আমলের রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের তারাশঙ্কর পর্যন্ত লেখক-মনীষীদের আত্মকথার আলোয় আমাদের দেশের সমাজ-রূপের বর্ণনা। তারপর একে একে প্রকাশিত হবে রুশ খণ্ড, আমেরিকা খণ্ড, ইয়োরোপ খণ্ড, এশিয়া খণ্ড এবং সর্বশেষে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া খণ্ড একত্রে।

বর্তমান গ্রন্থ রচনায় আমি সাহায্য নিয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং সাহায্য পেয়েছি পরম প্রীতিভাজন ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য ও ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রর কাছে। ডক্টর ভট্টাচার্য ও ডক্টর মিত্র ধন্যবাদ প্রত্যাশী না হলেও তাঁরা আমার একান্ত ধন্যবাদার্হ এ গ্রন্থ ব্যাপারে আমায় সাহায্যের জন্যে।

সমাজ-ইতিহাস বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দেওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ ও অনবধানতা জনিত কিছু ভুল-ত্রুটির একটি শুদ্ধিপত্র গ্রন্থশেষে সংযোজিত হলো। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এর আর প্রয়োজন হবে না।

৬৪/১৩ বেলগাছিয়া রোড,
কলকাতা-৭০০০৩৭

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সমাজ চিত্রণে আত্মচরিত

আপন কথাই স্বভাবত সব আত্মচরিতের মূল উপাদান। কিন্তু আমিত্বের অনুভূতিই যেহেতু আত্মজীবনী রচনার প্রেরণা এবং কোনো 'আমি'ই যেহেতু সাধারণত সমাজ-বহির্ভূত নয়, তাই প্রত্যেকটি আত্মচরিতেই সমকালীন সমাজ-রূপ কিছুটা প্রতিবিম্বিত হতে বাধ্য। সেদিক থেকেই সমাজবিবর্তন তথা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনায় আত্মজীবনীর অবদান অসামান্য।

এই পৃথিবীতে যেখানেই আছে প্রাণের লীলা, সেখানেই আছে সুখ-দুঃখের চেতনা কিন্তু শুধু মানুষের মধ্যেই আছে আমিত্বের অনুভূতি, আপন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা। প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে যে যন্ত্রের মতো সে বাইরের শক্তি দ্বারা চালিত নয়। সে নিজেকে অন্তত কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তরঙ্গতাড়িত তৃণের মতো সে ভেসে চলে না, আপন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সে নিজেকে কিছুটা গড়ে তুলতে পারে। দর্শনের ভাষায় মানুষ 'free, self-determining, self-regulating being' এবং এই কারণেই মানুষ অন্তত অংশত নিজের ভাগ্যবিধাতা। তাইতো ভগবান তথাগত প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, 'হে আনন্দ, আত্মদীপ হয়ে বিহার কর, অনন্যশরণ হয়ে বিহার কর।' বুদ্ধের প্রধান উপদেশও তাই—প্রত্যেক মানুষই দৃঢ় প্রযত্নের দ্বারা নিজের উদ্ধার সাধন করতে পারে।

আমরা জানি প্রতিটি মানুষই এক-একটি ব্যক্তি, অর্থাৎ অনুবিশ্ব (Microcosm)—সৃষ্টিবিচিত্রার এক-একটি বিশেষ প্রকাশ। পরিবার-পরিজন, স্বদেশবাসী ও মানবজাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েও সে আর সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যের চেতনা থেকেই জাগে তার আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা। সে আপন মনের খেয়ালে সৃষ্টি করে, নব নব সত্যকে সে আবিষ্কার করে, সময়-সৈকতের তীরে পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে যেতে চায়।

যখন কারো মনে এই আত্মসচেতনতা তীব্রভাবে দেখা দেয়, তখনই তা দম্ভ বা আত্মাভিমানের রূপ গ্রহণ করে। এই আত্মাভিমান, আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা কোনো কোনো মানুষের মতো আবার কোনো কোনো জাতির জীবনেও দেখা দিতে পারে। আর যে জাতি যে পরিমাণে আত্মসচেতন, সেই পরিমাণে সে উন্নতিশীল। (অবশ্য এ-কথাও সত্য যে, মাত্রাতিরিক্ত জাতিগত আত্মাভিমান বিপর্যয়েরও কারণ হতে পারে। হিটলারের জার্মানী এর উদাহরণ।)

প্রধানত এই আত্মচেতনতাই 'প্রাগ্রসর' জাতিদের মধ্যে আত্মচরিতকথার প্রাচুর্যের কারণ। ইয়োরোপ, আমেরিকায় বহু মনস্বী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মতো অনেক অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত ব্যক্তিও আত্মচরিত রচনা করেছেন। (আমাদের দেশে এই ধরণের ঘটনা বিরল। তবে এ বিষয়ে একালের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বিখ্যাত বলে আত্মচরিত লেখেন নি, Autobiography of an unknown writer লিখেই বিখ্যাত হয়েছেন।)

আগেই বলা হয়েছে, আত্মচরিত রচনার মূলে থাকে প্রধানত আত্মপ্রকাশের বা আত্মগৌরব প্রচারের আকাঙ্খা। মিল্টনও অনেকটা সে সুরেই বলেছেন, যশোলিপ্সা মহৎ মনের শেষ দুর্বলতা (The last infirmity of a noble mind)। কিন্তু যাঁর মধ্যে কিছুমাত্র আত্মাদর আছে, তাঁর পক্ষে যশোলিপ্সা বা অমরতা লাভের আকাঙ্খা থাকা স্বাভাবিক। আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্রেও বলা হয়েছে, 'বিপদে ধৈর্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা, সভায় বাকপটুতা, যুদ্ধে বিক্রম, যশে অভিরুচি এবং শাস্ত্রে আসক্তি—এ সকল এই মহাত্মাগণের প্রকৃতসিদ্ধ।' মহাপুরুষেরা অবশ্য বলে থাকেন যে, অহংকারকে বিসর্জন দাও, আর ভগবানের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ কর; কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সংসারে অনেক সৎকার্যের মূলেই রয়েছে যশোলিপ্সা।

তবে শুধু যশোলিপ্সাই যে আত্মজীবনী রচনার একমাত্র মূল উৎস এ-কথা বলা বোধহয় ভুল। অনেকে অন্যান্য নানাকারণেই আত্মকথা লিখতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। আমাদের দেশের কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করেই তা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী শেষ-বয়সে যে আত্মকথা রচনা করেছিলেন তা নিতান্তই বন্ধুজনের অনুরোধে। আবার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' মাসিকপত্রের অনুরোধে রচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আছে একটি সুগভীর আত্মোপলব্ধির প্রকাশ। সেখানে হয়তো ধর্মীয় প্রচারেরও কিছুটা উদ্দেশ্য ছিল। আবার অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' সম্পূর্ণ অন্য প্রেরণায় লিখিত—শিল্পীর খেয়ালই তার উৎস। বিদেশের দিকে তাকালে অনেক আত্মচরিতকারের কথায় বিস্মিত হতে হয়। আত্মকথা রচনার কারণ হিসেবে ডারউইন বলেছেন যে, নিজের কথা লিখতে তিনি পুলক বোধ করতেন এবং এদ্বারা হয়তো তাঁর সন্তানেরা এবং তাঁর সন্তানের সন্তানেরা উপকৃত হতে পারে। এ কি সত্যি বিস্ময়কর নয়?

একথা ঠিক যে মানুষ আপনাকে আপনি যতটা জানে, অপরে ততটা জানে না। মানুষ যেসব কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে তা

থেকে তার অন্তরলোকের অতি সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায়। সেইজন্যে কোনো মানুষেরই যথার্থভাবে সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচিত হতে পারে না। তবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা জীবনচরিত রচনায় সাফল্যলাভ সম্ভব। চিন্তাশীল মানুষ অপরের মনের অন্তঃস্থলের কোনো কোনো অংশে ক্ষীণ আলোকপাত মাত্র করতে পারেন। কিন্তু মানুষ তো নিজেকে জানে, নিজের গভীরে তো সে ডুব দিতে পারে। তাই মহৎ লোকেদের আত্মকথার ওপর অনেকেই পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে থাকেন। তা হলেও পৃথিবীর সব মনস্বী ব্যক্তিই যে সমস্ত আত্মচরিতকে ষোলো আনা মর্যাদা দিয়ে থাকেন তা নয়। তথাপি শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী মাত্রেরই ত্রিবিধ মূল্য অবশ্যস্বীকার্য—সাহিত্যিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক তথা ঐতিহাসিক মূল্য।

পাশ্চাত্য দেশে এমন অনেক আত্মচরিত রচিত হয়েছে যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু আত্মচরিত রচনা সহজ কাজ এমন ধারণা ভুল। এ ক্ষেত্রে আমাদের অধিকারী ভেদ মানতে হবে। আত্মজীবনী লেখা একপ্রকার অতি নিপুণ শিল্পকর্ম। আত্মপ্রচারের বাসনা যাঁদের উগ্র তাঁরা আত্মচরিত রচনা করে সাহিত্যিক গৌরব অর্জন করতে পারেন না। যাঁরা নিজেকে অপরের সামনে দেবতা বলে প্রতিপন্ন করতে চান অথবা সচেতনভাবে লোকশিক্ষক বা প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁদের আত্মকথা আমাদের মনকে সত্যই পীড়িত করে। রুশোর 'আত্মস্বীকৃতি' (কনফেশনস্) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি দম্ভবশত নিজের দোষগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন। এ অভিযোগ সত্য হোক বা না হোক, তাঁর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'আত্মচরিত লেখার অধিকার শুধু তাঁরই আছে যিনি অহংকারকে জয় করতে পারেন এবং লোকের নিন্দা ও প্রশংসা যাঁকে বিচলিত করতে পারে না'। এ নিঃসন্দেহে খুবই খাঁটি কথা।

এই প্রসঙ্গে রুশোর আরো একটি উক্তি স্মরণীয়। তাঁর আত্মকথা সম্পর্কে অতি-রঞ্জনের অভিযোগ উঠতে পারে জেনেই তিনি বলেছেন, 'আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। তবু যদি আমার লেখার বিপরীত কারো কিছু জানা থাকে এবং হাজারবারও যদি তা প্রমাণ করা হয় তবু সেই জানাকে আমি মিথ্যা বলবো, প্রতারণা বলবো; এবং সে ব্যক্তি আমার জীবিতাবস্থায় যদি সে-বিষয়ে অনু-সন্ধানে রাজী না হন তা হলে তিনি নিশ্চয়ই ন্যায় বা সত্য-প্রেমিক নন।'

বাস্তবিকই ভালো-মন্দ, সাদা-কালো মিশিয়ে মানুষের যে জীবন, তাকে সম্পূর্ণত হুবহু প্রকাশে দ্বিধাহীনতাই রুশোর আত্মজীবনীকে এতখানি মহিমান্বিত

করে রেখেছে, যদিও অনেকে তাঁর সব কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে পারেন না।

সে যাই হোক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবনের মধ্যেও আমরা প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাই। সত্যসন্ধানের উদ্দেশেই তিনি তাঁর রোমের বিখ্যাত ইতিহাস লিখতে বসেছিলেন, তাঁর আত্মজীবনী রচনার প্রয়াসের পিছনেও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য। সে কথা জানাবার জন্যেই তিনি তাঁর আত্মকথার ভূমিকায় লিখেছেন :

'Truth, naked unblushing truth, the first virtue of more serious history, must be the sole recommendation of this personal narrative.'

এখানে ইংরেজি 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন আছে। 'অটোবায়োগ্রাফি'র বাংলা তর্জমা দাঁড়িয়ে গেছে আত্মচরিত বা আত্মজীবনী। অথচ এই ইংরেজি শব্দটি আবিষ্কৃত ও চালু হবার অনেক আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এমন কি আত্মপ্রচারবিমুখ এই দেশেও বহু আত্মকথা রচিত হয়ে গেছে।

ইংরেজ কবি নাট্যকার রবার্ট সাদে বীর সেনাপতি নেলসনের জীবনীকার হিসেবেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই রবার্ট সাদেই ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের শুরুতে সর্বপ্রথম 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তার আগে পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক এবং মনীষীরা যে-সব আত্মকথা লিখে গিয়েছেন তার সবই 'অটোবায়োগ্রাফি' ছাড়া অন্য কোনো না কোনো নামে অভিহিত। এই প্রসঙ্গে রুশোর 'কনফেশনস্' এবং আলেকজেণ্ডার ডুমার আত্মস্মৃতি (**Mes Memoires** অর্থাৎ **My Memoirs**) প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।

'জার্নাল' নাম দিয়েও অনেক সাহিত্যিক, অনেক দার্শনিক পণ্ডিত তাঁদের আত্মকথা লিখতেন। দূর অতীতেই শুধু নয়, হাল-আমলেও 'জার্নাল' বা অনুরূপ অন্য কোনো নামে অনেকের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একালের অন্যতম সেরা সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের 'দি জার্নাল অব আঁদ্রে জিদ' এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সমারসেট মমের 'দি সামিং আপ' ও 'এ রাইটার্স নোটবুক' প্রভৃতি বই-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। মম যদিও তাঁর 'দি সামিং আপ' গ্রন্থের শুরুতেই বলে নিয়েছেন '**This is not an autobiography nor is it a book of recollections**', তা সত্ত্বেও এ যে তাঁর

স্মৃতিচারণারই ফল প্রত্যেক পাঠকই তা স্বীকার করবেন। যথার্থ একখানি আত্মচরিত রচনার যে গভীর ইচ্ছে তিনি পোষণ করতেন তাও তিনি তাঁর এ বইখানির মধ্যেই এক স্থানে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'I nave never kept a diary, I wish now that during the year that followed my first success as a dramatist I had done so, for I met then many persons of consequence, and it might have proved an interesting document'. মমের কাছে আত্মচরিতের যে কতটা 'গুরুত্ব ছিল তা তাঁর একথা থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

সমারসেট মম আফশোস করেছেন ডায়েরী রাখেন নি বলে। আত্মচরিত রচনায় ডায়েরী নিঃসন্দেহে এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। প্রকৃতপক্ষে ডায়েরীও আত্মচরিতেরই বিকল্প। তার আরেক বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে মনীষীদেব পত্রাবলী। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা যেমন সংশ্লিষ্ট লেখকের কথা জানতে পারি, তেমনি জানতে পারি তাঁর কালের কথা, তাঁর সমাজের কথা।

ইতিহাসের বাইরে অতীতকে জানবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম শিল্প, সংবাদপত্র ও সাহিত্য। এখানে সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগ আত্মচরিতই আমাদের আলোচ্য। আত্মচরিত বা স্মৃতিকথা সত্যকে ভিত্তি করেই রচিত হয়ে থাকে, এটাই চলতি ধারণা, যদিও 'all autobiographies are lies' এই বলে বার্নার্ড শ' সব আত্মস্মৃতিকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। কিন্তু শ' যাই বলুন, রুশো বা গ্যেটের মতো লোকের আত্মকথাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থের মধ্যে দিনলিপি বা ডায়েরীকে আবার বিশেষ স্থান দিতে হয়। কারণ, প্রতিদিনের সত্য সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। টলস্টয় প্রভৃতির দিনলিপি এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ডায়েরী বা ব্যক্তিগত দিনলিপি বরাবরই একটি আকর্ষণীয় ও বিশিষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে পাঠকসমাজের সমাদর লাভ করে আসছে। ডায়েরীর অন্তরঙ্গতা বা তার মধ্যে 'আমিত্বে'র যে আবেদন থাকে, পাঠকের সবিশেষ চিত্তাকর্ষণের সেটিই প্রধান কারণ। এই 'আমিত্ব' আত্মকথা রচনার পথে সময় সময় যে আবার প্রতিবন্ধকও হয়ে ওঠে, সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সমকালের আলো-আঁধার, হিসেব-নিকেশ এবং অজস্র বিষয় ও ব্যক্তি সম্পর্কিত স্মৃতিচারণার সমন্বয়ে ডায়েরী বা দিনলিপি সাহিত্যের একটি অনন্য বিভাগ। এক একজন মানুষের অনেককালের বা কিছুকালের নিভৃত পদযাত্রার অনবদ্য কাহিনী হয়ে দাঁড়ায় এক একটি ডায়েরী বা দিনলিপি। ডায়েরীকে সমকালের

সঙ্গে একটি নিবিড় আলাপও বলা যেতে পারে। সমকালের কথা যেমন লিপিকার বলে থাকেন, নিজের কথাও তেমনি সমকালকে শুনিয়ে যান এবং তার দলিল রেখে যান ভবিষ্যতের জন্যে।

অনেক সময় অবশ্য লিপিকার নিজের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্যের গণ্ডীতে, অপ্রয়োজনীয় জগতে প্রবেশের ঝোঁক দেখান, যার ফলে ডায়েরী বিস্বাদ বা শুষ্ক হয়ে ওঠে। তাই বলা হয়ে থাকে, 'ডায়েরীর ইতিহাস ডায়েরীকে এড়িয়ে যাওয়ার ইতিহাস।' এই শ্রেণীর ডায়েরীতে লেখক বড়ো সতর্ক, নিয়ন্ত্রণমুখী ; অর্থাৎ আত্মকথা সহজ সরল ও স্বচ্ছন্দভাবে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে প্রস্তুত নন। জীবনে যা ঘটেছে, ঘটছে, যা তিনি নিত্য করতে বা বলতে বাধ্য হচ্ছেন তা অপ্রীতিকর বা অ-নীতিসম্মত বলে তিনি তাঁর জীবনচরিতেও তা প্রকাশ করতে চান না, চিরদিনের মতোই আড়ালে রাখতে চান। তাতে দিনলিপির স্বধর্মচ্যুতি ঘটে।

ডায়েরী সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে তাতে কোনো মিথ্যা ভান প্রশ্রয় পাবে না, কোনো উদ্দেশ্যই মূল বক্তব্য অর্থাৎ সত্যকে অবগুণ্ঠিত করবে না। আত্মকথা যখন, তখন আমিত্বের বাঁধুনি তো আগাগোড়াই থাকবে, কিন্তু অহংবোধ সত্য-প্রকাশকে কুণ্ঠিত করবে না। এই নীতি দ্বারা চালিত হয়ে যিনি ডায়েরী লেখেন বা আত্মচরিত রচনা করেন তাঁর চরিতকথায় সমকালীন সমাজ কম-বেশি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হবেই।

মহৎ মানুষের দিনলিপিতে লেখকের প্রাত্যহিক জীবন-প্রবাহের ভেতর দিয়ে সমসাময়িক সমাজরূপ যথাযথ চিত্রিত হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর যে ঘটনার বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, কেবলমাত্র সেসব ঘটনা বা বিষয়ই দিনলিপিতে স্থান পেয়ে থাকে এবং সেগুলি স্বভাবতই সত্য বলে ধরা হয়ে থাকে।

সমাজচিত্রণে পত্রাবলীর ভূমিকাও অনেকটা আত্মচরিত বা ডায়েরীরই অনুরূপ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক বা যে কোনো শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চিঠিপত্রেই তৎকালীন সমাজপরিবেশের কিছু-না-কিছু ছাপ আশা করা যায়। সমাজচিত্রের দলিল হিসেবে সেগুলি নিঃসন্দেহে নির্ভরশীল। এইদিক থেকে অবশ্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মূল্যই সমধিক। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্র-পত্রাবলীতে পরাধীন ভারতের এবং শেখভের অসংখ্য চিঠিপত্রে জারের রাশিয়ার সমাজরূপ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, এইসব পত্রসংকলন পড়ে আমরা এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি।

এমনিভাবেই বিভিন্ন দেশের মনীষীদের আত্মচরিতে বা ডায়েরী ও পত্রাবলী-জাতীয় আত্মচরিতমূলক গ্রন্থে সেইসব দেশের সমাজবিবর্তনের ইতিহাস মূর্ত হয়ে থাকে। সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে আমরা সুষ্ঠুভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাই এমনি সব গ্রন্থের মাধ্যমে। সোভিয়েট বিপ্লবের আগের রাশিয়ার সঙ্গে আজকের রাশিয়ার আকাশ-পাতাল তফাৎ। এত বড়ো বিরাট সামাজিক পরিবর্তন পৃথিবীর আর কোনো দেশেই এতাবৎ ঘটেনি। কিন্তু প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাশিয়ার সামাজিক রূপের সত্যচিত্র পেতে হলে পুশকিন, হার্জেন, টলস্টয়, শেখভ, ডস্টয়েভস্কি বা গোর্কি প্রভৃতির আত্মকথার চেয়ে নির্ভরযোগ্য অন্যকিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজকেও আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি অস্ট্রোভস্কি, ইলিয়া এরেনবুর্গ প্রমুখ যুগ-মনস্বীদের স্মৃতিচারণার মধ্যে।

এমনিভাবেই প্রত্যেক দেশের আত্মচরিতই সেই দেশের সমাজচিত্রের এক প্রকৃত প্রদর্শনী।

বাংলা ভাষায় আত্মচরিত

ভারতীয় সাহিত্যে আত্মজীবনী রচনার প্রয়াস খুব বেশি দিনের নয়। বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিতকথা পাওয়া যেতে থাকে বৃটিশ আমল থেকে।

আত্মচরিত রচনায় যিনি যে পরিমাণে অনাসক্ত বা নির্লিপ্ত হতে পারেন, অহংবুদ্ধিকে যতটা পরিমাণে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন তিনি সেই পরিমাণেই সাহিত্যিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। আত্মচরিতের অন্যতম প্রধান গুণ অকৃত্রিমতা। নিজের চরিতকথা যিনি নিজে শুনতে বসবেন তাঁর পক্ষে নিজেকে গুরুর আসনে বসানো অসঙ্গত, তাঁর রচনার ভঙ্গি হবে পরিস্রুত ভঙ্গি।

এই গুণের অভাবে বাংলা ভাষার অধিকাংশ আত্মচরিত ব্যর্থ হয়েছে। যাঁরা এবিষয়ে সাহিত্যিক সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় আত্মচরিতের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়, কিন্তু তার অধিকাংশই সাহিত্য হিসেবে শ্রেষ্টত্বের দাবী করতে পারে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্বয়ং বিদ্যাসাগর আত্মচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং আপনার পূর্বপুরুষের কাহিনী সরস ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছিলেন, তাঁর ভাষার প্রসাদগুণও আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু নিজের কথা তিনি কিছুই বলেননি।

'মহর্ষির আত্মচরিত' সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: "মহর্ষির আত্মচরিত বাংলা ভাষায় অল্প কয়খানি সুখপাঠ্য আত্মচরিতের অন্যতম। প্রধানত অধ্যাত্ম জীবনের রহস্যব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইলেও ইহা নীরস ধর্মগ্রন্থ মাত্র হইয়া উঠে নাই। বর্ণনা চাতুর্যে, ঘটনাবিন্যাসের কৌশলে, আর সর্বোপরি প্রসাদগুণবিশিষ্ট মার্জিত ভাষার ঐশ্বর্যে এ গ্রন্থ স্থায়িত্বের অধিকার অর্জন করিয়া লইয়াছে। আত্মচরিতের কোনো কোনো অধ্যায়ের নাটকীয় গুণ বঙ্কিমচন্দ্রের অলিখিত কোনো উপন্যাসের পরিচ্ছেদের মতো মনোহর মনে হয়। সৌন্দর্য দর্শনের সহজাত নেত্র লইয়া দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য দর্শনের এই নেত্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন।"

ঋষি রাজনারায়ণ বসু সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর

আত্মচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য যতখানি, সাহিত্যিক মূল্য ততটা নয়। তাঁর 'সেকাল ও একাল' নিছক আত্মচরিত নয়, চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক সমাজচিত্র।

নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই আত্মকথা বিবৃত করেছেন। এই সব আত্মকথার মধ্যে নানা কারণে গিরিশচন্দ্র সেনের রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে তিনিও নিজেকে প্রেরিতদের অন্যতম বলে মনে করেছেন এবং নববিধান সমাজের প্রতিনিধিরূপেই আত্মজীবনী লিখেছেন। কাজেই তাঁর রচনায় আমাদের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ হয় না।

পরবর্তীকালে যাঁরা আত্মজীবনী লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনবরেণ্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের কথা স্মরণীয়। শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং কবি ও কথাশিল্পী ছিলেন, তিনি প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলেও তাঁর আত্মচরিত অনেকাংশে সরস রচনা। এই আত্মচরিতের সঙ্গে তাঁর 'রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' পাঠে উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগৃতির একটি পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। বহুতথ্যসমৃদ্ধ এই আত্মজীবনীখানির গুরুত্ব ঐতিহাসিকের কাছেও অল্প নয়। কিন্তু 'আমার জীবনে' আত্মপ্রচার ও আত্মগরিমা ঘোষণার যে প্রয়াস আছে তা আমাদের মনকে পীড়িত করে।

কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' আত্মজীবনী নয়, কিন্তু এই গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের একটি নিবিড় পরিচয় আছে। কেশবচন্দ্রের ভাষায় অনুভূতির যে প্রগাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় তা সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে। ঠিক 'জীবনবেদের' মতো আর কোনো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' একই সঙ্গে স্মৃতিকথা, কাব্য ও কবির অন্তর্জীবনের ইতিহাস। রবীন্দ্র কবিমানসের ধারা অনুসরণ করতে হলে কবির কাব্যপাঠই যথেষ্ট নয়, কবি-প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের কথা কবির মুখে শোনবারও প্রয়োজন আছে। কবির নিজের কথা অবশ্য 'জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়' ব্যতীত তাঁর অসংখ্য পত্রাদির মধ্যেও পাওয়া যায়।

মনস্বী ব্যক্তিদের আত্মচরিত কতখানি নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে আমাদের মনে জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর 'মনুষ্যের জীবনচরিতে' সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন,

নানা কারণে আত্মচরিতে সত্যের অপলাপ বা অপচার ঘটতে পারে। প্রথমত লোকনিন্দা বা অপযশের ভয়ে মানুষ তার জীবনের স্খলন বা পতনের কাহিনী অসংকোচে প্রকাশ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অনেক মহৎ ব্যক্তিও বিভ্রমবশত আত্মবঞ্চনা করে থাকেন। তাঁরা প্রবৃত্তির তাড়নায় যে সমস্ত অপকর্ম করেন যুক্তির দ্বারা তারও সমর্থন খুঁজতে থাকেন। সংসারে অবশ্য এমন মানুষও দেখা গেছে যাঁরা প্রচলিত ধর্ম ও নীতির প্রতি ঘৃণাবশত আত্মদোষ-কীর্তনে অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করে পৃথিবীকে ভীত ও স্তম্ভিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বায়রণ ও রুশোর নাম উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এঁদের সংখ্যা সংসারে মুষ্টিমেয়। এঁদের আত্মদোষ কীর্তনের মূলে ছিল লোকের কাছে বাহবা পাবার আকাঙ্ক্ষা। আবার অনেক অসাধারণ পুরুষও স্বগুণের পক্ষপাতী হয়ে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকারে কার্পণ্য প্রকাশ করেন। জন স্টুয়ার্ট মিল এর দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর আত্মচরিতে খোলা মনে বেস্থামের কাছে দোষ স্বীকার করেন নি। যা হোক, আত্মচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য বিচারের সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রধানত লোক নিন্দার ভয়েই মানুষ সত্য গোপন করে এবং বুদ্ধির বিভ্রমে ভুল করে।

কালী প্রসন্ন ঘোষ লিখেছেন: "মনুষ্য একাকী উপবিষ্ট হইয়াই আপনার কথা লিখে বটে কিন্তু তাহার অবিরাম প্রসবিনী চিরসঙ্গিনী কল্পনা তাহাকে সে নিগূঢ় নির্জন স্থানেও অসংখ্য মনুষ্য চক্ষুতে পরিবেষ্টিত করে রাখে। সে যেই মনে করে যে তাহার দিকে বর্তমান ও ভাবীকালের লক্ষ চক্ষু তাকাইয়া রহিয়াছে, অমনি তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যাহা শাদা মনে লিখিয়া ফেলিবে স্থির করিয়াছিল, এইক্ষণ সে তাহা একটুকু সাবধান ভাবে লিখে এবং লিখিয়া এখান হইতে একটি অনুস্বার তুলিয়া ফেলে এবং ওখানে দু'টি বিসর্গ ভরিয়া দেয়। তাঁহার হাতের কাগজখানিতেও তাহার সম্যক প্রত্যয় থাকে না। এইরূপ সংশোধনের পর সংশোধনে, পরিবর্তনের পর পরিবর্তনে লেখকের প্রকৃত ও লিখিত জীবনে ক্রমে ক্রমে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে বিবেচনার সহিত দেখিলে একটিকে অন্যটির প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন হয়। পৃথিবীর অনেক প্রধান পুরুষের স্বলিখিত-জীবন বৃত্ত এই দোষে দূষিত।"

অনেক ধার্মিক ব্যক্তি যে বুদ্ধির বিভ্রমে আত্মবঞ্চনা করে থাকেন, সে-সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন লিখেছেন: "তাঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া পর-পীড়নে প্রবৃত্ত হইলে

অদৃশ্য প্রবৃত্তিকে ধর্ম বৃত্তির স্ফুরণ বলিয়া মনের নিকট প্রবোধ দিয়াছেন এবং লোককেও ঐরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি লৌকিক যশের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, সে-লালসা শুধু সজ্জনের প্রীতি লাভের পিপাসা। তাঁহারা যদি বিষয় বৈভবের জন্য চিত্তে ব্যাকুল হইয়া থাকেন সে ব্যাকুলতা আশ্রিত পালনের সদুদ্দেশ্যমূলক যত্নশীলতা।"

ইতিপূর্বে আমরা আত্মচরিতের তিন প্রকার মূল্যের কথা উল্লেখ করেছি: সাহিত্যিক, মনঃস্তাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক। এর তৃতীয় দিকটি সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ উল্লেখ প্রয়োজন। উপরের আলোচনায় দেখা গেছে, আত্মচরিতের লেখকেরা নানা কারণে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা গোপন করে থাকেন। কিন্তু লেখকেরা নিজের জীবনের কথা লিখতে গিয়ে শুধু নিছক ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীই লেখেন না, তাঁদের নিজের কালের কাহিনীও কোনো না কোনো সূত্রে তাঁদের রচনার মধ্যে এসে পড়ে। সব আত্মচরিত-লেখক সমান ভাবে সমাজ-সচেতন না হতে পারেন, এবং স্বেচ্ছায় সমাজের বর্ণনা দিতে প্রবৃত্ত নাও হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী থেকেও তাঁদের কালের একটি ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠে। এবং নিজের কাল সম্পর্কে সত্য গোপনেও লেখকদের সাধারণত প্রবৃত্ত হবার কথা নয়।

সুতরাং, কোনো দেশের সমাজ জীবনের ধারাবাহিক একটি ছবি পাবার অন্যতম উৎস হচ্ছে সেই দেশের মনীষী ব্যক্তিদের আত্মচরিত।

অন্যান্য নানা সূত্র থেকেও সমাজজীবনের ছবি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন আত্মচরিত থেকে যে ছবি পাওয়া যায় তা পৃথক ধরণের। কারণ, আত্মচরিত লেখকেরা কেউ নিজেদের সমাজ জীবন সম্পর্কে গবেষণা করতে বসেন নি, তাঁরা শুধু নিজেদের প্রসঙ্গে বলে গেছেন নিজের কালের কথা। সেই ঘরোয়া কাহিনীতে এমন ছবি ফুটে ওঠা সম্ভব যা হয়তো ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে সাধারণত ফাঁকি দিয়ে যায়।

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথার একটি খণ্ডের নামই দিয়েছেন 'আমার কালের ক '।

বাঙলাদেশের বিশিষ্ট মনীষীদের আত্মচরিত থেকেও বাঙলার একটি নির্ভরযোগ্য সমাজচিত্র পাওয়া যায়।

দূর অতীতের ভারত আজও অন্ধকারে

মনীষী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আত্মকথায় স্বভাবতই নিজ নিজ দেশের সমকালীন সমাজ-রূপের বিশ্লেষণ ঘটে থাকে। অতীত সমাজের দর্পণ হিসাবে অনুরূপ এক একখানি আত্মজীবনী দেশে দেশেই অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত। শুধুমাত্র সমকালীন সমাজ-চিত্র ও চরিত্রকে অনুধাবনের উপায় হিসাবেই যে এর গুরুত্ব তা নয়, বিভিন্ন যুগে রচিত বিভিন্ন আত্মকাহিনীর ভেতর দিয়ে এক একটি দেশের সমাজ-জীবনের তথা সভ্যতার বিবর্তনধারা ধরা পড়ে। আত্মচরিতের মতো দিনলিপি বা রোজনামচা এবং জার্নাল ও স্মৃতিচারণা জাতীয় রচনায়ও মনীষীদের আত্মকথা বিধৃত থাকে। সেইসব রচনার মধ্যে দিয়েও ভবিষ্যৎ কালের পাঠকদের কাছে অতীত সমাজের রূপ যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় সমাজবিবর্তন ও ভারতীয় সভ্যতাবিকাশের ধারা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে যে সব অন্তরায় রয়েছে তার মধ্যে আত্মজীবনীর অভাব অন্যতম এবং তা একান্তভাবেই অনুভূত। বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য আত্মচরিতকারের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাঁর আত্মকথার আলোয় আমরা তৎকালীন ভারতীয় সমাজ-রূপ সম্বন্ধে সঠিক একটা ধারণা করতে পারি। এ বিষয়ে স্মৃতি-শ্রুতির ওপর আমরা যতই নির্ভর করি না কেন, তাকে কখনো সমাজ-বিশ্লেষণের যথার্থ বৈজ্ঞানিক উপায় বলে অভিহিত করা যাবে না। তা হলেও ইতিহাসের গতিপথে স্মৃতি-শ্রুতিও অনেকখানি সহায়ক, এ-সবেরও নিশ্চয়ই যথেষ্ট মূল্য আছে যদিও তার ওপর কখনো পুরোপুরি নির্ভর করা চলে না।

প্রকৃত ইতিহাস ও আত্মচরিতের মতো প্রত্যক্ষ দলিলের অভাবেই দূর অতীতের ভারত আজও আমাদের কাছে অনেকাংশেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আত্মজীবনীর অভাব যে কেন, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

হাজার হাজার বছরের হিন্দু-ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রাচীন যুগের ভারতীয়দের মন স্বভাবতই ছিল বৈরাগ্যপ্রবণ ও ইহলৌকিক প্রত্যাশায় বহুলাংশে বিমুখ। তাঁরা অভ্যুদয় বা সুখ-সম্পদ কখনো কামনা করেন নি, এ-কথা সত্য নয়, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে কোনো

চরমমূল্য যে তাঁরা দেননি তা স্বীকার করতেই হবে। হয়তো তাঁরা মনে করতেন, আত্মঘোষণায় বা আত্মকথা-কীর্তনে মানুষের অহংবোধ প্রশ্রয় পায়। প্রাচীন হিন্দু মনীষীদের আত্মপ্রচার-বিমুখতার সেটাই হয়তো মূল কারণ এবং সেজন্যেই হয়তো গীতার পরে সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সাহিত্যে তেমন কোনো আত্মকথনগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমরা যে কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি ও মহাকবিদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না তা অবশ্যই আমাদের দুর্ভাগ্য। আত্মপরিচয় ঘোষণা দূরে থাকুক, এদেশের অনেক কবি নিজ নিজ রচনাকে শ্রেষ্ঠতর কবির রচনার মধ্যে 'প্রক্ষেপ' করে গেছেন। এরূপ আত্মবিলুপ্তির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। তবে এর ফলে এঁদের জীবনবৃত্তান্ত যে শুধুমাত্র কুহেলিকাময় এবং কিংবদন্তী-নির্ভরই হয়ে আছে তাই নয়, ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে ও সমাজসূত্রের সন্ধানে নানারূপ বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে এই জন্যে। পূর্বোক্ত কবিদের মধ্যে কে-আগে কে-পরে এবং কে কার কতটা আগে বা কতটা পরে আজো পর্যন্ত তা যথার্থভাবে মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে। একই নামের একাধিক কবি একই সময়ে কাব্যরচনায় ব্যাপৃত থাকতে পারেন কিংবা পর পরও তাঁদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। সে যুগে কবিদের আত্মপরিচয় গোপন রাখার রীতি প্রচলিত থাকায় একাধিক কবির রচনা একই কবির নামে চলে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। বহুক্ষেত্রেই তেমন ঘটেছে বলে সাহিত্য-সমালোচকগণ যে অনুমান করে আসছেন তা অমূলক না হবারই কথা। মহাকবি বেদব্যাস থেকে শুরু করে কালিদাস, ভাস, ভবভূতি এমনকি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস পর্যন্ত অনেক কবিকে নিয়েই অনুরূপ প্রশ্ন উঠেছে যার যথার্থ মীমাংসায় আসা খুব সহজসাধ্য নয়। এঁদের অনেকের বেলায় আবার জীবন-কাল নির্ণয় করাও এক দুরূহ সমস্যা। এ বিষয়ে মহাকবি ভাসের দৃষ্টান্ত সবিশেষ উল্লেখ্য। অনেকের ধারণা তিনি কালিদাসের পরবর্তী কবি, কিন্তু বহু ঐতিহাসিকের মতে ভাস শকুন্তলার কবি কালিদাসের বহু পূর্ববর্তী এবং সম্ভবত তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের কবিসম্রাট। আসলে ভাস ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি-নাট্যকার। কেউ কেউ বলেন, তিনি তেরখানি অমূল্য নাটকের রচয়িতা, অন্যদের মতে তিনি 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্' প্রভৃতি দশখানি নাটক ভারতবর্ষকে উপহার দিয়ে গেছেন।

পূর্বোক্ত সমস্ত কবি ও প্রাচীন ভারতের অন্যান্য কৃতী লেখকই নিজ নিজ

কালের সমাজ-প্রতিবেশের আভাস তাঁদের আপন আপন গ্রন্থাদিতে রেখে গিয়েছেন। কালিদাসের 'মেঘদূতে' তো প্রায় সারা ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় ও বিশ্ব-মানবের হৃদয়তত্ত্ব অতি বিস্ময়করভাবে লিপিবদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদের যথাযথ জীবনী ও জীবনকাল না পাওয়ায় ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ধারা নির্ধারণে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতা প্রথম থেকেই অনুভূত হয়ে আসছে।

প্রাচীন ভারতে আত্মচরিত রচনার কথা তো একরূপ জানাই যায় না, এমনকি ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে সেকালে কেউ কোনো মহৎ মানুষের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তেমন নজীরেরও কোনো সন্ধান মেলে না। কাজেই সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় দূর অতীতের ভারত-সমাজচিত্র উপলব্ধি করার মতো সত্যনিষ্ঠ তেমন কোনো অবলম্বন নেই—এ বিষয়ে প্রাচীন কবিদের রচিত গ্রন্থাদি ছাড়া নানা পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী ও অনুমানের ওপরে নির্ভর করেই আমাদের এগুতে হয়। এসব কখনো যথার্থ ইতিহাস রচনার এবং সমাজ-বিবর্তনমূলক গবেষণার উপযুক্ত মালমশলা বলে গণ্য হতে পারে না।

এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতের অনেক কবি বা মনীষী আপন আপন প্রতিভা বা বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ভবভূতির সেই প্রসিদ্ধ উক্তি 'জন্মিলে জন্মিতে পারে মম সমতুল, নিরবধি কাল আছে বসুধা বিপুল' (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মানুষ যাতে সুন্দরভাবে, সার্থকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ করতে পারে সেজন্যেই সমাজের উৎপত্তি। আর এই সমাজ যাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে তার জন্যেই যত আচার-পদ্ধতি, বিধি-বিধান ও শাসনব্যবস্থা। কিন্তু সেই সামাজিক মানুষই তার অন্তর-বাহিরের নতুন দাবীতে অতীতের বিধি-বিধানকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্যে এক একসময়ে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বিগতকালের প্রয়োজনীয় আইনকানুন তার কাছে যে তখন লোহার শিকল হয়ে ওঠে। সেই লোহার শিকলকে ছিন্ন করা কি সহজ? এগিয়ে চলতে গিয়ে তাইতো বারে বারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে মানুষের দেহমন এবং যুগসাহিত্যে তার ছাপ পড়ে। যুগের সাহিত্যরথীরা মানবমনের সেই রক্তাক্ত কাহিনীরই যে রূপকার! এমনিভাবে যুগে যুগে সমাজরূপের যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষভাবে সমকালীন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিক প্রভৃতির আত্মকথায়।

তবে আত্মচরিত বা আত্মজীবনী বলতে আজকের দিনে অর্থাৎ এই

বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা যা বুঝে থাকি প্রাচীন ভারতে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল বলেই মনে করা যায় না। শুধু প্রাচীন ভারতের কথাই বা বলি কেন, পাশ্চাত্য জগতেও এ সংবন্ধে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা বোধহয় ছিল না। অনেকেরই ধারণা ইংরেজি 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটির বাংলা তর্জমা আত্মচরিত বা আত্মজীবনী। আবার বলি, এসম্পর্কে এটুকুই শুধু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উনবিংশ শতকের শেষ দশকেই সর্বপ্রথম ঐ 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তার আগের কোনো ইংরেজি অভিধানে এই শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

সে যাই হোক, আত্মচরিতমূলক রচনার একান্ত অভাব থাকলেও সুপ্রাচীন ভারতীয় সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট পশ্চাদপটের সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদ থেকে। উপনিষদ ভারতের ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্র। এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও উপলব্ধির জন্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমেই মানুষ গড়ার কথা, খাঁটি গৃহস্থ তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। কারণ তা হলেই তাদের পক্ষে সহজ সুন্দরভাবে জীবনকে ভোগ করা সংভব হবে। এবং সার্থক সেই দুর্লভ মানবজীবনেই তাদেরকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, কারণ অন্য কোনো জীবনে সেই মহাজ্ঞান লাভ করা সংভব নয়। ভালোভাবে বাঁচতে না শিখলে, পুরোপুরি সম্পূর্ণ মানুষ হতে না পারলে এবং ধনজন ও বিদ্যাবুদ্ধিমণ্ডিত হয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী না হলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা কী করে সম্ভব হবে? তারই জন্যে জীবনভোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। তবে ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থের মাঝখানে সেই ভোগ-জীবনটুকু স্বল্পকালীন এবং সেই জীবনটুকুও দেহকে সুস্থ রেখে আর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ও সক্ষম রেখে এমনভাবে অতিবাহিত করতে হবে যাতে উপলব্ধি সহজসাধ্য হতে পারে: সুখ কামনা করা অন্যায় নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বরং ভিক্ষান্নে দিন কাটানোর বিরুদ্ধতা করে সুখের জন্যেই দেবতার কাছে, বরুণদেবের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত সুখে সমস্ত চিত্তদৈন্য দূর হয়ে গেলে নির্ভয়ে সত্য প্রচার করা যাবে এবং ন্যায় ও ধর্মের কথা বলা যাবে। এজন্যে অন্নকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। তবে এও মনে রাখতে হবে অন্নই সব নয়—তাকে উত্তরণ করে রয়েছে পরম জ্ঞান ও পরম সত্যলাভের আনন্দ। অন্ন থেকেই সেই আনন্দ-জগতে গিয়ে পৌছুতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই শিক্ষা মহাপুরুষ ও দেশের মহান কবিকুলের কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে আমরা পেয়ে আসছি।

তবে একথা ঠিক যে, কবি ও রাষ্ট্রনায়কদের আত্মজীবনী বা সত্যনিষ্ঠ

জীবন-চরিতের অভাবে প্রাচীন ভারতের কত তথ্য যে একালের তথা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে যথাযথ ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করে হিন্দুযুগের পূর্ণাঙ্গ ভারত-ইতিহাস অনুধাবনের কোনো সুযোগই নেই। শেষের দিকে বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণনা এ বিষয়ে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। হিউয়েন-সাঙ্, ফা হিয়ান প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণ নিজেদের ভ্রমণকাহিনীতে সেকালের ভারতীয় সমাজ-জীবনের ও রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। সে-সবই নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা এবং সে-সকল কাহিনী বাস্তবিকই ভারতের অতীত যুগ-জীবনের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। প্রাচীন চীন জাতির মধ্যে যে ঐতিহাসিক চেতনা ছিল, ভারতের প্রাচীন কবি বা মনীষীদের মধ্যে তার একান্ত অসদ্ভাব লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য এ-কথা সত্য যে যাঁরা স্বভাবতই বৈরাগ্যপ্রবণ, জীবন যাঁদের দৃষ্টিতে 'নলিনীদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল' তাঁদের মধ্যে সাধারণত যেমন জাতীয় ইতিহাস রচনা করে স্বদেশ ও স্বজাতিকে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা দেবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তেমনি আত্মচরিত প্রণয়ন করে স্বমহিমা কীর্তনেরও প্রেরণা জাগে না। সেকালের ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর অভাবের জন্যে তখনকার ভারতীয়দের ঐ বৈরাগ্যপ্রবণ মনোভাবই একান্তভাবে দায়ী।

এ বিষয়ে মুসলমানদের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। সে জাতির মধ্যে জিগীষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল। তাঁদের স্বজাতিবাৎসল্যও প্রচণ্ড, তাই মুসলমানদের মধ্যে আত্মজীবনী রচনার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য ঐস্লামিক দেশের কথা এখানে আলোচ্য নয়, কিন্তু এদেশ সম্বন্ধেই বলা যায় যে, মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের পর পাঠান সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘল ও প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীর, ঔরঙজেব প্রভৃতি অনেক বাদশাহই আত্মচরিত প্রণয়ন করে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন। 'বাবুর নামা' (সম্রাট বাবরের আত্মকথা), 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি' (জাহাঙ্গীরের আত্মকথা) প্রভৃতি আত্মজীবনীগুলি অত্যন্ত সুলিখিত এবং এসব গ্রন্থ থেকে তৎকালীন শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলেই এসব বই ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। হুমায়ুন নিজে তাঁর বহুবিড়ম্বিত জীবনে আত্মকাহিনী লেখবার অবকাশ পাননি। কিন্তু তৈমুরলঙের ষষ্ঠ বংশধর হিসেবে তৈমুরের লেখা 'তারিখ-ই-তৈমুরিয়া' নামক ডায়েরীখানাকে সর্বদা

সঙ্গে সঙ্গে রেখে হুমায়ুন খুব গৌরব অনুভব করতেন। তাছাড়া হুমায়ুন-ভগ্নী গুলবদন 'বেগম হুমায়ুননামা' রচনা করে হুমায়ুনের শাসন ও তাঁর কালের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এসব ছাড়াও 'আকবরনামা', 'পাদশাহনামা' প্রভৃতি অনেক জীবনীগ্রন্থ এবং ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ, ক্যাপ্টেন হকিন্স, স্যার টমাস রো, ওলন্দাজ পেলসায়ার্ত, ইতালীয় মানুচ্চি, ফরাসী ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের ও তেভার্নিয়ের প্রভৃতির ভ্রমণকাহিনীও ভারতের মুঘল যুগকে এবং বিশেষভাবে সমকালীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ ও চরিত্রকে জানবার ও বুঝবার পক্ষে যথার্থ উপাদান। তবে তার মধ্যে আত্মচরিত যে বিশেষ মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি মুঘল জেনানা-মহলেও আত্মকথা লেখবার একটা অনুপ্রেরণা দেখা দিয়েছিল। জাহানারা বেগমের মনোগ্রাহী আত্মচরিতখানা তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাবর প্রমুখ বাদশাহদের আত্মজীবনী ঐতিহাসিকদের চোখে মুস্‌লিম শাসিত ভারত-ইতিহাসের মূল্যায়নে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত। হিন্দুযুগে ভারতের কোনো সম্রাট আত্মচরিত রচনার কথা কোনোদিন হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের মতো নৃপতি যদি তাঁদের আপন আপন অভিজ্ঞতা ও সমাজ-পরিবেশের কথা লিপিবদ্ধ করে যেতেন তবে সে যুগের ভারত সম্পর্কে সে সব জ্ঞানের আকর হতো। দূর অতীতের হিন্দু-শাসকদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, এমনকি লেখাই যাঁদের পেশা এবং লেখনীই যাঁদের জীবনের একমাত্র নির্ভর সেই কবি-মনীষীরাও নিজেদের সম্বন্ধে তেমন কিছু লিখে যাননি, যা জেনে বিস্মিত হতে হয়। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে শুধুমাত্র শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রমুখ কয়েকজন কবি অতি সামান্য এবং কবি বাণভট্ট কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে স্ব স্ব জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। বাণভট্টের আত্মকথা পাঠ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এবং তা থেকেই আমরা তাঁর কালকে খানিকটা আস্বাদন করতে পারি ও সেকালের সমাজজীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারি।

এক হিসেবে গীতাকে বিশ্বের আত্মচরিতমূলক প্রথম গ্রন্থরূপে গণ্য করা চলে, এবং তা যে মূলত শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথন সে বিষয়ে এ পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি। সেই বিচারে ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য স্বর্ণ-ভাণ্ডারে গীতাই প্রথম আত্মকাহিনী এবং সেই পটভূমিকা থেকেই আমরা ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ শুরু করবো।

শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা / গীতায় ভারত-রূপ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা সুদীর্ঘকাল ধরেই সর্বত্র স্বীকৃত। এই গীতাকে আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা বলে মেনে নিই তাহলে মহাভারতের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের প্রতিচ্ছবি আমাদের কাছে অনেকখানি স্পষ্ট ও সত্য হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গীতাকথন মহর্ষি বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতেরই একটি অংশ, তার ভীষ্ম পর্বের বর্ণনা থেকে গৃহীত। সেরূপ বিচারে মহাভারতেরই প্রাচীনতার সমতুল গীতার প্রাচীনত্ব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দিয়েই আমরা মহাভারতের কাল নির্ণয় করতে পারি। তখনকার যুগে দিনক্ষণ নির্ধারণের একালের মত সুব্যবস্থা ছিল না। তাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় নিয়ে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনায় মোটামুটি এরূপ একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খৃষ্টজন্মের আড়াই হাজার বছরেরও কিছু বেশি আগে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ঐ ধর্মযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়েছিল। তা থেকেই ধরে নেওয়া চলে যে, গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা থেকে আমরা আনুমানিক সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারি।

ভক্তজনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অষ্টম অবতারই হোন আর বিংশ অবতারই হোন তা আমাদের আলোচ্য নয়, তিনি এখানে বিচার্য সেকালের অতুলনীয় কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ এক মহাজ্ঞানী ঐতিহাসিক পুরুষরূপে এবং ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম আত্মচরিতকার হিসাবে। অতুলনীয় জ্ঞান-বৈভব ও ধর্মাধর্মের অসামান্য বিশ্লেষণের আধার বলেই পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি প্রধান প্রধান ভাষায় এ পর্যন্ত গীতার তিন হাজারের মত পৃথক পৃথক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকেই এ সত্য প্রমাণিত যে শুধুমাত্র হিন্দু জনসাধারণের কাছেই নয়, অমূল্য ভাবসম্পদে পূর্ণ এক উদার সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতা সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের জ্ঞানী মহলেই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

তত্ত্বপিপাসু খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষই যে গীতার গুরুত্ব স্বীকার করে আসছেন নির্দ্বিধায় তা বলা যেতে পারে। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দার্শনিক পুত্র দারাশিকো গীতাকে স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত

উৎসরূপে বর্ণনা করে বলেছেন যে, গীতায় পরমপুরুষের কথা বিবৃত এবং সেখানে পরমসত্য লাভের সুগম পথ প্রদর্শিত। প্রায় দু'শ বছর আগে ইংরেজ মনীষী চার্লস উইলকিন্স গীতার যে ইংরেজী অনুবাদ করেন তার ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং বৃটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। ভূমিকায় হেস্টিংস সাহেব গীতাকে বিশ্বসাহিত্যের এক অভূতপূর্ব বিস্ময় বলেই ক্ষান্ত হন নি, 'গীতাধর্মের অনুশীলনে মনুষ্য-সমাজ শান্তিধামের অধিবাসী হবে' বলেও মন্তব্য করেছেন। এর পরে আর অন্য কারো মতামতের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে গীতা কীভাবে পরমপুরুষের আত্মকথা এবং কী সেই সমস্ত কথা যার মাধ্যমে আমরা সেই সুপ্রাচীন ভারত-সমাজের রূপ অনুধাবন করতে পারি, এখানে সে সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

গীতাকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে এই জন্যে যে, গীতায় বর্ণিত অধিকাংশ শ্লোকই তাঁর শ্রীমুখ-নিসৃত বাণী। চলতি গীতাসমূহের মোট শ্লোকসংখ্যা সাতশ'। কিন্তু নানা সূত্রের বিচারে এরূপ স্থির হয়েছে যে, মূলত গীতার শ্লোকসংখ্যা ছিল সাতশ' পঁয়তাল্লিশ এবং তার মধ্যে ছয়শ' কুড়িটিই হলো শ্রীকৃষ্ণকথিত বাণী। গীতাকে তাই শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা বললে নিশ্চয়ই ভুল বলা হয় না।

কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে জ্ঞাতি ও স্বজন বিনাশের আশঙ্কায় বিচলিত সখা অর্জুন যখন নিরুদ্যম এবং পরোপরি যুদ্ধ-নিবৃত্ত হবার জন্যে ব্যগ্র সেই সময় ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বহু অমূল্য উপদেশ দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছিলেন এবং শেষে আপন বিশ্বরূপ দেখিয়ে তাঁর মোহজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। সে সব উপদেশ থেকেই নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা পেয়েছিলেন অর্জুন এবং আত্মার যে মৃত্যু নেই ও অন্যায়কারী আত্মীয় হননের দায় যে ন্যায়-যোদ্ধাকে বইতে হয় না, বরং ন্যায়ের ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে তেমন যুদ্ধ করে যাওয়াই যে প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি সবিশেষ হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হয়েছিলেন।

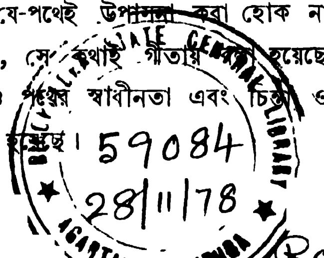
ধর্মযুদ্ধ-বিজয়ের যে গৌরব পাণ্ডব-পক্ষ অর্জন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তার মূলে ছিল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের এই পরম জ্ঞানোদয়। গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের নানা বাণী থেকে এমনিভাবেই আমরা সে সময়কার ভারতীয় সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধের পরিচয় পাই এবং সেই সুপ্রাচীন হিন্দুসমাজ যে অবতারবাদে গভীর আস্থা পোষণ করতো তারই এক প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ঘটনাটি।

স্বভাবত গুণের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ ব্যবস্থা। মহাভারতের যুগে যে তেমনি ব্যবস্থাই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল গীতায় তার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। গুণানুযায়ী কর্মবিভাগ করে দিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন বলে গীতায় নিজমুখে ঘোষণা করেছেন। জন্মগতভাবে নয়, স্বাভাবসিদ্ধ কর্মে আত্মনিয়োগের দ্বারাই যে সে-যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের শ্রেণী নির্ধারিত হতো, এ ঘোষণাই তার প্রমাণ। সাড়ে চার হাজার বছর আগে ভারতীয় জনসমাজ যে এমনিভাবে গুণগত ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত ছিল, আজকের দিনে তা ভাবতেও অবাক লাগে।

আরো আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মাধর্ম বিশ্লেষণের মতো করেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ খাদ্যাখাদ্য বিচারধারা নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে প্রকৃতিভেদে খাদ্য নির্ণীত হয়ে থাকে বা খাদ্য-বিচারে কী করে মানুষের প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় দেখা যায়, সাত্ত্বিক লোকেরা সুসার ও সুরুচিকর খাদ্য গ্রহণ করেন, রাজসিক শ্রেণীর প্রিয় খাদ্য টক ঝাল ও অতি উষ্ণ রুক্ষ খাদ্য এবং তমসিকেরা শুকনো বাসী ও দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট খেয়েই খুশি। এ থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, একালের মতোই তখনকার দিনেও খাওয়ার ব্যাপারে নানা রুচিরই মানুষ ছিল।

প্রকৃতি ভেদে আহারের কথা যেমনি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ঠিক তেমনি দান-ধ্যান-যজ্ঞাদির ব্যাপারেও তিনি পার্থক্য আরোপ করেছেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় আলোচনায় দেখা যাবে যে সেখানে তিন প্রকারের জ্ঞান, কর্ম, কর্তা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে এবং সুখেরও তিনটি অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা চিরসত্য রূপেই প্রতিভাত যদিও সে-যুগের পরিবেশ দৃষ্টেই তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখের অমনি বিশ্লেষণ করেছিলেন।

সাধনার ক্ষেত্রেও রুচিবৈচিত্র্যকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর কালেও এই দেশে নানা পূজা-পদ্ধতি ও সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিভেদে মানুষ পূজানুষ্ঠান করে থাকে—সাত্ত্বিক লোকদের দেবতা অর্চনা, রাজসিকদের যক্ষরক্ষাদি বন্দনা এবং তামসিকদের ভূতপ্রেত পূজার রীতিকে মেনে নিয়েই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যেভাবে এবং যে-পথেই উপাসনা করা হোক না কেন তা যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই উপাসনা, সে কথাই গীতায় বলা হয়েছে এবং ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারেও নানা মত ও পথের স্বাধীনতা এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার সঙ্গে অধিকারভেদ স্বীকৃত হয়েছে।



এমনিভাবেই নানাদিক থেকে গীতায় প্রাচীন ভারতের সমাজ-রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এক-এক বিশ্বাসের মানুষ এক-একভাবে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে বিভিন্ন ভাষ্যকারের মতানুযায়ী গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে।

বিভিন্ন শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন সেখানেই তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। পরিষ্কারভাবেই তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই সব কিছু। একস্থানে অর্জুনকে বলেছেন, 'আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, ···আমিই সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা ও লয়কর্তা; আমিই অবিনাশী বীজ।' চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টভাষায় তিনি বলেছেন, 'আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মমায়ায় অবির্ভূত হই।' এরপরের সুবিখ্যাত শ্লোকেই রয়েছে, পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ঘটলে ও অধর্মের অভ্যুত্থান সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁকে দুষ্টের দমনে ও সাধু রক্ষায় আত্মপ্রকাশ করতে হয়।

এসবই অবতারবাদের কথা। কিন্তু গীতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর গীতা ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ও মায়াবাদভিত্তিক। হিন্দুভারত সাধারণভাবে ঈশ্বরের অবতারবাদে গভীর আস্থাশীল বলেই রামানুজ প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে সমগ্র হিন্দুজাতি গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে হাজার হাজার বছর ধরে মনে করে আসছে।

বিশেষ করে গীতার দশম অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সেনানীগণের মধ্যে নিজেকে স্কন্দ বা কার্তিকেয় বলে অভিহিত করেছেন, অন্যত্র প্রজা সৃষ্টির কারণস্বরূপ নিজেকে কাম বা কন্দর্প বলে ঘোষণা করেছেন। পার্বতী-মহেশ্বরের মিলনে তারকাসুর নিধনে ও স্বর্গোদ্ধারে যেমন কার্তিকেয়র জন্ম তেমনি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে মহতের সৃষ্টি হয়ে থাকে মহামিলনের ফলে। শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কামবর্জনের কথা বলেন নি কারণ সৃষ্টি ও সমাজ রক্ষার জন্যে কামের প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্যেই ঈশ্বর যে শুধুমাত্র পুরুষ নন, তিনি স্ত্রী দেবতাও, সে কথাও তিনি গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলেছেন। 'আমি সর্বজীবের সংহারক, ভাবী প্রাণীদের আমি উৎপত্তিকারণ এবং নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমারূপে সপ্ত স্ত্রী-দেবতা।' সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান সেই ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে ভারতীয় জনসাধারণের জন্যে যে নির্দেশাবলী দিয়ে গিয়েছেন অনন্তকাল ধরে যে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

কিন্তু কী তাঁর মূল নির্দেশ? 'মামনুস্মর যুধ্যচ।' অর্থাৎ 'আমাকে ধ্যান কর আর যুদ্ধ করে যাও।' সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে যাওয়াই তো নিষ্কাম ধর্ম। সেই নিষ্কাম ধর্মেরই মূল প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ এবং গীতারূপ আত্মকথাই তাঁর প্রচার যন্ত্র। সেই আত্মকথায় জীবনাচরণ-পদ্ধতির যে নির্দেশনামা রয়েছে অনেকাংশে সেই সুপ্রাচীন জীবনধারাই আজও পযন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে ভারতীয় হিন্দুসমাজে এবং নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে আরো বহু বহুকাল ধরে ঐ একই পুরনো ধারা এ দেশের সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকবে।

বেদে অবতারবাদ ব্যক্ত না হলেও মহাভারতের যুগ থেকে ভক্তিধর্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গীতায় বর্ণিত অবতারত্বে মানুষের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে থাকে। আর এ ধারণা বা বিশ্বাস থেকেই হিন্দুসমাজে এমন একটা বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে যে মানুষের দেবত্ব লাভের পথকে সুগম করে দেবার জন্যেই স্বয়ং ভগবান মানুষ রূপে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। এ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনোরূপ তর্ক না তুলে নির্বিবাদেই বলা যায় যে, অবতারবাদে এরূপ আস্থাকে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় জাতিই সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজের পক্ষে কল্যাণের বলেই মনে করে আসছে। এবং এই কারণেই প্রধান প্রধান প্রায় সব ধর্মবিশ্বাসেই এর প্রশ্রয়ও লক্ষ্য করা যায়।

সে যাই হোক নিষ্কাম কর্মসাধনাই গীতার মূল কথা যদিও যুগে যুগে ভারত-মনীষীরা বিভিন্নভাবে গীতার ব্যাখ্যা করে এসেছেন। শঙ্করাচার্য বা রামানুজের পরে আমরা এ সম্পর্কে শঙ্করপন্থী বাঙালী মহাপণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ ভাষ্যকারদের স্মরণ করতে পারি। তবে আধুনিক ভারতের তিন মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ, তিলক মহারাজ এবং মহাত্মা গান্ধী পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গীতার যে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাষ্য রচনা করেছেন তার প্রত্যেকটিই অভিনব এবং একালের মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সর্বজনহিতে অনাসক্ত হয়ে কর্মসাধনাই গীতার মূল বাণী এবং তাকে অবলম্বন করেই শ্রীঅরবিন্দ সর্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কর্মমুখে জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্তিবাদকেই মোক্ষলাভের পরমপথ বলে অভিহিত করেছেন তাঁর গীতাভাষ্যে। তাকেই তিনি বলেছেন আত্মসমর্পণ-যোগ। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগের বর্ণনা রয়েছে। তাকে ভিত্তি করেই শ্রীঅরবিন্দ তার গীতাদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ মতে

জীব ও জগৎ ক্ষর-পুরুষ আর কূটস্থা প্রকৃতি অক্ষর-পুরুষ এবং এই দুইয়ের অতীত যে ঈশ্বর তিনিই পুরুষোত্তম। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে 'শাস্ত্রে পরমাত্মাই পুরুষোত্তম নামে বর্ণিত এবং সেই পরমাত্মা এই বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত।'

তিলক মহারাজ এবং মহাত্মা গান্ধী উভয়েই গীতা ব্যাখ্যায় কর্মযোগের পথকে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু কারাবাসকালে রচিত তিলকের 'গীতা-রহস্য' এবং গান্ধীজীর গীতাভাষ্যে 'অনাসক্তিযোগ' সম্পূর্ণ পৃথক ভাবধারায় বিশ্লেষিত। তিলকের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত মহাকর্মী বীর অর্জুনকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে কর্ম থেকে কখনো দূরে থাকা সম্ভব নয় এবং কর্তব্য ত্যাগ সঙ্গতও নয়, আর জ্ঞানভিত্তিক ভক্তিমূলক কর্মসাধনাই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ পথ। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে শ্রীভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন, 'সদা অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য করে যাও। অনাসক্ত কর্ম সম্পাদনে মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়।' নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে মুক্তিলাভের উপায় এভাবেই গীতায় বর্ণিত হয়েছে। তারপরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে জ্ঞানযোগের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে ও সর্বদা সর্বজনের কল্যাণে রত থেকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেও যে মোক্ষলাভ ঘটে তার কথা বলা হয়েছে। মোক্ষ অর্জনে ভক্তিযোগের প্রশস্ত পথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীভগবান একাদশ অধ্যায়ের চতুর্পঞ্চাশৎ শ্লোকে। সেখানে তিনি বলেছেন যে শুধুমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ঈশ্বরলাভ ও ঈশ্বরে বিলীন হওয়া সম্ভব। এই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের সমন্বিত পথকেই বালগঙ্গাধর তিলক মুক্তির সেরা পথরূপে বেছে নিয়েছিলেন।

গান্ধীভাষ্যেও এই কর্মযোগই সমর্থিত, তবে অহিংসার ঋষি মহাত্মা গান্ধী কুরুক্ষেত্রের সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে মেনে নিতে পারেননি, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন একটি রূপক রূপে। কী সেই রূপক? তাঁর মতে হৃদয়ক্ষেত্রই আসলে কুরুক্ষেত্র। মানবদেহ সেখানে রথ, অর্জুন রথী, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব-স্বরূপ এবং মন তার লাগাম। সেই হৃদয়ক্ষেত্রে দৈবী প্রকৃতি ও আসুরী প্রবৃত্তির অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় দুই পক্ষের সমাবেশ ঘটে। এই ন্যায় বা দৈবী পক্ষই পাণ্ডব পক্ষ এবং অন্যায় বা আসুরী পক্ষই কুরুপক্ষ। হৃদয়স্থ এই ন্যায়-অন্যায় বোধের সংগ্রামকেই গান্ধীজী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। এবং গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সারমর্মকে গ্রহণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'সেবাই জীবনের লক্ষ্য, ভোগ নয়'—সুতরাং মোক্ষের প্রকৃষ্ট পথ যে কর্মযোগ,

জীবনকে সেবাযজ্ঞময় করে তোলার মধ্যেই তার প্রকাশ। অনাসক্ত সেবাকর্মের যোগসাধনায় জনগণকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী 'অনাসক্তিযোগ' নামেই এই অভিনব গীতাভাষ্য রচনা করেছেন।

মোক্ষলাভের আরেকটি পথ রাজযোগ এবং সে পথের নির্দেশ রয়েছে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ শ্লোকে। তাতে বলা হয়েছে যে বাহ্য বিষয় থেকে মন সরিয়ে ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমে ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মুনি কালাতিপাত করেন তিনিও জীবন্মুক্ত।

কিন্তু এ হলো জনসমাজ ও গৃহস্থ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মুনিঋষিদের তপঃ-সাধনার ব্যাপার। তাই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ, তিলক মহারাজ ও মহাত্মা গান্ধীর গীতাভাষ্যে রাজযোগ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা নেই।

যাই হোক, এসবই হলো বিভিন্ন গীতাভাষ্যের কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা এই গীতার আলোয় আমরা যদি মূল মহাভারতকে বিশ্লেষণ করি তাহলে মহাভারতীয় যুগের ভারতসমাজের রূপ আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে উক্ত অর্জুনের যে প্রশ্ন থেকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথন শুরু এবং যে কারণ দেখিয়ে গাণ্ডীবধারী তৃতীয় পাণ্ডব ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকার্ত হয়ে রথে বসে পড়ছিলেন সেই শ্লোক কয়টির মধ্যেই তখনকার একটা সমাজকাঠামো আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যুদ্ধে নিবৃত্ত হবার জন্যে সারথি কৃষ্ণকে বিপক্ষের দিকে সঙ্কেত করে অর্জুন বলছেন, 'যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয়জনিত অপরাধ ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখছেন না, কিন্তু হে জনার্দন, বংশনাশের দোষ বুঝতে পেরেও আমরা কেন এই পাপ কাজে নিবৃত্ত থাকবো না?' এরপরেই অর্জুন বলেছেন, 'কুলনাশে অনুষ্ঠাতার অভাবে চিরাচরিত কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে সমগ্র কুলকে অনাচার ও অধর্মে অভিভূত হতে হয়।' কী পরিণতি ঘটে তার? সে বর্ণনাও পাই আমরা অর্জুন মুখে। তিনি বলেছেন, 'অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুললক্ষ্মীরা দুষ্টা হয়ে যায় এবং তখনই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হয়।'

আপন অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞান থেকেই যে অর্জুন এসব কথা তাঁর সখা-সারথিকে বলে থাকবেন এবং 'কুলনাশকরূপে নিরন্তর নরকবাসের ভয়ে' সংগ্রাম-বিমুখ হয়ে থাকবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্জুনের প্রশ্ন এবং তাঁর নিষ্ক্রিয়ভাবের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে দেবস্বভাব ও অসুর-স্বভাব মানুষের

সৃষ্টির কথা বলেছেন। এই উভয় শ্রেণীর মানুষেরই বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে গীতায় এবং এই উভয় শ্রেণীর মানুষের কার্যকলাপের ও চরিত্রের পরিচয়ও রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে পঞ্চ-পাণ্ডব ছাড়াও ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ ও গান্ধারী প্রমুখ সজ্জনের যেমন অভাব ছিল না মহাভারতীয় যুগের ভারতবর্ষে তেমনি শকুনি, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি-সহ দুর্যোধনাদি ক্রুরকর্মা ও আসুর-প্রকৃতির দুর্জনও ছিল দেশের সর্বত্র। একালের মতো সেকালেও ভারতে চৌর্যবৃত্তি ও দস্যুতা ছিল, বর্ণসঙ্কর ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনানুযায়ী তখনও দেশে এমন সব লোক ছিল যারা মনে করতো 'এই জগৎ সত্যশূন্য ও ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাহীন' এবং যাদের কাছে 'কামভোগই ছিল জীবনের পরম পুরুষার্থ'···আর যারা 'কাম-ক্রোধের অধীন হয়ে বিষয়ভোগের জন্যে আমৃত্যু অসদুপায়ে অর্থসম্পদ সংগ্রহে সচেষ্ট থাকতো।' তখনো সমাজে বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল; সেকালেও পাশা বা জুয়াখেলার রেওয়াজ ছিল; সহমরণও যেমন চলতো, অনেক নারী আবার বৈধব্য-জীবনও যাপন করতো।

গীতায় তৎকালীন সামাজিক উদারতার আরেকটি দৃষ্টান্তের দিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। নীচকুলোদ্ভব, পতিত বা স্ত্রীলোক বলেই তারা উপেক্ষণীয় এবং তাদের উদ্ধারপথ নেই, একথা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যায়ের চারটি (৩০-৩৩) শ্লোকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, নিতান্ত দুরাচারও যদি অনন্য মনে ঈশ্বরের ভজনা করে তা হলে তাকে সাধু বলেই গণ্য করতে হবে, কারণ তার মধ্যে সাধু সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে। সেও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে চিরশান্তি লাভ করবে। তারপরেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যারা নীচ কুলোদ্ভব কিংবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র তারাও ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এ থেকেই বুঝা যায়, সে যুগে গুণগতভাবে ভারতে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস থাকলেও কোনো শ্রেণীর মানুষকেই উপেক্ষা করা হতো না। এমনিভাবেই সবদিক থেকে গীতার বিচারে মহাভারতীয় যুগের ভারত-সমাজের বিশ্লেষণ করা চলে।

আর জ্ঞাতিবিরোধ? সেও তো চিরন্তন। লোভ এবং অবিশ্বাসের ফলেই তার সৃষ্টি। আর তারই পরিণতি যত সব যুদ্ধবিগ্রহ। ভূ-ভার হরণই যদি সব যুদ্ধের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ অনুপ্রাণিত কুরুক্ষেত্র-সমর তবে জ্ঞাতিবিরোধ ও যুদ্ধের এক চূড়ান্ত রূপ। গীতার শিক্ষাও তাই শাশ্বত।

রাজা শূদ্রকের যুগে এদেশের জন-জীবন

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আত্মজীবনীর একান্ত অভাবের কথা সুপরিজ্ঞাত। তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে প্রাচীন ভারতের কোনো সাহিত্য-রথীই যে স্বীয় পরিচয় রেখে যান নি তা ঠিক নয়। খৃষ্টপূর্ব কালের ভারতবর্ষে অন্তত একজন কবির সন্ধান পাওয়া যায় যাঁর আত্মকথা খুব সংক্ষেপে হলেও 'স্বরচিত' অমর কাব্যনাটক 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

একটি প্রণয়কাহিনী নাটকটির বিষয়বস্তু। তার নায়ক ব্রাহ্মণ যুবক চারুদত্ত এবং নায়িকা ঐ যুবকেরই প্রণয়িনী রাজনটী বসন্তসেনা। মাটির তৈরি শকট যেমন চলে না তেমনি বারবনিতার প্রেমও অর্থহীন অচল, এ-কথাই কবি-নাট্যকার তাঁর অনন্য রচনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বসন্তসেনা চরিত্রটি সত্যি এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং সংস্কৃত সাহিত্যে এর তুলনা বিরল। বিবিধ রসঘন এই নাটকে শুধু প্রেম-প্রণয় নয়, দয়াদাক্ষিণ্য ও ত্যাগের মহিমা এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবের নানা চিত্রও এতে অতি সুন্দরভাবে সুনিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নান্দীপাঠের পর গ্রন্থে সূত্রধারের যে মন্তব্য রয়েছে তাতেই প্রকাশ যে 'মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা কবি শূদ্রক। ঐ কবি-নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ও পাওয়া যায় সেখান থেকেই। সূত্রধারের মন্তব্য পাঠে আমরা জানতে পারি যে গমন-গতিতে শূদ্রক ছিলেন হস্তিরাজের মতো, তাঁর চোখ দুটি ছিল চকোর পাখির ন্যায়, মুখমণ্ডল যেন পূর্ণচন্দ্র এবং তিনি ছিলেন দ্বিজগণের মধ্যে মুখ্যতম ও অমিতবলশালী।

সূত্রধারের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে, কবি শূদ্রক ঋগ্বেদ, সামবেদ, গণিতশাস্ত্র, কলাবিদ্যা ও হস্তিশাস্ত্র শিক্ষা করে মহেশ্বরের দয়ায় তিনিররোগশূন্য নয়নযুগল (জ্ঞানচক্ষু) লাভ করেছিলেন। তারপর পুত্রকে যথাসময়ে রাজ্যের অধীশ্বর দেখে বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন এবং একশ বছর দশ দিন আয়ু ভোগ করে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। 'মৃচ্ছকটিকে'র লেখক-পরিচয়ে এও রয়েছে যে, রাজা শূদ্রক ছিলেন যুদ্ধে উৎসাহী, প্রমাদশূন্য, বেদজ্ঞদের মধ্যে প্রধান তপস্বী এবং শত্রুপক্ষীয় হস্তিগণের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে অভিলাষী।

সূত্রধারের বর্ণনা থেকে কবি শূদ্রকের মোটামুটি এরূপ পরিচয় পাওয়া গেলেও শূদ্রক আদৌ 'মৃচ্ছকটিক' রচয়িতা কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। একদল

পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন যে, শূদ্রকই যদি এই নাটকের প্রণেতা তাহলে কেমন করে তিনি এই গ্রন্থেই নিজের মৃত্যুর কথা বল্লেন, কী করে তিনি বলতে পারলেন, 'শূদ্রক শতবর্ষ দশদিন জীবিত ছিলেন'? তাই এ-সব পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা, শূদ্রকের পুত্র রাজা হলে সেই নতুন রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কোনো প্রতিভাধর নাট্যকার শূদ্রকের নামে এই নাটকখানি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ-মতের পাল্টা জবাব এসেছে বিপক্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদের তরফ থেকে। তাঁরা বলেছেন যে, শূদ্রক জ্যোতিষী গণনা দ্বারা নিজের আয়ুষ্কাল জানতে পেরেছিলেন এবং সে কারণেই আপন পরমায়ু ও মৃত্যুর কথা স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের কথা 'ভাবিনি ভূতোপচার' ব্যাকরণের এই সূত্র অনুসারেই শূদ্রক ভবিষ্যদর্থে অতীতকালের প্রয়োগ করেছিলেন। সূত্রধার বর্ণিত যে শ্লোকটিতে রাজার মৃত্যুর উল্লেখ ('অগ্নিতে প্রবিষ্ট' হবার কথা) রয়েছে সেখানে 'প্রবিষ্টঃ' কথাটির অর্থ 'প্রবেক্ষ্যতি' অর্থাৎ 'প্রবেশ করবেন' ধরে নিতে হবে, এই তাঁদের যুক্তি। কিন্তু একালের মানুষের পক্ষে এই যুক্তি বা মতবাদ মেনে নেওয়া কঠিন; যদিও 'মৃচ্ছকটিকে'র রচয়িতা বলতে এতাবৎ রাজা শূদ্রককেই বুঝিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও সেটাই চালু থাকবে।

যাইহোক 'মৃচ্ছকটিক' থেকেই জানা যায় রাজা শূদ্রক ছিলেন বিদিশা রাজ্যের অধীশ্বর। তবে তাঁর রাজত্বকালের যথার্থ সময় আজো অবধি নিরূপিত হয়নি, যদিও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে খৃষ্টজন্মের আগের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কবি শূদ্রক, তবু তা নিয়েও মতভেদ আছে। চলতি মতবাদের বিরুদ্ধে যারা পাল্টা যুক্তির অবতারণা করেছেন তাঁদের মধ্যে কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেব এরূপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে, 'শূদ্রক ছিলেন মগধের অন্ধ্র-রাজবংশের প্রথম রাজা। তিনি আনুমানিক ১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন।' স্বর্গত মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনূদিত 'মৃচ্ছকটিকে'র বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও করেছেন যে, সমস্ত প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে 'মৃচ্ছকটিক' যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

সে যাইহোক না 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রাচীনত্ব বিচারে এবং সমকালীন সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লিখিত ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান। তা নিয়ে এবং 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পরিবেশ ও বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলে কবি-নাট্যকার শূদ্রকের আত্মপরিচয়ের পটভূমিকায় আমরা তাঁর কালের একটি সমাজচিত্রকে সহজেই অনুমান করে নিতে পারবো।

চলতি কিংবদন্তী অনুসারে শূদ্রকের রাজত্বকাল শকারি বিক্রমাদিত্যেরও (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ?) পূর্ববর্তী। তা যদি সত্য হয় তাহলে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই শূদ্রকের শাসনকাল স্থির করতে হয়। তবে এ বিষয় নিয়ে যত মতভেদই থাক না কেন, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির প্রাচীনত্বের আরেকটি নিদর্শনও উদ্ধার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, নাটকটিতে 'নানক' নামের উল্লেখ আছে। এই 'নানক' নামের মুদ্রা কাশ্মীরাধিপতি শকবংশীয় রাজা কণিষ্কের সময়ে প্রচলিত ছিল। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই (পুরুষপুরে) বৌদ্ধ সম্মেলনের সমাবেশ হয়েছিল। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর একটি বিশেষ পদবী ছিল 'বাসুদেব'। প্রকৃতপক্ষে কণিষ্ক কাশ্মীর এবং সমগ্র উত্তর ভারতেরই সম্রাট ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনে করেন, এই সার্বভৌম 'বাসুদেব' কণিষ্ককে লক্ষ্য করেই নাট্যকার শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের অন্যতম পার্শ্ব-চরিত্র 'শকার'কে দিয়ে এই বলে আস্ফালন-উক্তি করিয়েছেন, 'আমি কি যে-সে লোক ?—আমি দ্বিতীয় বাসুদেব।'

কণিষ্কের শাসনকাল নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একদল কণিষ্ককে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে এবং অপর দল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে স্থাপন করার পক্ষপাতী। তবে এই মতবিরোধ মীমাংসার একটি সূত্র রয়েছে। সেই সূত্র থেকেই এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এক্ষেত্রে প্রথম দলের মতই অধিকতর যুক্তিসহ, সুতরাং গ্রহণীয়। কণিষ্কই যে ভারতে শকাব্দের প্রবর্তক তা বর্তমানে একরূপ সর্বজনস্বীকৃত। ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষাংশেই কুষাণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যে সব বৈদেশিক জাতি ভারতে শাসনক্ষমতা অধিকারে সমর্থ হয়েছিল তার মধ্যে উত্তর পশ্চিম চীনের ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতির অন্তর্ভুক্ত কুষাণ বংশের স্থান অতি উচ্চে। এও উল্লেখ্য যে, চীনের এক যাযাবর জাতির অংশ হলেও কুষাণ রাজগণ ধীরে ধীরে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। কুষাণশ্রেষ্ঠ কণিষ্ক শুধু ভারত-ধর্মকে মনে-প্রাণে গ্রহণই করেননি, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়ে তিনি সেই ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ভারত-ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। বৌদ্ধ হলেও কণিষ্ক অন্যান্য ভারতীয় দেবদেবী এমন কি গ্রীক, পারসিক ও

সুমারীয় দেবতাদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর শাসনকালের মুদ্রায় অঙ্কিত দেবদেবীর মূর্তিই তার প্রমাণ। দেবমূর্তিতে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। সেই কারণেই তাঁর সময় থেকে বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রচলন শুরু হয় এবং নিরাকার বৌদ্ধধর্মের (হীনযান) চেয়ে সাকার বৌদ্ধধর্মের (মহাযান) প্রতি দেশে-বিদেশে অনেক বেশি লোক আকৃষ্ট হতে থাকে। বসুমিত্র, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রমুখ বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতাগণ কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন এবং তাঁর যুগেই 'গন্ধার শিল্প' ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।

মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মৃচ্ছকটিকে'র 'বাসুদেব' প্রসঙ্গ আলোচনায় 'বাসুদেব' নামক একটি পদবী কণিষ্কের ওপর আরোপ করেছেন বটে, কিন্তু পুরোপুরি এই ভারতীয় নামেই একজন কুষাণরাজাকে কুষাণ সিংহাসনে দেখা যায়। কণিষ্কের পর বাশিষ্ট ও তাঁর পরে হাবিষ্ক 'মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পরের রাজা হাবিষ্ক-তনয় দ্বিতীয় কণিষ্ক এবং তৎপরবর্তী রাজাই হলেন বাসুদেব।

সে যাই হোক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সে-সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। কিন্তু তাই বলে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে কোনোরূপ বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। যদিও প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতি অনুসারেই পূজার্চনা ও ক্রিয়াকর্মাদি অনুসৃত হতো, তবু বৌদ্ধধর্মের প্রতিও সাধারণ মানুষের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং তাদের জীবনাচরণেও বৌদ্ধ-নীতির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হতো।

অনূদিত 'মৃচ্ছকটিকে'র ভূমিকায় আরো বলা হয়েছে যে, 'যে যেমন ধর্ম করে পরলোকে তার তেমনি গতি হয়ে থাকে', 'অসৎকুলে জন্মগ্রহণ করলেই অসৎ হয় না', 'ধর্মার্জন উচ্চনীচ সকল লোকেরই সাধ্যায়ত্ত ও সাধনাসাপেক্ষ', 'আত্মসংযমী হবে', 'প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করবে, শরণাগত-জনকে আশ্রয় দেবে', 'সত্য পালন করবে' ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের নীতিমূলক শিক্ষাগুলিকে এই নাটকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে।

সমাজে চিরকালই সজ্জন ও দুর্জন এই উভয় প্রকারের লোকই দেখতে পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিকে' এই দুই শ্রেণীর চরিত্রই পাশাপাশি বাস্তবরূপ পেয়েছে। একদিকে ব্রাহ্মণ বণিক চারুদত্ত যেমনি আদর্শ-চরিত্র সাধুজনের প্রতীকস্বরূপ, অন্যদিকে রাজার শ্যালক শকার তেমনি দুরাচারী ও হীনচরিত্র মানুষের প্রতিরূপ। উচ্চ কুলোদ্ভব হয়েও শকার এমনি অধঃপতিত অথচ তারই দাস স্থাবরক একান্ত-ভাবেই ধর্মপরায়ণ। ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালেই যে মানুষ সৎ হবে তেমন কথা নেই।

রাজনটী বসন্তসেনার দাসী মদনিকার প্রণয়ী ও চূড়ান্ত অসৎ ব্রাহ্মণ-চোর শার্বিলক তার প্রমাণ। অথচ বারঙ্গণা-গৃহে জন্মগ্রহণ করলেও বসন্তসেনার কত গুণ—কত মহৎ সে!

তখনকার দিনে ভারতে দাস-প্রথার যে খুবই ব্যাপকতা ছিল, এই নাটকে বহুদাস-দাসীর আমদানী থেকেই তা ধরে নেওয়া যায়। বসন্তসেনা ও তার প্রাসাদ-ভবন এবং বিলাস-বৈভবের যে বিবরণ দেওয়া রয়েছে 'মৃচ্ছকটিকে' তা থেকে এ অনুমানও স্বাবাভিক যে সেকালে বারবনিতাদের একটি উচ্চশ্রেণী ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেরূপ ধারণা এ প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

সমাজচিত্রের অন্যান্য আরো অনেক দিকই স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছে এই নাটকটিতে। সাধারণ রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার তো বটেই তখনকার বিচার-ব্যবস্থা আইন-আদালত ও নগররক্ষায় পুলিশ-চৌকিদার প্রভৃতির কর্মধারার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় সেখান থেকে। সে যুগের দণ্ডবিধানরীতি সম্বন্ধে এই কাব্য-নাটকের বর্ণনা বিচারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় যে মন্তব্য রেখেছেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'সে সময়কার সরল বিচারপদ্ধতিতে যদিও এখনকার ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ছিল না, তবু দেখা যায়, সুবিচারের দিকে বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং বিশুদ্ধ রীতি অনুসারেও বিচারকার্য সম্পাদিত হইত। তবে দণ্ডবিধানের ক্ষমতা রাজার হস্তে থাকায়, বাস্তবিক সুবিচার হওয়া না হওয়া অনেকটা রাজার উপর নির্ভর করিত।' সত্যিসত্যি তাই—রাজতন্ত্রের সেটাই চরিত্র। দণ্ডদান ইত্যাদি ব্যাপারে রাজার মর্জি তথা তাঁর কথাই শেষ কথা।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পাত্রদের মধ্যে আমরা কয়েকজন জুয়ারীর সাক্ষাৎ পাই এবং জুয়ার আড্ডার চিত্রও পরিবেশিত হয়েছে নাটকটিতে। সমাজের আরেকটি দিক এখানে উদঘাটিত। বুদ্ধি-পরামর্শাদির জন্যে রাজা ও রাজকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণ পারিষদ হিসাবে নিয়োগ করতেন সেকালের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এবং হাস্যপরিহাসের জন্যে রাখতেন বিদূষক। 'মৃচ্ছকটিকে'ও আমরা সেই প্রাচীন প্রথামত বিদূষকের সাক্ষাৎ পাই, তবে তার হাস্যরস অন্যসব বিদূষকের চেয়ে যেন একটু উঁচুস্তরের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এবিষয়ে সেরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। তখন পণ্ডিতদের প্রভাব সমাজে যে কিরূপ ছিল তা এই নাটক থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই বুঝানো যেতে পারে। রাজা-মহারাজারা তো বটেই এমনকি শকারের মতো লোকও সেকালে

পণ্ডিত-পরিষদ রাখতো। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রাণ-হননের কাজ করতো জল্লাদেরা এবং সে-কাজের ভার ছিল চণ্ডাল শ্রেণীর ওপর।

'মৃচ্ছকটিকে' রাষ্ট্রবিপ্লবের যে চিত্র পাওয়া যায় এখানে তাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। উজ্জয়িনীর অবিচারী রাজা পালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করে বসেছেন গোপালক আর্যক। শকারের চক্রান্তে 'বসন্তসেনার হত্যাকারী' এই মিথ্যা অভিযোগে রাজাদেশে মহামতি চারুদত্ত যখন শূলবিদ্ধ হতে চলেছিলেন তারই প্রাক মুহূর্তে কারাগার থেকে পলাতক আর্যক তাঁর বিদ্রোহীবাহিনী নিয়ে পালকের পতন ঘটিয়ে চারুদত্তের মুক্তি ঘোষণা করে দিলেন। মৃতা বলে ঘোষিতা বসন্তসেনা তখন বধ্যভূমিতে সশরীরে উপস্থিত। কিন্তু এখনেই বিস্ময়ের শেষ নয়। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত। চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা সহমরণের জন্যে প্রস্তুত। যখন তাঁকে ঋষিবাক্য শুনিয়ে বোঝানো হচ্ছিলো যে, 'স্বামীর সঙ্গে একত্রে চিতারোহণ না করে ভিন্ন চিতায় আরোহণ করা ব্রাহ্মণীর পক্ষে পাপ', ঠিক সেই সময়েই তাঁর পাশে হঠাৎ চারুদত্তের আবির্ভাবে সবাই অবাক। চতুর্দিকে আনন্দ-হিল্লোল। এখানেও ধর্মের জয়ই সূচিত।

এমনিভাবেই শূদ্রকের আত্মকথা ও তাঁর রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণে খৃষ্টজন্ম-পূর্ব (কিংবা সমূহ পরের) ভারতীয় সমাজের প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সে যুগে যুদ্ধোৎসাহী নৃপতিবর্গও যে নানা বিদ্যা আহরণে ও যাগযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকতেন কবি-নাট্যকার রাজা শূদ্রক তার প্রমাণ, এবং জাগতিক সমস্ত কর্তব্য শেষে তখনকার জ্ঞানী মানুষেরা যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন সূত্রধারের মুখে নিতান্ত আলৌকিকভাবেই আপন মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে তারও প্রমাণ রেখে গেছেন রাজা শূদ্রক।

অন্যায়কারী শত্রুও যদি শরণাগত হয় তাকে রক্ষা করা কর্তব্য, নাট্যকার শূদ্রক সেকালের এই পরম শিক্ষাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'মৃচ্ছকটিকে'র মাধ্যমে।

কবি শ্রীহর্ষ হর্ষদেব ও ভবভূতির যুগ

প্রাচীন ভারতের সমাজ-বিবর্তনের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে যে-সব অন্তরায় ও অসুবিধা রয়েছে তা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সেকালের কবিকুল সাধারণত আত্মপরিচয়দানে বিমুখ ছিলেন বলেই তাঁদের রচিত গ্রন্থাদির রচনাকালপর্যন্ত স্থির করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অতি সামান্য কবি-পরিচয়ের সন্ধান মেলে বটে, কিন্তু তাতে না মেটে কবিকে জানবার আগ্রহ, না সুযোগ পাওয়া যায় সঠিকভাবে তাঁর কালকে জানবার।

'নৈষধচরিত' রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কবি তাঁর 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের প্রথম সর্গের উপসংহারে নিজের সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা প্রকাশ করেছেন তা থেকে শুধুমাত্র তাঁর পিতামাতার নাম-পরিচয় এবং যে গ্রন্থ রচনায় তিনি হাত দিয়েছেন তা কিসের ফল ও কী তার স্বরূপ, সেটুকুই আমরা জানতে পারি।

দুটি মাত্র শ্লোকে শ্রীহর্ষ বলেছেন, কবিশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে যিনি হীরকসদৃশ সেই শ্রীহীরদেব ও মামল্ল দেবীর জিতেন্দ্রিয় পুত্র শ্রীহর্ষ। তাঁর ব্রহ্মধ্যানের ফলে রচিত ও শৃঙ্গাররসের বিন্যাসবিশেষে রমণীয় 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের প্রথম সর্গ সমাপ্ত হলো।

'নৈষধচরিত' নিষধরাজ নলের চরিত-কথা। বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী স্বয়ংবর-সভায় দেবগণকে উপেক্ষা করে নলরাজাকে স্বামীরূপে বরণ করলে কলি ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ রাজদম্পতির জীবনে যে দুর্দৈব ঘটিয়েছিলেন এবং হৃতরাজ্য ও নিরুদ্দিষ্টা রাণীকে উদ্ধার করে পরে সত্যনিষ্ঠ নল যেভাবে শান্তির সংসার পেতেছিলেন মহাভারতীয় যুগের সেই অতি প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর কথা সবারই জানা। সে সমাজে স্বয়ংবর-সভায় মেয়েদের স্বামী নিরূপণের রেওয়াজ ছিল, আজকের মতোই তখনো ঈর্ষা-দ্বেষ ও ভ্রাতৃবিরোধের দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না এবং দ্যূতক্রীড়া জাতীয় জুয়াও সে সময় চালু ছিল। তবে এ-সবই মহাভারতীয় যুগের সমাজ-চিত্র। কারণ নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানটি মহাভারতেরই একটি কাহিনী। কাজেই 'নৈষধচরিত' থেকে এ গ্রন্থের রচনাকালের ভারতীয় সমাজরূপ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করা যায় না, যেমন বিন্দুমাত্র আভাষও পাওয়া যায় না সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার শ্রীহর্ষের দুটি শ্লোকের আত্মকথা থেকে। এ বাস্তবিকই দুঃখের কথা।

'নষধচরিতে'র কবি শ্রীহর্ষ ছাড়া শ্রীহর্ষদেব নামে আরেকজন কাব্য-নাটক রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় অতীত ভারতের ইতিহাসে। তিনি 'নাগানন্দ' 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামের তিনখানি সংস্কৃত নাটকের লেখক বলে ভারতীয় সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। কিন্তু এই কবি-নাট্যকার পরিচয়ই তাঁর সব পরিচয় নয়, এই শ্রীহর্ষদেবই হলেন উত্তর ভারতের সপ্তম শতাব্দীর মহামহিমান্বিত সম্রাট হর্ষবর্ধন।

পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে বাঙালী পাঠকের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পূর্বোক্ত তিনখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত। এ কয়খানি অনূদিত নাটকেরই তিনি একটি করে ভূমিকা লিখেছেন। মূল নাটক কয়খানির প্রকৃত রচয়িতা কে, এই প্রশ্ন নিয়ে যে সংশয় ও মতান্তর রয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি চলতি মতবাদকেই মেনে নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে উইলসন, ডাক্তার হল ও জার্মান পণ্ডিত এবার প্রমুখ মনীষীদের মতামত নিয়ে 'রত্নাবলী' নাটকের মুখবন্ধে 'অনুবাদকের মন্তব্য' শীর্ষক একটি আলোচনা রয়েছে। তাতে অনুবাদকের নিজস্ব সঠিক মত কিছু পাওয়া না গেলেও অনূদিত 'নাগানন্দ' নাটকের ভূমিকার উপসংহারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'শ্রীহর্ষদেব (হর্ষবর্ধন) দ্বিতীয় শিলাদিত্য নামে ইতিহাসখ্যাত। তিনি খৃষ্টাব্দ ৬০৬ হইতে ৬৪৮ পর্যন্ত কনৌজে রাজত্ব করেন।' পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি এই সময়কেই শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকাল বলে উল্লেখ করেছেন।

'নাগানন্দ' নাটক পড়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে যে, নাট্যকার হয় বৌদ্ধ ছিলেন আর নয়তো বা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তাই বলে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কোনো অভাব কখনো দেখা দেয়নি। অহিংসা পরম ধর্ম—এই বৌদ্ধ নীতি-সূত্রটি 'নাগানন্দ' নাটকে যেমনি প্রতিপাদিত হয়েছে এবং বোধিসত্ত্বদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই নাট্যকার এই নাটকে ইন্দ্র-গৌরী ইত্যাদি হিন্দু দেব-দেবীদের সুগভীর শ্রদ্ধাযুক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে হিউয়েন-সাঙ তাঁর ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রীহর্ষদেবের ধর্মমত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, শ্রীহর্ষদেব কখনো কখনো বৌদ্ধধর্মের দিকে, আবার কখনো বা হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়তেন, তিনি সময় সময় বুদ্ধ-মূর্তিকে, আবার অনেক

সময় সূর্যদেব ও মহেশ্বর মূর্তিকে উচ্চাসন দিতেন। তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধ-মঠ ও হিন্দু-মন্দির উভয়েরই সংখ্যা প্রায় সমান সমানই ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাগানন্দ' নাটকের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় হিউয়েন সাঙ-এর মন্তব্যের উল্লেখ করে শ্রীহর্ষদেবের ধর্মমত বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তবে নাটকটি পড়লেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শুধু রাজার বেলাতেই নয়, ঐ সময়ে ভারতীয় জনসমাজের ওপরেও হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মমতেরই ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যেতো।

শ্রীহর্ষদেব বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'নাগানন্দে'র কাহিনীও বহুপ্রচলিত। পরার্থে আত্মদানের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে ভ্রমণকালে অকস্মাৎ প্রচুর নাগাস্থি দর্শনে বেদনার্ত হয়ে ওঠেন। অনুসন্ধানে তিনি জানতে পান যে, পক্ষিরাজ গরুড়ের কাছে প্রতিদিন একটি সাপকে আত্মাহুতি দিতে হয়—নাগরাজ বাসুকির সঙ্গে গরুড়ের এই চুক্তি। নাগকুলকে পুরোপুরি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যেই এপথ বেছে নিতে হয়েছে বাসুকিকে এবং সমুদ্র তীরের ঐ নাগাস্থিস্তূপ তারই ফল। পরদিন শঙ্খচূড় নাগের পালা—গরুড়ের উদরপূর্তি হবে তাকে দিয়েই। শুনেই জীমূতবাহন নিজের জীবন দিয়ে শঙ্খচূড়কে রক্ষার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র কয়েক দিন আগে সিদ্ধরাজকন্যা মলয়বতীর পাণিগ্রহণ করেছেন জীমূতবাহন। তবু পরের জন্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না। যে জনক-জননীর সেবার জন্যে রাজসুখ-ভোগ ত্যাগ করে তিনি অরণ্যবাসী, তাঁদের চিন্তাও তাঁকে একটুও টলাতে পারলো না। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে শঙ্খচূড় বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হলে তার রোরুদ্যমানা জননীর কাতর-ধ্বনি জীমূতবাহনকে এতই বিচলিত করলো যে তিনি সেই বৃদ্ধার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন আপন জীবন দিয়ে তাঁর পুত্রের জীবনরক্ষার জন্যে। কিন্তু বৃদ্ধা বাধা দিতে চাইলেন তাঁকে, তাঁকে সেই ভয়াবহ সঙ্কল্প ত্যাগের অনুরোধ জানালেন। কারণ জীমূতবাহনও যে তাঁর কাছে পুত্রবৎ! কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, তাঁকে প্রতি নিবৃত্ত করা গেল না। শঙ্খচূড়ের অনেক অনুনয়বিনয়েও তিনি ফিরে যেতে রাজী হলেন না। এদিকে গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এলো। আর বিলম্ব করলে ক্ষিপ্ত গরুড় নাগকুলের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেবে, এই ভেবে শঙ্খচূড় নাগরাজের আদেশ পালনের পূর্বে একবার ভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে আসবার জন্যে মায়ের সঙ্গে সিন্ধু-তীরস্থ দক্ষিণগোকর্ণ শিব-মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক

সেই সময়েই গরুড়ের আবির্ভাব ঘটলে তাঁর ইচ্ছা সহজেই পূর্ণ হতে পারতো —এমনিধারা ভাবছিলেন জীমূতবাহন। কিন্তু বধ্যচিহ্ন রক্তবস্ত্র কোথায় তাঁর সঙ্গে? শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে তিনি তো তা আদায় করতে পারলেন না! তবে কি পরার্থে আত্মদানের অভিলাষ তাঁর পূর্ণ হবে না? ঠিক সেই মুহূর্তেই মলয়বতীর জননী সিদ্ধরাণী কর্তৃক প্রেরিত একজোড়া মাঙ্গলিক রক্তবস্ত্র নিয়ে কঞ্চুকী এসে সেখানে উপস্থিত। জামাতা জীমূতবাহন তা পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়ে সেই রক্তবস্ত্রে আবৃত হয়ে বধ্যশিলায় গিয়ে বসে রইলেন। ক্ষণকাল পরেই গরুড় ঝটিকা বেগে চারদিক কাঁপিয়ে সেখানে নেমে এসে জীমূতবাহনকে নিয়ে মলয় পর্বতের উচ্চ শিখরে উড়ে চলে গেল। এদিকে সমুদ্রভ্রমণ থেকে জামাতার ফিরে আসতে অত্যধিক বিলম্ব হওয়ায় সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর লোকজনেরা চারদিকে জীমূতবাহনের খোঁজ-খবর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জীমূতকেতুর আশ্রমে এসে দেখা গেল, আশ্রমবাসী বিদ্যাধররাজ বৃদ্ধা স্ত্রী আর পুত্রবধূ মলয়বতীকে নিয়ে বসে আছেন। প্রতিহারীর কথায় তাঁরা তিনজনই অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন। হঠাৎ এর মধ্যে রক্তাক্ত মাংস-লগ্ন কার চূড়ামণি পড়লো তাঁদের সামনে? এ যে আমার জীমূতবাহনের।—চিৎকার করে উঠলেন জীমূত-জননী। তাঁর আন্দাজই ঠিক। জীমূতবাহনের কান্তিময় দেহভোজনে পক্ষিরাজ পরিতৃপ্ত। সেই ভক্ষ্যস্থল মলয় পর্বত-শিখর থেকেই তাঁর মাথার চূড়ার মণিখণ্ড আশ্রম-ভূমিতে এসে পড়েছে। আলুলায়িতা শোকবিধুরা পুত্রবধূ ও স্ত্রীকে নিয়ে জীমূতকেতু সেই পর্বত-শিখরে গিয়ে উঠলেন। শঙ্খচূড়ও সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত। মহাত্মা জীমূতবাহনের আত্মত্যাগে গরুড় তখন বিস্ময়বিমূঢ়—নির্বেদ হয়ে নাগহিংসায় চিরতরে বিরত থাকতে স্থিরসঙ্কল্প। সেই পরিবেশে জীমূত-বাহনের জায়া ও জনক-জননী যখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে যাবেন ঠিক তখনই গৌরীদেবী সেখানে আবির্ভূতা হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন এবং জীমূত-বাহনকে পুনর্জ্জীবিত করলেন।

'নাগানন্দ' নাটকের এই হলো মূল কাহিনী এবং এ কাহিনীর সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেই মোটামুটি পরিচিত। এই নাটকটি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি সামাজিক বিষয়ের দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়দের মধ্যে এরূপ একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মানুষ অপেক্ষা উন্নত এবং দেবতাদের অধম এমন কয়েক শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে এই বিশ্বজগতে যারা সাধারণত 'দেবযোনি' নামে পরিচিত এবং যাদের মধ্যে যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সর,

কিন্নর, বিদ্যাধর, সিদ্ধ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে বার-বার এদের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে এবং বিদ্যাধররাজ ও সিদ্ধরাজ পরিবারের কুটুম্বিতাকে ঘিরেই 'নাগানন্দ' নাটকখানি রচিত হয়েছে। এধরনের জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রীহর্ষদেবের যুগেও লোকের মনে একটা বিশ্বাস ছিল, এই নাটক থেকে এ ধারণা করা যেতে পারে। অথবা বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর আস্থাশীল সম্রাট হর্ষবর্ধন অহিংস মতবাদের প্রসারকল্পে এই রূপকধর্মী নাটকখানি প্রণয়ন করে থাকবেন।

সে যুগের ভারতীর সমাজে পিতৃমাতৃভক্তি যে কিরূপ আদর্শস্থানীয় ছিল জীমূতবাহনের জীবন তারও এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু পুত্র জীমূতবাহনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে নতুন রাজা মোটেই খুশি হতে পারেননি' বিশ্বাসী ও যোগ্য অমাত্যবর্গের হাতে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করে জীমূতবাহন পিতা-মাতার সেবার জন্যে তপোবনে চলে গিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে বিবাহিতা যুবতীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হতো বিশেষ করে অবিবাহিত যুবকদের পক্ষে। তাই বন্ধু আত্রেয়কে নিয়ে জীমূতবাহন যখন তপোবনে ভ্রমণ করছিলেন সে সময়ে বীণাবাদনরতা মলয়বতীর দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন না। কিন্তু আত্রেয় যখন জানালেন যে ঐ তরুণী কুমারী, তখনই জীমূতবাহন বল্লেন, তিনি যদি কুমারী তাহলে তাঁকে দেখতে দোষ নেই। তারপরেই মলয়বতীর সঙ্গে জীমূতবহনের সাক্ষাৎ এবং তারই পরিণতি উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার উদ্রেক ও বিবাহ।

সেযুগে গুরুজ্ঞানে অতিথি সৎকার, দেবভক্তি, সংসারবন্ধন ইত্যাদি সামাজিক নানা লক্ষণই 'নাগানন্দ' নাটকে যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে।

'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী এবং 'প্রিয়দর্শিকা' এই তিনখানি নাটকের রচয়িতা শ্রীহর্ষদেব, এতাবৎ একথাই প্রচারিত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও তা গ্রাহ্য হয়নি। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্বোক্ত তিনটি নাটকেই নাট্যকার সূত্রধারের মাধ্যমে যে অতি সামান্য আত্মপরিচয় রেখেছেন তা যথাযথ বিচার করে দেখলে প্রত্যেকেরই এরূপ মনে হবে, তিনখানি নাটকই একই কবির লেখা এবং শ্রীহর্ষদেবই সেই কবি।

নান্দীর পর 'নাগানন্দ' নাটকে সূত্রধার বলেছেন, 'অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নেই। মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের পাদপদ্মোপজীবী যে সব রাজা মহারাজের সাদর

আহ্বানে দেশদেশান্তর থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা আজ আমায় বলেছেন, 'আমাদের প্রভু মহারাজ শ্রীহর্ষদেব অপূর্ব কাহিনী ভূষিত এবং বিদ্যাধর-অধীশ্বরযুক্ত 'নাগানন্দ' নামে যে নাটকখানি রচনা করেছেন শুধুমাত্র লোকমুখেই আমরা তার কথা শুনেছি, সে-নাটকের অভিনয় আমরা কখনো দেখিনি। সুতরাং সর্বজন-হৃদয়রঞ্জন সেই মহারাজার সম্মানে আমাদের সামনে তোমরা আজই নাটকখানি দয়া করে অভিনয় কর।'

দু-একটি শব্দ বাদে প্রায় ঠিক অনুরূপ কথাই 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নাটকে সূত্রধারের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। তা থেকে একথাটি বোধহয় আমাদের বুঝে নিতে বলা হচ্ছে যে, নাট্যকার শ্রীহর্ষদেব শুধু একজন রাজাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজাদের রাজা রাজ-চক্রবর্তী। প্রকৃতপক্ষে শ্রীহর্ষদেব কাশ্মীরসহ সমগ্র উত্তর ভারতের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তাঁর 'রত্নাবলী' নাটকে বর্ণিত বৎস রাজার 'দণ্ডতোরণ' ও 'স্ফটিক-মণি-ভবন' প্রভৃতি ঐশ্বর্যের বিবরণ দিয়ে থাকবেন।

'রত্নাবলী' নাটকে এমন কিছু কিছু লোকোৎসবের পরিচয় রয়েছে আজো ভারতীয় জনসমাজে যা অন্য নামে এবং কিছুটা অন্যরূপে পালিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত এই নাটকে বর্ণিত মদনোৎসবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ অনেকটা একালের দোলৎসবেরই মতো। একালে দোলের সময় যেমন ফাগ বা আবীর খেলা হয়ে থাকে, তখনো ঠিক তেমনি ফাগ খেলা হতো, পার্থক্য যা কিছু তা শুধু পূজার ব্যাপারে। দোলের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আর সেকালের মদনোৎসব হতো মদনদেবকে কেন্দ্র করে। কবে কখন এককালের মদনোৎসব দোলোৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে, এ পর্যন্ত সঠিকভাবে তা জানা যায়নি বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একে 'একটি ঐতিহাসিক রহস্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও 'রত্নাবলী' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রের ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে তখনকার ভারতীয় সমাজের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কৌশাম্বীর রাজা বৎস এবং রাজমহিষী দেবী বাসবদত্তা নাটকের নায়ক-নায়িকা এবং দুটি বিরুদ্ধ চরিত্র। বৎসরাজ শুধু বিলাসীই নন, যেমনি লঘুমনা তেমনি বহুবল্লভ। তিনি যে কিরূপ অন্যগত ছিলেন, সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর কন্যা সাগরিকা তথা রত্নাবলীর সঙ্গে প্রথম মিলন প্রত্যাশায় রাণী বাসবদত্তার কৌশলজালে ব্যর্থ হয়ে বৎসরাজ উদয়নের নানা প্রলাপোক্তির মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ রাজমহিষী দেবী বাসবদত্তা কিন্তু একাধারে পতিপ্রাণা ও ব্রতপরায়ণা এবং তেজস্বিনী হয়েও অতি উদার ও কোমলহৃদয়া।

এরূপ বিরুদ্ধগুণসম্পন্না বিচিত্র নারী-চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। তাহলেও কামনা-বাসনা, প্রেম-প্রীতি ও হিংসা-দ্বেষ রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে সর্বদেশে সর্বকালেই ছিল এবং আছে। অঘটন বা অলৌকিক ঘটনা আজো কি ঘটে না রত্নাবলী নাটকে সংঘটিত কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার মতো ?

শ্রীহর্ষদেব রচিত তৃতীয় নাটক বলে পরিচিত 'প্রিয়দর্শিকা' অলৌকিকতা ও সর্বপ্রকার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারাদি-বর্জিত হলেও সেখানেও নাট্যকার বৎসরাজ উদয়ন, দেবী বাসবদত্তা ও রত্নাবলীর অপর কয়েকটি চরিত্র আমদানি করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, কাম-কামনা-জর্জর নর-নারী সর্বত্রই আছে এবং সব সময়েই আছে। 'প্রিয়দর্শিকা'য় দেখা যাচ্ছে 'রত্নাবলী' নাটকের সাগরিকার মতোই আরণ্যকা নাম্নী এক যুবতী (অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার প্রিয়দর্শিকা কন্যা) বৎসরাজের প্রেমে একেবারে আকুল। অন্যপক্ষে তার জন্যে বৎসরাজ উদয়নের অবস্থাও যে কী শোচনীয় তা তাঁর বিদূষক বসন্তকের কথাতেই বেশ বুঝতে পারা যায়। খুবই উদ্বেগের সঙ্গে বিদূষক একস্থানে বলেছেন, 'বিষম মদনসন্তাপে বয়স্য তো একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন,—তাঁর কথামত আমি বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও অন্যান্য দেবীদের গৃহানুসন্ধান করেছি, কিন্তু তাঁকে তো কোথাও দেখতে পেলাম না!' এ থেকে এটাই ধরে নিতে হয় যে, বহুনারীগমন এদেশে সেকালের উচ্চতর সমাজে যে চালু ছিল নাট্যকার তাই দেখাতে চেয়েছেন।

এমনিভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যে যে সব সাহিত্যকারের সামান্যতম আত্ম-পরিচয়ও আছে তাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের রচনাবলীর পট-ভূমিকায় সম-সাময়িক সমাজচিত্রকে উন্মোচিত করা চলে। তবে কবি বা লেখকের আত্মকথা যেক্ষেত্রে বিস্তৃততর পাওয়া সম্ভব সেখানেই সমাজের ইতিহাসকে উজ্জ্বলতর করে ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু কবি যেখানে সমকালকে বাদ দিয়ে অতীতকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন সেখানে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সমাজরূপের বিশ্লেষণ করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। এবিষয়ে ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র উল্লেখ করা যেতে পারে।

'উত্তর-চরিতে'র প্রস্তাবনায় সূত্রধারের বাচনিকে কবি-নাট্যকার ভবভূতি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, 'অসাধারণ কবিত্ব গুণে বাগদেবী যার কণ্ঠে নিয়ত বাস করেন, সেই শ্রীকণ্ঠপদ-উপাধিধারী, শব্দ-বিদ্যাপারদর্শী, জাতুকীর্ণ-তনয়, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত মহাকবির নাম ভবভূতি।'

সূত্রধার আরো বলছেন, ভগবান কাল-প্রিয়নাথের মহোৎসব উপলক্ষে

'আমি অভিনয়ের অনুরোধে, রামচন্দ্রের সমকালিক একজন অযোধ্যাবাসী সেজে এখানে উপস্থিত হয়েছি' এবং একথাও বলেছেন, 'রাবণকুলের যিনি প্রলয়-ধূমকেতু, সেই রাজা রামচন্দ্রেরই এই অভিষেক-সময়।' প্রকৃতপক্ষে রাম-সীতার কাহিনী অবলম্বনেই 'উত্তর-চরিত' নাটকখানি রচিত এবং নাট্যকার-কবি ভবভূতির কালে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) রামায়ণী যুগের প্রভাব যে ভারতীয় সমাজের ওপর কত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল, এধরনের সাহিত্য গ্রন্থ থেকেই তা অনুমান করা যেতে পারে।

তখনকার যুগে সংস্কৃত ভাষাই ছিল বিরাট দেশ ভারতবর্ষের প্রধান যোগসূত্র। কাজেই যে কোনো প্রান্তের কবির হাতেই যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হোক না কেন ক্রমে ক্রমে সারা দেশ জুড়েই তার মহিমা ছড়িয়ে পড়তো। সে কারণেই দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নগরস্থ গোপাল ভট্টের পৌত্র এবং নীলকণ্ঠের পুত্র হয়েও মহাপণ্ডিত সর্বশাস্ত্রজ্ঞাননিধির প্রিয় শিষ্য ভবভূতি তাঁর 'উত্তর-চরিত', 'বীর-চরিত' ও 'মালতী-মাধব' প্রভৃতি নাট্য-গ্রন্থের মাধ্যমে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে উত্তরভারতের কনৌজরাজ যশোধর্মদেব ও কাশ্মীর রাজা ললিতাদিত্যের সভাকবি হয়েছিলেন। ভবভূতির সামান্য আত্ম-পরিচয় থেকে এমনি করেই আমরা সে সময়কার জাতীয় ও সামাজিক সংহতির কিছুটা আভাষ পেতে পারি।

তবে সংস্কৃত সাহিত্যে 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিতে' লেখক বাণভট্টের যে বিস্তৃততর আত্মকথা পরিবেশিত রয়েছে তার পট-ভূমিকায় তাঁর রচনাবলী পর্যালোচনাকালে সম্রাট হর্ষবর্ধনের যুগের ভারতবর্ষের সমাজ-রূপ অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পরেই বাণভট্টের আত্মচরিতের ভিত্তিতেই তৎকালীন সমাজচিত্র উন্মোচনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী'র বাণভট্ট

সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের (৬০৬-৬৪৭) ঐতিহাসিক উপাদান সুপ্রচুর। শিলালিপি, তাম্রফলক, অনুশাসন ও মুদ্রা ইত্যাদি তো রয়েছেই, তার ওপরে আছে কবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' এবং চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ।

হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট 'হর্ষচরিত' রচনা করেছিলেন হয়তো সম্রাটকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। তাতে কিছু কিছু অতিশয়োক্তি থাকা মোটেই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। তবে সেখানে যে আত্মকথা তিনি পরিবেশন করেছেন, ভাষা তার কাব্যমণ্ডিত হলেও নিশ্চয় তাতে অসত্যের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। 'কাদম্বরী' কথা-কাব্যেও বাণভট্টের বংশপরিচয় ও আত্মকথা রয়েছে যাতে সমাজরূপ বহুলাংশে এবং সম্যকভাবে প্রতিবিম্বিত। 'কাদম্বরী' কাব্যোপন্যাসটি অবশ্য বাণভট্ট সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তা শেষ করেছেন বাণ-তনয় ভূষণ ভট্ট। তা হলেও মূল গ্রন্থকারের আত্মকথন অংশটুকু কবি বাণভট্টেরই রচনা।

'হর্ষচরিত' গ্রন্থে আপন বংশ-পরিচয় ও আত্মকথা বর্ণনায় বাণভট্ট লিখেছেন : "বৎস থেকে যে বিপুল বংশ প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাৎসায়ন। এই বংশের ধারা গঙ্গার প্রবাহের ন্যায়। তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান, ললিতকলায় নৈপুণ্য, পরিহাস-মাধুর্য ও নিস্পৃহতা তাঁদেরকে শুভ্র যশের অধিকারী করেছিল। এই বাৎসায়নকূলেই জন্মেছিলেন কুবের নামে এক ব্রাহ্মণ। কুবেরের চার পুত্র, নাম যথাক্রমে অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত। মহাত্মা অর্থপতি ছিলেন পাশুপতের একমাত্র পুত্র। অর্থপতি একাদশ রুদ্রের ন্যায় একাদশ পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের নাম—ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্মজাত, বেদা, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, অহিদৎ ও বিশ্বরূপ। চিত্রভানুর সন্তান বাণ এবং বাণের মাতার নাম রাজদেবী। অতি শৈশবে বাণের মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার যত্নে ও স্নেহে তিনি বর্ধিত হতে থাকেন। কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়েসে বালক বাণকে পিতৃহীনও হতে হয়। তখন সবেমাত্র তাঁর উপনয়ন ও সমাবর্তন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। পিতৃশোকে বাণ কাতর হয়ে পড়লেন। কিছুদিন স্বগৃহে বাস করার পরেই বাণ অনুভব করলেন, বিশাল পৃথিবী তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বন্ধনহীন স্বাধীনতা,

দুর্দম কৌতূহল ও যৌবনসুলভ আবেগ তাঁকে ঘরছাড়া করে নিয়েছিল। এই ভবঘুরে জীবনে বাণভট্টের সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা বড়ো কম ছিল না।

যতদূর জানা যায় বাণভট্ট জন্মেছিলেন সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে। আর বাণ নিজেই আত্মকথায় লিখেছেন যে, তাঁর পিতৃনিবাস ছিল 'প্রীতিকূট' পল্লীতে। কোথায় এই প্রীতিকূট? আজকের বিহারে (সেকালের মগধ) এই নামের কোনো গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শোন নদের উত্তরে মীর্জাপুর জেলার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী বহু পুরনো ও সুপরিচিত 'পীরকুটা' পল্লীই কবি বাণভট্টের জন্মগ্রাম বলে পণ্ডিতদের ধারণা এবং তাঁদের মতে 'পীরকুটা' প্রাচীন প্রীতিকূটেরই অপভ্রংশ।

তখনকার যুগে ছেলেমেয়েদের বিয়ে হতো খুবই কম বয়েসে। বাণের পিতা চিত্রভানুও বেশ কম বয়েসেই বিয়ে করেছিলেন পার্শ্ববর্তী কোনো এক গ্রামের ব্রাহ্মণকন্যা রাজদেবীকে। এই রাজদেবীই বাণ-জননী। কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়েসে মাতৃহারা হয়ে দরিদ্র পুরোহিত-পিতার ওপরেই বাণভট্ট একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। বিরাট যৌথ পরিবারের আশীর্বাদ তাঁর ভাগ্যে বিশেষ জোটেনি। যৌথ পরিবারে যিনি দুর্বল স্বল্প উপায়ক্ষম তাঁর সন্তান-সন্ততি সাধারণত উপেক্ষিতই হয়ে থাকে। বাণভট্টের অদৃষ্টেও তাই ঘটেছিল। পিতার জীবদ্দশাতেই যিনি পরিজনদের কাছ থেকে কোনো সমাদর পাননি, পিতার অবর্তমানে সকলের কাছ থেকে সর্বপ্রকার বিরূপতাই যে তাঁকে পেতে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে তেমনি অবস্থায় পড়েই বাণভট্ট গ্রামের যত বয়ে যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্রমেই উচ্ছন্নে যেতে লাগলেন। একে ছোটবেলায় তেমন লেখাপড়া শেখবার সুযোগ হয়নি, তার ওপর যৌবনে পা পড়তেই এই ধরনের অধঃপতনে বাণভট্টের আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বরা সব চারদিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে ক্রমাগত নিন্দাবর্ষণ করতে থাকলেন। কিন্তু পদে পদে গালমন্দ এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তিরস্কার সহ্য করা কত দিন আর সম্ভব? বাণভট্টও তেমনি অবস্থা আর বেশিদিন সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ একদিন শুধু বাড়ি থেকেই নয়, একেবারে গ্রাম ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের পরিবেশ থেকে বহুদূরে তিনি উধাও হয়ে গেলেন। কেউ আর তাঁর খোঁজ পেলো না। খোঁজাখুঁজি তেমন হয়েছিল বলেও মনে হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই তাই সবাই তাঁর কথা অনেকটা ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু সবাইকে ছেড়ে গিয়ে বাণভট্ট নিজে খুবই লাভবান হয়েছিলেন।

জগৎসংসারকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে যে আকুতি তিনি কিছুকাল ধরে অনুভব করছিলেন তা পূর্ণতা পেয়েছিল তাঁর দীর্ঘদিনের যাযাবর জীবনে। রাজা-মহারাজা, মন্ত্রী-বিচারক, সাধু-সন্ন্যাসী, পণ্ডিত-মূর্খ, নীচ-পতিত সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সত্যি সত্যি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন বাণভট্ট। স্বচেষ্টায় তিনি বিদ্যা আহরণও করেছিলেন যথেষ্ট। মুখে মুখে তাঁর জ্ঞানের কথা, তাঁর বিদ্যার কথা ছড়িয়েও পড়তে থাকলো চারদিকে। তাঁর একবার সাধ জাগলো নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে। সত্যি সত্যি একদিন গাঁয়ে ফিরে এলেন তিনি। এসে দেখলেন তাঁর জ্যাঠা-খুড়োদের অনেকেই নেই। নিকট আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁকে তেমন পাত্তাই দিলেন না, উল্টে বরং বলে বেড়াতে লাগলেন, বাণের জ্ঞান-বিদ্যের সব প্রচারই ঝুঁটো।

যাই হোক, ছেলেবেলার বন্ধু জ্ঞাতিভাই চন্দ্রসেনের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন বাণভট্ট। সেখানে বসেই তিনি বিদ্যাচর্চায় নিমগ্ন আছেন। মনে অনেক বেদনা, অনেক দুঃখ। কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই, কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস যে অসীম—সব দুঃখের অবসান তাঁর ঘটবেই, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

বাস্তবিকই একদিন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে বসলো। সুদূর থানেশ্বর থেকে এক দূত এসে চন্দ্রসেনের বাড়ির দুয়ারে হাজির। দূতের হাতে বাণভট্টের নামে এক চিঠি। লিখেছেন থানেশ্বর-রাজ শ্রীহর্ষবর্ধনের জ্ঞাতিভাই কৃষ্ণদেব। এই কৃষ্ণদেব যে তাঁরই ভবঘুরে জীবনের এক বন্ধু। তিনি তাঁকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অবিলম্বে থানেশ্বরে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বন্ধু কষ্টে আছেন, বিপদে আছেন। এরূপ আশঙ্কা করেই কৃষ্ণদেব এমনি জরুরী আহ্বান জানিয়েছেন তাঁকে। বাণভট্টের আনন্দের সীমা নেই তাতে। পরদিনই তিনি দূত-সঙ্গে থানেশ্বর রওনা হয়ে গেলেন। মগধ থেকে পশ্চিম ভারতের থানেশ্বর অনেক পথ। সেই দীর্ঘপথে গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর পেরিয়ে অনেকদিন পর হর্ষবর্ধনের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন বাণভট্ট। বন্ধু কৃষ্ণদেবের ভবনেই অতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি। কয়েকদিন অপেক্ষার পর তাঁকে সম্রাট-সন্দর্শনে নিয়ে যাওয়া হলো রাজদরবারে। বিরাট প্রাসাদের এক-একটি নগরোপম মহল পেরিয়ে যেতে যেতে রাজৈশ্বর্যের সমারোহ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি।

চতুর্থ মহলে রাজদরবার। সভাসদ ও আমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে

সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট হর্ষবর্ধন। যথাসময়ে সম্রাট সকাশে তাঁকে নিয়ে উপস্থিত করা হলে আশীর্বাচনান্তে আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করলেন বাণভট্ট। কিন্তু তেমনভাবে তিনি সম্রাটের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হলেন না। বরং তাঁর কথাবার্তা ও আচরণে কেমন একটা তাচ্ছিল্য ও বিরূপতাই তিনি লক্ষ্য করলেন। কিন্তু সেই বিরূপতা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি বাণভট্টের। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি থানেশ্বররাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে বসলেন এবং রাজকবির সম্মানিত পদ লাভ করলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি রূপেই তিনি লিখলেন 'হর্ষচরিত' যার মাধ্যমে তিনি আত্মকথাও প্রচার করলেন সবিস্তারে এবং যার ভেতর দিয়ে সেকালের ভারতীয় পল্লীসমাজ ও নগরজীবনের বিস্তারিত পরিচয়ও প্রকাশ পেলো।

'হর্ষচরিতে' প্রদত্ত বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, বাণের বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন দুই ভাই চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ। এঁরা ব্রাহ্মণ পিতার ঔরষে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা হলেন ভাষাকবি ঈশান, পরম পণ্ডিত বারবাণ ও বাসবাণ, বাণের পরম অনুরাগী রুদ্র ও নারায়ণ, প্রাকৃতভাষায় কাব্যরচয়িতা (বর্ণকবি) বেণীভারত, উচ্চকুলজাত দরিদ্র বায়ুবিকার (তিনিও প্রাকৃতভাষায় কাব্য রচনা করতেন)। তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে অনঙ্গবাণ ও সূচীবাণ ছিলেন চারণ এবং এই চারণদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রৌঢ়া পতিহীনা চক্রবাকিকা ও বিষবৈদ্য ময়ূরক। আর কে কে ছিলেন? তাম্বুলপরিবেশক চণ্ডক, ভিষকপুত্র মন্দারক, চামীরক নামক স্বর্ণকার, হীরারত্নতত্ত্বজ্ঞ সিন্ধুষেণ, লেখক গোবিন্দক, চিত্রকর বীরবর্মা এবং মূর্তিশিল্পী কুমারদত্ত।

বাণের 'হর্ষচরিতে' বর্ণিত আত্মকথন থেকে এও জানা যায় যে, তাঁর কয়েকজন সঙ্গীত-সাথীও ছিলেন। সে দলে মৃদঙ্গ বাজাতেন জীমূত, গান গাইতেন সোমিল ও গ্রহাদিত্য, বাঁশী বাজাতেন মধুকর আর পারাবত, গন্ধর্ববিদ্যা শেখাতেন দুর্দরক, আর তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন নর্তকী হরিণিকা, নর্তক তাণ্ডবিক এবং নাট্যযুবা শিখণ্ডক।

এখানেই শেষ নয়। বাণের আরেকটি বন্ধুদলেরও উল্লেখ রয়েছে 'হর্ষচরিতে'। সে দলে ছিলেন কুরঙ্গিকা (প্রসাধিকা), কেরলিকা (সংবাহিকা), আখণ্ডল (দ্যূতকার), ভীমক (ধূর্ত), সুমতি (ভিক্ষু), বীরদেব (ক্ষপণক), জয়সেন (কথক), বক্রঘোণ (শৈব), করাল (মন্ত্রসাধক), লোহিতাক্ষ (খনিব্যবসায়ী), বিহঙ্গম (ধাতুবেদজ্ঞ), দামোদর (কুম্ভকার), চকোরাক্ষ (ঐন্দ্রজালিক) এবং তাম্রচূড় (পরিব্রাজক)।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের কালে এদেশে কত রকম বৃত্তির লোক যে সমাজে ছিল তার বেশ কিছুটার সন্ধান পাওয়া যায় বাণ বর্ণিত তাঁর দীর্ঘ বন্ধু-তালিকা থেকে। চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং মা শূদ্রা। এ থেকেই ধরে নেওয়া যায়, সে সময়ে সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। অথবা তাঁরা দুভাই ছিলেন অবৈধ সন্তান-—সে প্রশ্নও উঠতে পারে। সেকালের মানুষদের নৃত্য-গীতবাদ্য, শিল্পকলা, কাব্য, সাহিত্য ও ইন্দ্রজালে যে গভীর আকর্ষণ ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় বাণের বন্ধুদলের তালিকা দেখে।

কবি বাণভট্ট তাঁর রচিত 'হর্ষচরিতে' যে আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের সাংসারিক অবস্থা ছিল সচ্ছল এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছিল সে বংশের। কিন্তু বাণের অন্তরে ছিল জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্দমনীয় আগ্রহ। অথচ প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন চঞ্চল এবং স্বৈরাচারী। তাই তিনি যখন বিশ্বপরিক্রমায় যাত্রা করেন অনেক মহৎ ব্যক্তিই তাঁকে তখন পরিহাস করেছিলেন। তবু বহু রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের সৌজন্যে বাণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু গুরুকুলের তিনি সেবা করেছিলেন এবং বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি আবদ্ধ হয়েছিলেন মৈত্রীবন্ধনে। সুতরাং বাণ বলেছেন, বিশ্বপরিক্রমায় বহির্গত হয়েও কুলোচিত আদর্শ থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন নি।

'হর্ষচরিতে' আত্মকথার উপসংহারে বাণভট্ট লিখেছেন, বিশ্বপরিক্রমায় দীর্ঘদিন কাটাবার পর তিনি তাঁর নিজগৃহ 'ব্রাহ্মণাধিবাসে' ফিরে এলেন। অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁকে সাদরে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করলেন। বাল্যকালের বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যেন মুক্তির আনন্দ লাভ করলেন।

আত্মকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাণ তাঁর বিশ্বপরিক্রমা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে অনুমান করা যায়, কুলধর্ম রক্ষার ওপর সে যুগের মানুষ কত বেশি গুরুত্ব আরোপ করতো এবং বিদেশ পর্যটনে বেরিয়ে সেই কুলোচিত আদর্শকে বাঁচিয়ে চলা কত কঠিন ছিল। গুরুকুলের সেবায় তখনকার মানুষ যে পরম পরিতৃপ্ত হতেন তারও উল্লেখ রয়েছে বাণের আত্ম-কথায়।

বিশ্বসাহিত্যের অমর সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র মুখবন্ধেও কবি বাণভট্টের আত্ম-পরিচয় তথা বংশ-পরিচয় সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাতে তিনি তাঁর কীর্তিমান পূর্ব-পুরুষদের গুণকীর্তনই বিশেষভাবে করেছেন। বাণ সেখানে লিখেছেন: বাৎস্যগোত্রে কুবের নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাধুগণের অগ্রগণ্য। জগতের লোক তাঁর মহিমা গাইতো। বহু বৈশ্য তাঁর চরণপদ্মের

সেবা করতো। বাগ্‌দেবী সর্বদা তাঁর মুখে বাস করতেন। বেদাধ্যয়নে তাঁর বাচনিক পাপ বিনষ্ট হয়েছিল। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় পবিত্র হয়েছিল এবং সোমরস পানে তাঁর মুখ হয়েছিল সৌরভযুক্ত। শাস্ত্র-পাঠের সময় তাঁর মুখ ভারি সুন্দর দেখাতো। ব্রাহ্মণ বালকেরা শঙ্কিত চিত্তে তাঁর বাড়িতে যজুর্বেদ ও সামবেদ পাঠ করতো। খাঁচায় পুরে রাখা শুক ও শারিকাগণের কাছে তাদের পদে পদে পরাজয় মানতে হতো। তার কারণ সারাক্ষণ শুনে শুনে সব শাস্ত্রই ঐ পাখিদের একেবারে কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে বাণভট্ট লিখেছেন, ক্ষীরোদ-সমুদ্র থেকে চন্দ্রের ন্যায় সেই কুবের থেকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্থপতি জন্মগ্রহণ করলেন। প্রতিদিন প্রভাতকালে নতুন নতুন ছাত্র এসে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনায় রত অর্থপতির গৃহের শোভা সম্পাদন করতেন। অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে তিনি অনায়াসে স্বর্গলোক অধিগত করেছিলেন। সেই অর্থপতির মহাপ্রাজ্ঞ, ক্ষমাশীল ও বেদশাস্ত্র-পারদর্শী উৎকৃষ্ট পুত্রগণের মধ্যে অন্যতম চিত্রভানু। তিনি ছিলেন পর্বতসমূহের মধ্যে স্ফটিক-মণিধবল কৈলাস পর্বতের ন্যায়। যজ্ঞাগ্নির ধূম বেদবধূর কর্ণে তমালপল্লবের ন্যায় তাঁর যশকে অধিকতর শুভ্রবর্ণ করেছিল। সেই মহাত্মার গুণগ্রাম নরসিংহের নখসমূহের মতো শত্রুর অন্তরেও প্রবেশ করেছিল। স্বয়ং দেবী সরস্বতী নিজ হস্তকমলের দ্বারা তাঁর ঘর্মবিন্দুসকল মুছে দিতেন। তাঁর যশোকিরণ সপ্তলোককে শুক্লবর্ণে রঞ্জিত করেছিল। সেই চিত্রভানুই বাণভট্ট নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন।

এরপর উপসংহারে এসে 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্য প্রসঙ্গে আপন কথা বলতে গিয়ে বাণভট্ট লিখছেন, ব্রাহ্মণ বাণভট্ট তাঁর নিজ বুদ্ধি অনুসারে এই অদ্বিতীয় কথাকাব্য (উপন্যাস) প্রণয়ন করেছেন। সে বুদ্ধি ছিল বৈদগ্ধবিলাস (বা পাণ্ডিত্যচাতুর্য) লাভ না করায় নিতান্ত সরল, সে বুদ্ধি চিত্তচাঞ্চল্যবশত মলিন এবং সদসৎ বিবেচনায় সে বুদ্ধি ছিল অক্ষম। তাই সে বুদ্ধি তাঁর কণ্ঠের জড়তাকেও লুপ্ত করতে সমর্থ হয়নি।

'কাদম্বরী' কাব্যোপন্যাসের মুখবন্ধে এমনিভাবেই আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে বাণভট্ট তাঁর আত্মকথার সমাপ্তি টেনেছেন। কিন্তু 'কাদম্বরী' কথাকার বিনয়বশত নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে যত ছোট করেই দেখান না কেন, সম্রাট হর্ষবর্ধনের মতো একজন সুপণ্ডিত কবি যাকে 'বশ্য-বাণী-কবি-চক্রবর্তী' উপাধি দিয়েছিলেন তিনিই যে ছিলেন সে কালের কবি-সম্রাট কে তা অস্বীকার করবে? তা ছাড়া রাজা শূদ্রকের কাছে অদ্ভুত এক শুকপক্ষীর বর্ণিত বলে প্রচারিত নানা

কাহিনী অবলম্বনে রচিত বাণভট্টের 'কাদম্বরী' যে বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেই সব কাহিনীর মধ্যে চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্বকন্যা কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনীটি বাস্তবিকই অনুপম এবং কে না জানে যে একালের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে সেই চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরী উপাখ্যানের তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্র-লেখার নীরব প্রেমের ইতিহাসকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন ?

কিন্তু তা নয়, আমাদের আলোচনা আত্মচরিতে সমাজচিত্রের প্রতিফলন নিয়ে। সেদিক থেকে কবি বাণভট্টের আত্মচরিত যে বহুলাংশে সার্থক সেটাই আমাদের বক্তব্য। বাণভট্টের আত্মকথা তথা বংশ-বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে সে যুগটা ছিল যাগ-যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নের যুগ, গুরুগৃহে এসে ছাত্রদল তখন শাস্ত্রশিক্ষা করতো, সোমরস ছিল তখনকার কালের প্রিয় পানীয়। এছাড়া বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' থেকে কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলের একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্রই আমরা পেয়ে যাই।

'হর্ষচরিত' থেকে হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয় পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাণভট্ট সেই বিবরণে বলেছেন যে, সিংহাসনে আরোহণ করেই হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের বিধবা রাণী ভগিনী রাজ্যশ্রীকে আত্মহত্যায় নিরস্ত করে বিন্ধ্য-পর্বত থেকে উদ্ধার করে স্বরাজ্যে নিয়ে আসেন। পরে তিনি তাঁর রাজধানী থানেশ্বর থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত করেছিলেন। প্রকাশ, রাজ্যশ্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। 'হর্ষচরিতে' বলা হয়েছে যে, হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের শাসনভার হাতে নিয়েই ভারতীয় নৃপতিগণকে তাঁর আনুগত্য স্বীকারে, অন্যথায় যুদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েছিলেন। তাঁর সেন্যবাহিনীতে ছিল পাঁচ হাজার হাতি, কুড়ি হাজার অশ্বারোহী ও অর্ধ লক্ষ পদাতিক। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধরীতি তিনি অনেকাংশে বর্জন করেছিলেন—যুদ্ধরথের ব্যবহার পরিত্যাগ করে তিনি তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। দীর্ঘ শাসনকালে হর্ষবর্ধন কঠোরে-কোমলে, দান-ধ্যানে, বিদ্যোৎসাহিতায় ও ধর্মবোধ সম্প্রসারণে যে সমস্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন 'হর্ষচরিতে' তার পরিচয় তো রয়েছেই, এমনকি বাণভট্টের আত্মকথার মধ্যেও তার ছায়াপাত ঘটেছে। আর একথাও বোধহয় অত্যুক্তি নয় যে, মহারাজ চক্রবর্তী শ্রীহর্ষদেবের সঙ্গে তাঁর প্রধান সভাকবি বাণভট্ট অনেকটা একাত্ম হয়েই গিয়েছিলেন।

কবি জয়দেবের যুগের বাঙলা ও ভারত

এবার সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তিম পর্বে আসা যেতে পারে।

. সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। মহারাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের যুগ। সেই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বাঙালী কবি জয়দেব গোস্বামী। প্রকৃতপক্ষে, 'গীতগোবিন্দ'-প্রণেতা জয়দেব ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি।

পূর্ব কবিদের মতো জয়দেব গোস্বামীও আত্মঘোষণায় যথেষ্ট কার্পণ্য দেখিয়ে গেছেন, যার ফলে কোথাও তাঁর বিশেষ আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কি যে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিরূপে তাঁর কালে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী সেই প্রভু লক্ষ্মণ সেনেরও কোনো নামোল্লেখ দেখা যায় না তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'শ্রীগীতগোবিন্দে'। ব্যুয়েলার (Buehler) নামক জনৈক ইয়োরোপীয় গবেষক অবশ্য কাশ্মীরে একখানি 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের নাম দেখেছেন বলে স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে এমন যুক্তি অবশ্য তোলা যায় যে, সে যুগে জয়দেবের খ্যাতি চতুর্দিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও ছাত্র নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র থেকে 'গীতগোবিন্দ' নকল করে নিজ নিজ অঞ্চলে নিয়ে যেতেন আঞ্চলিক গৌরব বৃদ্ধির জন্যে। তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো লক্ষ্মণ সেনের নামযুক্ত একটি শ্লোক রচনা করে কাশ্মীরে দৃষ্ট ঐ 'গীতগোবিন্দ' পুঁথিখানির মধ্যে তা প্রক্ষেপ করে থাকবেন। সেই যুক্তিতে ব্যুয়েলার সাহেবের ঘোষণাকে যদি অগ্রাহ্যও করা হয় তা হলেও জয়দেব কবি যে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের ছিলেন অন্যতম সেকথা মিথ্যা হয়ে যায় না।

কথিত আছে, স্বয়ং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপের রাজসভার প্রবেশ পথে একটি শ্লোক খোদিত দেখেছিলেন এবং সেখানে পঞ্চরত্নরূপে গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি এবং কবিরাজ (ধোয়ী) নামের উল্লেখ ছিল। রাজপ্রভু লক্ষ্মণ সেনের নামোল্লেখ না করলেও জয়দেব তাঁর কবি-সহযোগীদের কীর্তিগাথা প্রচার করে 'গীতগোবিন্দে'র প্রথম সর্গেই চতুর্থ শ্লোকে তাঁদের সঙ্গে তুলনায় সবিনয়ে নিজের অক্ষমতাকে ব্যক্ত করেছেন। ঐ শ্লোকে তিনি বলতে চেয়েছেন, উমাপতি ধর যেভাবে সুন্দর করে বাক্যকে পল্লবিত করেন, যেরূপ

প্রশংসনীয়ভাবে কঠিন পদসমূহ দ্রুত রচনা করে থাকেন কবি শরণ আর শৃঙ্গার রস বিষয়ে সৎ ও পরিমের রচনায় যে অশ্রুতপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছেন, আচার্য গোবর্ধন এবং শ্রুতিধর হিসাবে কবিরাজ ধোয়ীর যে খ্যাতি, তাতে শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় তাঁদের সঙ্গে তুলনায় কতটুকুই বা কৃতকার্যতার আশা করতে পারেন জয়দেব? এর ঠিক বিপরীত অর্থও এই শ্লোকের অনেকেই করে থাকেন। তবে জয়দেবের মতো পরম বৈষ্ণব যে সহযোগী-কবিদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে অহমিকা প্রকাশে নিজ লেখনীকে কলঙ্কিত করবেন, এ যেন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

সে যাই হোক, জয়দেব যে তাঁর কালের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবির অন্যতম ছিলেন তিনি নিজেই 'গীতগোবিন্দে'র পূর্ববর্ণিত শ্লোকটিতে তা ঘোষণা করে গেছেন। তা ছাড়াও এ সম্বন্ধে আরো প্রমাণ রয়েছে। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছিল। সদুক্তির এই সংকলনখানিতে প্রাচীন ও সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবিদের সেরা বাণীসমূহ কথামালার মতো করে গেঁথে রাখা হয়েছে। সেখানে জয়দেব ও শরণ প্রভৃতি কবিকে সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র পাঁচটি শ্লোক এবং বিবিধ বিষয়ে রচিত কবি জয়দেবের আরো ছাব্বিশটি শ্লোকের উদ্ধৃতি রয়েছে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'। তার মধ্যে দু'টি শ্লোকের একটিতে গৌড়েন্দ্র ও অপরটিতে রাজেন্দ্র শব্দ দুটির উল্লেখ দেখা যায়। এ দুটি শব্দের দ্বারা কবি যে তৎকালীন গৌড়-বঙ্গাধিপতি এবং বহু রাজ্যবিজয়ী লক্ষ্মণ সেনকেই বুঝাতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উক্ত উদ্ধৃতি-গ্রন্থে কবি শরণের একটি শ্লোকে 'সেনবংশতিলক' কথাটির এবং আচার্য গোবর্ধন প্রণীত 'আর্যাসপ্তশতী'র এক শ্লোকে 'সেনকুলতিলক' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনই লেখকদ্বয়ের লক্ষ্য সে সম্পর্কেও বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। আর কবিরাজ ধোয়ী তো তাঁর 'পবনদূত' কাব্যের নায়কপদেই অভিষিক্ত করেছেন লক্ষ্মণ সেনকে এবং তাঁকে ভুবনবিজয়ী বলে অভিহিত করেছেন, যদিও ঐ গ্রন্থরচনাকালে তিনি ছিলেন যুবরাজ। এসব থেকে এ বিষয়টি নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এঁরা সকলেই ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের এক একজন সেরা কবি।

এভাবে কবি জয়দেবের আত্মপরিচয়ের একদিক নির্ধারিত করা গেল। সংক্ষিপ্ত হলেও জয়দেবের আরো কিছু আত্মকথার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে। এই 'শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যে'র একেবারে উপসংহারে কবি

তাঁর পিতৃ-মাতৃ পরিচয় রেখে দ্বাদশ-সর্গ গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। 'গীতগোবিন্দে'র শেষ শ্লোকে এসেই আমরা প্রথম জানতে পারি যে, এই গ্রন্থ-প্রণেতা কবি জয়দেব গোস্বামী ছিলেন শ্রীভোজদেব এবং বামাদেবীর পুত্র। তিনি কবি পরাশরাদি প্রিয় বন্ধুদের এই 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থখানি উপহার দিয়েছিলেন।

কিন্তু জয়দেবের জন্মস্থান কোথায়? এবিষয়েও গোঁসাই কবি একেবারে নীরব থাকেননি। তিনি যে কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী সেকথা তিনি 'গীতগোবিন্দে'র তৃতীয় সর্গের দশম শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন। তবে কোথায় এই কেন্দুবিল্ব তা জানবার জন্যে কিছু ঐতিহাসিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। কেন্দুবিল্ব নামে একাধিক গ্রাম ছিল বাঙলাদেশে। ওড়িষ্যায়ও নাকি ঐ নামের গ্রাম ছিল। কিন্তু বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বই যে জয়দেব-তীর্থ কেন্দ্যবিল্ব নানা প্রমাণেই তা সর্বজনস্বীকৃত। আজো সেখানে প্রতি বছর জয়দেবের মেলা বসে থাকে।

পূর্বেই সন্দেহাতীতভাবে দেখানো হয়েছে যে জয়দেব গোস্বামী ছিলেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি। সেন-রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের বীরত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস যথেষ্ট মুখর। তবে এই বংশেরই পূর্বপুরুষ বীর সেন সম্বন্ধে ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না যদিও বল্লাল সেনের এক তাম্রলিপিতে তাঁর পূর্বতন পুরুষ রাজা বীর সেনের নাম আবিষ্কৃত হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলে একালেও সেনরাজাদের কীর্তি-চিহ্নের অনেক নিদর্শন চোখে পড়ে। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, সেনবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠার যুগে রাঢ় অঞ্চলেই তাঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং রাজা বীর সেনের নামানুসারেই বীরভূমি তথা বীরভূম নামের উৎপত্তি। বিখ্যাত অজয় নদ এই বীরভূমের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত এবং তারই তীরবর্তী গ্রাম কেন্দুবিল্ব। এই গ্রামের অদূরে নদের দক্ষিণ তীরে সেনরাজাদের আমলে সেনপাহাড়ী নামের এক দুর্গ-ভবন অবস্থিত ছিল দ্বাদশ শতকে। সেই দুর্গের ধ্বংসাবশেস আজও দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায়, লক্ষ্মণ সেন তাঁর ঐ দুর্গ-ভবনে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এবং সেই সময়েই কেন্দু-বিল্বের কবি জয়দেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। রাঢ় অঞ্চল চিরকালই বৈষ্ণব-প্রধান, বৈষ্ণবধর্মের জয়গানে মুখরিত। পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মণসেন তাঁরই রাজ্যভুক্ত সেই রাঢ় অঞ্চল পরিদর্শনে মাঝে মাঝে আসবেন সে তো স্বাভাবিক, আর সেখানে আসার পর আজীবন শ্রীহরি-সেবক কবি জয়দেবের

সঙ্গে তাঁর সংযোগ না হয়ে পারে? তাই প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পরম বান্ধব, তাঁর সভাসদ। তারপর থেকে কেন্দুবিল্বের নামও ক্রমে জয়দেব-কেন্দুবিল্ব। কেন্দুবিল্ব নামের অন্যান্য গ্রাম থেকে এভাবেই ঘটেছে তার পৃথক পরিচয়।

এ গেল জয়দেবের জন্মগ্রামের কথা যে-গ্রামকে তিনি রত্নগর্ভা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে পল্লীতে জয়দেবের মতো মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন সে পল্লী রত্নগর্ভা বই কি। প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অন্তিম কবি বলে বর্ণিত এবং ভারতব্যাপী প্রভাব বিস্তারে একমাত্র মহাকবি কালিদাসই যার সঙ্গে তুলনীয় সেই জয়দেব গোঁসাই তাঁর জন্মগ্রামের উল্লেখ ছাড়াও আরো কিছু আত্মকথার বর্ণনা রেখেছেন তাঁর রচিত 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্যে। যে শ্লোকে তিনি স্বগ্রামকে সমুদ্র-সম্ভব বা সমুদ্র সমকক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন সেই পদেরই 'রোহিণী-রমণ' কথাটি নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এই রোহিণীটি কে? এক একজন ব্যাখ্যাকার এক এক রকম উত্তর দিয়েছেন এই প্রশ্নের। 'গীতগোবিন্দে'র প্রথম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী', এবং দশম সর্গের দশম শ্লোকে 'জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি' বলে যিনি আত্মঘোষণা করেছেন তিনিই আবার নিজেকে কী করে 'রোহিণী-রমণ' বলছেন সে প্রশ্নে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় এই 'রোহিণী-রমণ' কথাটির ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন জয়দেবের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন রোহিণী, অন্যমতে পদ্মাবতীরই আরেক নাম ছিল রোহিণী, আরেক দলের ধারণা রোহিণী পদ্মাবতীর কনিষ্ঠা ভগিনী এবং তাঁকে জয়দেব লীলারস আস্বাদনে গুরুত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও অপর একটি মত এ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে, তাতে রোহিণীকে কবি জয়দেবের পরকীয়া বলে প্রচার করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত অনুমানগুলির যে কোনোটিই সত্য হতে পারে। সেকালের ভারতীয় সমাজে একাধিক পত্নীগ্রহণে কোনোরূপ বাধা ছিল না, সাধনকার্যে নারীশক্তির সাহায্য নেওয়ারও রেওয়াজ ছিল এবং পরকীয়া প্রেম তো সে যুগের এক বাঁধা বুলি। 'গীতগোবিন্দে' কবি জয়দেব গোস্বামী পূর্বোক্ত দু'বার ছাড়াও আরেকবার পত্নী পদ্মাবতীর নামোল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাষাতেই ঘোষণা করেছেন যে, পদ্মাবতীর মনোরঞ্জনের জন্যেই কবি ঐ 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' কাব্য রচনা করেছেন। একাদশ সর্গের সংশ্লিষ্ট একবিংশ শ্লোকে জয়দেব একটি প্রার্থনা রেখেছেন। কী সেই প্রার্থনা?

বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে।
করু মুরারে মঙ্গল-শতানি
ভণতি জয়দেব—কবিরাজ-রাজে।

অর্থাৎ, হে মুরারে! কবিরাজ-রাজ জয়দেব কৃত যে মধুর সঙ্গীত পদ্মাবতীর হর্ষবিধান করেছে তা বিশ্ব-মঙ্গলের কারণ হোক!

উপরোক্ত কয়েকটি শ্লোক থেকে নিঃসংশয়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, পদ্মাবতীই ছিলেন কবি জয়দেবের পরিণীতা পত্নী এবং তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যে তিনি শুধু 'গীতগোবিন্দ' রচনা নয়, তাঁর যাবতীয় কর্মই নিয়ন্ত্রিত হতো সহধর্মিণীর মনোবাঞ্ছা পূরণে। 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' এই বিশেষণটি দ্বারা জয়দেব এমনকি একথাও জানিয়েছেন যে, পদ্মাবতীর সঙ্গে একত্রে তিনি নৃত্য-গীতও করতেন পত্নীকে খুশী করবার জন্যে এবং শ্রীকৃষ্ণোপাসনা উপলক্ষে।

সে যাইহোক, জয়দেব ও পদ্মাবতীকে নিয়ে বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহু কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁদের কেন্দ্র করে এমন সব অলৌকিক ঘটনা প্রচারিত হয়েছে একমাত্র ভক্তমহল ছাড়া যার ওপর কোনো গুরুত্বই কেউ আরোপ করে না। আত্মচরিতের উপাদান, খাঁটি জীবনী গ্রন্থ এবং ইতিহাস-স্বীকৃত তথ্যের অভাবের জন্যেই এই ধরনের গাল-গল্প ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। জয়দেবের বেলাতেও তাই ঘটেছে। তবে কবি জয়দেব বিস্তৃত আত্মকথা রেখে না গেলেও প্রাচীন বৈষ্ণবকবি বনমালী দাস প্রণীত 'জয়দেব-চরিত্রী' এবং চন্দ্রদত্ত কৃত ও বোম্বে থেকে প্রকাশিত 'ভক্ত-মালা' গ্রন্থে যে জয়দেব-জীবনী পাওয়া যায় সেখানেও অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি। সমকালীন সমাজচিত্রের আলোচনায় সে-সবের কোনো প্রয়োজনই নেই। এ প্রসঙ্গে শুধু এই একটি কথা বলতে হয় যে, তখনকার সমাজের লোক এবং তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মানুষ অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিল। 'জয়দেব-চরিত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থে সেই কারণেই নানা অভিনব ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। সে-সব থেকে কিছু কিছু জীবনী উপাদান অবশ্য বেছে নেওয়া চলে এবং তার মধ্যে জয়দেবের বিবাহের ঘটনাটি অন্যতম।

কবি বনমালী দাস জয়দেবের বিবাহের যে দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'জয়দেব-চরিত্রী' গ্রন্থে, সারা ভারতের ভক্ত সমাজ সে বিবরণই মেনে নিয়েছেন। তবে সেই বিবরণের যুক্তি-গ্রাহ্য অংশ কেবলমাত্র এইটুকুই ধরা যেতে পারে যে, দক্ষিণ ভারতের এক পরম ধার্মিক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ পরিবার পুরীতে গিয়ে জগন্নাথদেবের কাছে সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন এবং একটি কন্যাসন্তান লাভ

করলে দেবতার কাছে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে জগন্নাথের হাতে সমর্পণের জন্যে তাঁকে নিয়ে আবার পুরী গিয়েছিলেন। জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে ঐ ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে বিশ দিনে কেন্দুবিল্বে গিয়ে পৌঁছুতে হয় জয়দেবের সন্ধানে এবং সেখানে তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করে তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। পুরীতে স্বপ্নাদেশে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে জয়দেবই জগন্নাথ এবং তাঁদের কন্যা পদ্মাবতী লক্ষ্মী অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ থেকেই সাধারণের মধ্যে এ ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাই জয়দেব ও পদ্মাবতীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সামাজিক দিক থেকে এ কাহিনীর গুরুত্ব এই যে, সেকালে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করতেই হতো, এ বিষয়টি এতে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পদ্মাবতীর জনক-জননী যতদিন সম্ভব কন্যাকে নিজেদের কাছে রেখেছেন, কিন্তু তার বারো বছর উত্তীর্ণ হতে চললে তাঁরা তাকে জগন্নাথের হাতে সমর্পণে উদ্যোগী না হয়ে পারেননি। তা না হলে যে সমাজ-নিন্দা ভোগ করতে হবে!

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ ঈশ্বরের অবতারবাদে বিশ্বাসী এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আলৌকিকত্বেও আস্থা এসে পড়ে। এদেশে যুগ যুগ ধরে নানারকম কিংবদন্তীও সৃষ্টি হয়ে আসছে তা থেকেই। যা অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য সে-সব অংশ বাদ দিলেও প্রচলিত কথাকাহিনী থেকে অনেক সময় সমকালীন সমাজরূপের (অবশ্য কাল নিরূপণ সম্ভব হলেই) নিদর্শন আবিষ্কার সম্ভব হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা না করে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' সে যুগের কতটা ছায়াপাত ঘটেছে, তখনকার সমাজ কতটা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখন সে-সম্বন্ধেই আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

'পতনোন্মুখ বঙ্গ সমাজের মুখপাত্র'রূপেই যেন জয়দেব বাঙলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হিসাবে সেকালে তিনি এক বিশেষ গৌরবময় প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন, সেই লক্ষ্মণ সেনই প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি। দ্বাদশ শতকের শেষাংশে দিল্লীতে তখন সেখানকার সর্বশেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের রাজত্ব (১১৫৯—১১৯২) চলছে। কনৌজরাজ জয়চাঁদের সহযোগিতায় মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যবাহিনী দ্বিতীয়বারের আক্রমণে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লীর মসনদ দখল করে নেবার সাত বছর পরে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ও দিল্লীর প্রথম সুলতান কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজির আকস্মিক

আক্রমণে বাঙলার রাজা বীর লক্ষ্মণ সেনও নদীয়ার সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

শুধু বাঙলা দেশেই নয়, সারা ভারত জুড়েই তখন একটা অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশ। সে অবস্থায় সমাজ-সংসারে কিছুটা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সমকালীন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে থাকে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও সেকথাই বলেছেন। তাঁর মতে 'সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র'।

সেই দিক থেকেই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র বিচার করতে হবে। জয়দেবের কালে 'গীতগোবিন্দ' নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিমূলক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তবে তাঁর কালের কোনো কাহিনী বা ঘটনা নিয়ে তিনি এই কাব্য-গাথা রচনা করেন নি, একেবারে প্রথম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকেই গ্রন্থকার বলে নিয়েছেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতিকেলি বর্ণনাত্মক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং উপসংহারেও এই গ্রন্থকে কবি শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য বলেই উল্লেখ করেছেন। ভক্তজন ও বৈষ্ণবদের কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ঘটিত এই গীতিকাব্যখানি অতি উচ্চদরের ধর্মগ্রন্থ হলেও এতে শৃঙ্গাররস ও সম্ভোগকলার যেরূপ বর্ণনা রয়েছে, 'কৃষ্ণচরিত্রে'র লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তার কঠোর সমালোচনা না করে পারেন নি। তিনি বেদনার সঙ্গে লিখেছেন, 'যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনোৎসব। এতকাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদনোৎসবভারাক্রান্ত।' কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র রাধা ও গোপিনী তত্ত্ব তথা ব্রজলীলার সমালোচনায় যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন অনেক ভক্ত লেখকই তা খণ্ডন করেছেন। সে বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। তবে ভারতীয় সমাজ-পটভূমিকা বিশ্লেষণে সাহিত্য-সম্রাট বৈষ্ণব-কবিদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন এ প্রসঙ্গে তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

স্ব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য-পত্রে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাঙলা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙলায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙলার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতিকাব্যের প্রণেতা।...' বস্তুত জয়দেবই সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তিম শ্রেষ্ঠ কবি হয়েও প্রথম কবি যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে গীতিকাব্য রচনা করেছেন। অতিরঞ্জন ও কৃত্রিমতায় সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমশই যখন দুর্বল হয়ে

পড়ছিল তখন অসামান্য প্রতিভাবলে জয়দেব সেই লুপ্তগৌরব-সাহিত্যে আরো কিছুকালের জন্যে নতুন প্রাণসঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন।

তা হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল-বায়ু ও গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল।······ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষ-শূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সেই কাব্য-প্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতি-প্রণয়ের শেষ পরিচয়। এই জাতি-চরিত্রানুকারিণী গীতিকাব্য সাত আটশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।'

জয়দেব বর্ণিত কৃষ্ণ-চরিত্রের সমালোচনা করে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেছিলেন যে, 'তখন আর্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিতেছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্মের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইতিহাসপরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিনামদর্শী স্মার্ত এবং গৃহসুখবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নুপুর-নিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গির নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনায় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; 'গীতগোবিন্দ' এই সমাজের উক্তি। অতএব 'গীতগোবিন্দে'র শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্তি, অপূর্ব মোহনমূর্তি; শব্দ-ভাণ্ডারের যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর-কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহাগৌরব জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রখর সুখতৃষ্ণাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিতেছে।'

সাহিত্যের এই অবস্থাকে পতনোন্মুখ জাতির পরিচায়ক বলেই ধরে নিয়ে

থাকবেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'মধুর কোমলকান্ত' রচনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি স্বয়ং পৌরুষময় বলিষ্ঠ বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে থাকবেন। কিন্তু শুধু মাত্র বাঙলা দেশেই যে সে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ অনুযায়ী উচ্চাভিলাষশূন্যতা, অলসতা এবং ভোগাসক্তি ও গৃহসুখপরায়ণতা দেখা দিয়েছিল তা নয়, সারা ভারতেই তখন কোমলতা ও আবেগপ্রবণতার একটা ঢেউ এসে থাকবে যার ফলে প্রায় গোটা দেশই সে-যুগে জয়দেবের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তাই ভোগবাদের শ্রেষ্ঠ ভাবরসে পূর্ণ ও ভাষার লালিত্যে অতুলনীয় গীতগোবিন্দ কাব্যকথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তকে একই সঙ্গে আনন্দে আপ্লুত করে তুলেছিল। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, নায়ক-নায়িকার বা নর-নারীর আসঙ্গলিপ্সামূলক অনুরাগ এমনই একটি সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন বিষয়, রমণীয়তা এবং দুর্দমনীয়তায় একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত অপত্যপ্রীতি ছাড়া যার সঙ্গে আর কোনো কিছুরই তুলনা চলতে পারে না। সেকারণেই বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি সেই পরমরমণীয় মানব-প্রবৃত্তিকে মূল উপজীব্য করেই রচিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও যে তাই হবে তাও নির্দ্বিধায়ই বলা যেতে পারে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং অতি পরিষ্কার ভাষায়ই তাঁর 'অনুশীলন' গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন, '…দম্পতি-প্রীতি সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।'

এর পরে এ প্রশ্ন স্বতঃই উঠতে পারে যে, তাহলে আদিরসাত্মক 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে জয়দেব গোস্বামী কী এমন অন্যায় করেছেন যার জন্যে তাঁকে 'লম্পট' আখ্যায় পর্যন্ত ভূষিত হতে হয়েছে? বাস্তবিকই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক, প্রাক্তন জেলাশাসক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষকরূপে খ্যাত রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপক সুধীপণ্ডিত স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম-এ, বি-এল মহোদয় জয়দেবকে 'লম্পট' ও পদ্মাবতীকে 'দেবদাসী' বলে এক নিন্দাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্য-পত্র 'সাহিত্যে'। সেই প্রবন্ধটি নিয়ে সে-সময়ে এবং পরেও দীর্ঘ দিন ধরে খুব আলোড়ন চলেছিল। তবে বটব্যাল মহাশয় জয়দেব গোস্বামীর কবিত্ব-শক্তি স্বীকার না করে পারেন নি এবং একথা হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আদিরসের সর্বব্যাপী মহিমা ও জয়দেবের অতুলনীয় কাব্য-কলার মোহই 'গীতগোবিন্দ'কে সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও অত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তবে সমালোচক হিসাবে ভারতীয় উপাসনা পদ্ধতির বিশেষত

বৈষ্ণব ধর্মের বিরূপতা করাই ছিল যাঁর প্রধান কাজ তাঁর পক্ষে জয়দেবের প্রশংসা করা কী করেই বা সম্ভব ?

একথা অবশ্য ঠিক যে, বাঙলা ও উড়িষ্যার পক্ষে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত নৈতিক অধঃপতনের কাল বলে বিবেচিত। তখনকার সমাজ-জীবন প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

'দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যার এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেব গীত-গোবিন্দের আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার রুচি প্রত্যেক পাঠকের চক্ষে পড়িবে : জীবনেও পদ্মাবতী নাম্নী এক 'সেবাদাসী' তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন, সেকশুভোদয় গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায় যে পদ্মাবতী লক্ষ্মণ সেনের সভায় নৃত্য করিতেন। বনমালী দাসের জয়দেব-চরিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, এই রমণী পুরীর মন্দিরে সমর্পিতা হইয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তী' পদেও দৃষ্ট হয়, ইনি নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব তাহার তাল রক্ষা করিতেন। এই জন্য জয়দেব 'নবরসিকে'র একজন, বিবাহিত পত্নী দ্বারা সে উপাধি লাভ ঘটিত না।

'দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলিতে এই ভাবের পরম রমণীর প্রতি আসক্তির জয় গীতিক ঘোষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গ রমণীগণের প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য এক তাম্রশাসনের কবি তাঁহাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন, ধোয়ী কবির 'পবনদূতে' তিনি এই ভাবের দ্বিতীয় একখানি প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। এই যুগের তাম্রশাসনগুলিতে হর-পার্বতী বন্দনায়, তাঁহাদের হাব-ভাব ও পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেম-লীলা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে— তাহা শীলতার অভাব ও রুচির বিকার সূচনা করিতেছে। সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় হর-পার্বতীর সেই সময়কার একখানি বীভৎস প্রস্তর-মূর্তি আছে। পুরী কোণার্ক মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিসমূহের দিকে চাহিতে চক্ষু লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রাদির বিশেষ অনুশীলনের ফলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শীলতা ও সংযম অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল।

'রাজসভায় যে ভাব-বিকার উপস্থিত হয়, সমাজের নিম্নস্তরে তাহা যখন আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহা অতি বিকট হয়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে অতি ঘোর রুচি-বিকার দেখা দিয়াছিল। আমার ধারণা যে, সেন বংশের পতনের পর কামরূপ ও মিথিলা এই দুই কেন্দ্র হইতে রুচির ধারা সমস্ত বঙ্গদেশে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।'

জয়দেবের কালে অবশ্য দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল—নৃত্যসহযোগে তখন

দেবতার তুষ্টিবিধানে গীতবাদ্যাদির অনুষ্ঠান হতো। নৃত্য-পটীয়সীরূপে পদ্মাবতীর খ্যাতি ছিল সারা দেশ-জোড়া এবং সেই 'নৃত্যের তালে তালে' কবি জয়দেবও রাধা-মাধব বন্দনার গানে গানে তন্ময় হয়ে যেতেন। এই কারণেই তিনি 'গীতগোবিন্দে' 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' এই আত্ম-পরিচয়টুকু চিরকালের জন্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কোনো ব্যক্তি-নিন্দায় সে পরিচয় কোনরূপেই ম্লান হবার নয়। আর স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ষোড়শ শতকে নিত্যপাঠ্য বলে যে গ্রন্থের প্রশস্তি গেয়ে গেছেন সেই 'শ্রীগীতগোবিন্দ' যে জাতির হৃদয়-সম্পদ বলে চিরদিনই বিবেচিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! চৈতন্যদেব কীভাবে 'গীত-গোবিন্দ' আদি বৈষ্ণব-গ্রন্থের পবিত্রতা প্রচার করে গেছেন সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিদিন একত্রে কাব্য-মধু আস্বাদন করতেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং এইসব গ্রন্থ যে অমূল্য সম্পদ সে বিষয়ে তিনিই আরেকবার নতুন করে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন।

'গীতগোবিন্দে'র প্রথম সর্গের প্রথম গীতে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের প্রবর্তক জয়দেব দশাবতারের বন্দনা গান গেয়েছেন এবং গীতের উপসংহারে সর্বরসাধিষ্ঠাতা আদিরসস্বরূপ দশাবতারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সেন যুগের পূর্বে পাল বংশের শাসন চলেছিল বাঙলা দেশে এবং পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল এবং হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর এক অবতার বলে মেনে নিয়েছিলেন। 'গীতগোবিন্দে'র প্রথম গীতের ত্রয়োদশ কলিতে অতি মনোরম ভাষায় সে কথাই ব্যক্ত করেছেন জয়দেব। বলেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞ বধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিত পশু ঘাতম্ ॥
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

অর্থাৎ বুদ্ধরূপধারী কেশব যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে করুণা-বিগলিত হয়ে যজ্ঞবিধির প্রবর্তক শ্রুতির (বেদের) নিন্দা করেছিলেন, এ জন্যে তিনি প্রণম্য, তাঁর জয় হোক!

আর লক্ষ্মণ সেনের সময়েই ম্লেচ্ছদের উপদ্রব শুরু হয়েছিল দেশে এবং ম্লেচ্ছ নিধনে কল্কি অবতারের বন্দনা করে জয়দেব প্রথম গানটি সমাপ্ত করেছিলেন।

এমনি ভাবেই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' তাঁর আত্মকথাসহ যুগ-জীবনের ছায়া আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেই জন্যেই বলতে হয়, শুধু ধর্মগ্রন্থ বা বৈষ্ণব গীতিকাব্য হিসাবেই নয়, দ্বাদশ শতকের এক অমূল্য সমাজচিত্ররূপেও এর গুরুত্ব সমধিক এবং সেদিক থেকেও এই গ্রন্থখানি বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংস্কৃত কথ্যভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। তবুও বাঙালী জয়দেব সংস্কৃত ভাষাতে গান রচনা করিতে পারিয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথের এই কথার মধ্যে যেন একটা গৌরববোধের সুর ধ্বনিত শোনা যায়। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা সমগ্র মানব সমাজের হৃদয়-সঙ্গীতকে 'গীতগোবিন্দে' অতুলনীয় সুরে ঝঙ্কৃত করতে পেরেছিলেন বলেই জয়দেব এই মরজগতে অমর হয়ে আছেন।

বিদ্যাপতির যুগে দুই সংস্কৃতির সংযোগ

কবি জয়দেবের নামোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে আর যে দুই বৈষ্ণব কবির নাম মনে আসে তাঁরা হলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবি বলে দাবী করা হলেও তিনি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী এবং মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি। মৈথিলী ভাষায় রচিত তাঁর পদাবলীর ভণিতায় শিবসিংহ ও তদীয় পত্নী লছিমা দেবীর নাম যুক্ত রয়েছে। মৈথিলী ছাড়াও অবহট্ট এবং সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতি বহু নিবন্ধাদি ও পদ রচনা করেছেন নানাবিধ বিষয় নিয়ে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় সেখানে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক কবি। কে আগে কে পরে তা আজও পর্যন্ত স্থির করা সম্ভব না হলেও এটা ঠিক যে, তাঁরা উভয়েই পঞ্চদশ শতকের বৈষ্ণব কাব্য রচয়িতা। তখন দেশে পাঠান শাসনকাল চলেছে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে মুসলমান-বিদ্বেষী সাহিত্যিক বলে চিত্রিত করে থাকেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' 'শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন 'রাজা ভিন্ন জাতি হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যায় না। বস্তুতঃ দেখিতে হইবে যে, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কিনা ?'

এই বিচারেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান শাসনকালের প্রশংসা করে তাঁর রচিত 'বাঙলার ইতিহাসে' লিখেছেন, 'সে সময়ে জমিদারগণ রাজার ন্যায় ছিলেন— করদ ছিলেন মাত্র।' তার পরে আরো বলেছেন, 'পরাধীনতার ফলে জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। কিন্তু পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়ে আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়েই স্মার্তিতিলক রঘুনন্দন, এই সময়েই চৈতন্যদেব, এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদের অপূর্ব গ্রন্থাবলী—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য।'

• পাঠান শাসনের প্রশংসায় বঙ্কিমচন্দ্র আরো অনেক কথা বলেছেন তাঁর 'বাঙলার ইতিহাসে', কিন্তু এখানে সে সবের উল্লেখ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তবে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির উল্লেখ এ জন্যেই করা হয়েছে যাতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সমসাময়িককালের পরিবেশ এবং সমাজ-মানস সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা সহজেই করে নিতে পারি।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আত্মকথার ভিত্তিতে তাঁদের সময়ের সামাজিক অবস্থা বিচার আরম্ভের পূর্বে উভয় কবির জীবনকাল নির্ণয়ের আরেকটু চেষ্টা করা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই চৈতন্যোত্তর কবি। এ বোধহয় ঠিক নয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বার-বার উল্লেখ করেছেন যে, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের পদগান শুনে চৈতন্যদেব অনুপম আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করতেন। কবিরাজ গোস্বামী সে-সব কথা অনুমানে লেখেন নি। বৃন্দাবনে চৈতন্য-সহচর রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরূপ ও সনাতনের কাছ থেকে তিনি ঐ-সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ গীতিকার নরহরি সরকার চণ্ডীদাস-পদাবলীর 'জগৎজোড়া' খ্যাতির উল্লেখ করেছেন। এসব থেকে আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি যে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক হলেও তাঁরা উভয়েই জন্মেছিলেন প্রাক-চৈতন্য যুগে।

নানা সূত্রেই জানা যায়, বিদ্যাপতি খুবই দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং কোনো কোনো অভিধানে দেখা যায় তিনি উত্তমায়ু (শতবর্ষের পরের জীবন-কাল) পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে গ্রীয়ারসন সাহেবের মতই সবিশেষ গ্রহণীয়। তাঁর মতে পূর্বে বা পরে কিছু-কিছু কাব্য-নিবন্ধ রচনা করলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধই বিদ্যাপতির যুগ। একথা ঠিক যে কবি-সাহিত্যিকদের বেলায় জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ তত বড়ো কথা নয়, তাঁরা এক-একজন তাঁদের নিজ-নিজ সৃষ্টিকালেরই প্রতিনিধি। বিদ্যাপতি তাঁর রচনাবলীতে জনকুড়ি পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁদের জীবনকাল বা শাসনকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও গ্রীয়ারসনের মতই সমর্থিত হবে। চণ্ডীদাসের কালও ১৪১৭ থেকে ১৪৮৭ বলে ধরা হয়ে থাকে। অথচ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকাল ১৪৫৮ থেকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত। মোটামুটি এই সময়সীমা ধরে নিয়েই আমরা সমকালীন সমাজচিত্র নিরূপণের চেষ্টা করবো। কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী অনুমানে বিদ্যাপতিই হবেন আমাদের প্রথম আলোচ্য।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' কবি রচিত 'পদসমুদ্র' থেকে কবির আত্মপরিচয়মূলক একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। কবি তাতে লিখেছেন :

জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিল দেশে করুঁ বাস।

পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপাকরি লেউ নিজ পাশ।
বিসফি গ্রামদান করল মুঝে
রহতহি রাজসন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহা ভাণ ॥—পদসমুদ্র

আত্মপরিচয়ের এ সূত্রটুকু ধরেই আমরা কবি বিদ্যাপতির কালের সমাজ-স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হতে পারি। প্রথমেই 'পঞ্চগৌড়' কথাটি বুঝে নেওয়া দরকার। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিন্ধ্যাচলের উত্তরবর্তী ও প্রাগ-জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থ বৃহৎ ভূখণ্ড সারস্বত, কাণ্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌড়ের প্রভাব এদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল বলেই এই রাজ্য কয়টি 'পঞ্চ-গৌড়' বলে অভিহিত হতে গৌরববোধ করতো আর যে রাজ্যের রাজা নিজেকে খুব প্রতাপশালী মনে করতেন, তিনি 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' বলে পরিচিত হতে চাইতেন।

সেকালে এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন অবশ্য বলেছেন যে, 'কালক্রমে কবি ও স্তুতিজীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।' সে যাই হোক পূর্বোক্ত পদে দেখা যায় যে কবি বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী, 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' রাজা শিবসিংহ তাঁকে নিজপাশে টেনে নিয়ে অর্থাৎ রাজকবি করে নিয়ে বিসপি নামক একটি গ্রামদান করেছিলেন। সেখানেই লছিমা চরণধ্যানে নিযুক্ত থেকে অর্থাৎ রাণী লছিমা দেবীর মনোরঞ্জন করে কবিতা রচনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন।

এইটুকু ছাড়া বিদ্যাপতি অপর কোনো পদে বা গ্রন্থে তাঁর কোনো পূর্বপুরুষ পরিজনের পরিচয় উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। অথচ তাঁর বংশপঞ্জী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিদ্যাপতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও রাজমন্ত্রী বীরেশ্বর, গণেশ্বর প্রভৃতির অধস্তন পুরুষ। মিথিলা রাজ-পরিবারের সঙ্গে কয়েক পুরুষের নৈকট্যই যে কবি বিদ্যাপতিকে রাজা শিবসিংহের একান্ত অন্তরঙ্গ করার পথে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এখন দেখা দরকার কোন সময়ে শিবসিংহ মিথিলায় রাজত্ব করছিলেন এবং তাঁর পূর্বেকার ও পরের রাজাদেরই বা পরিচয় কি? বিদ্যাপতি আপন পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে নীরব থাকলেও রাজপ্রভু শিবসিংহের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

মিথিলাপতিদের পরিচয় বর্ণনায় কোথাও কার্পণ্য দেখান নি। এর প্রধান কারণ এঁদের অনেকেই ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক।

বিদ্যাপতির প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কীর্তিলতা'। এই গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন রাজা কীর্তিসিংহের রাজত্বকালে। এলাহাবাদের হিন্দুস্থানী একাডেমী থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' রচয়িতা ডঃ উমেশ মিশ্রের মতে 'কীর্তিলতা' রচনার সময় তার গ্রন্থকারের বয়েস ছিল অন্তত বিশ বছর। এই কীর্তিলতা গ্রন্থেই দেখা যায় যে, কামেশ্বর রাজবংশের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ রাজা কীর্তিসিংহ। এই রাজবংশ ওইনী বংশ বলে 'কীর্তিলতা'য় কীর্তিত এবং এই গ্রন্থের প্রথমাংশ পাঠেই আমরা জানতে পারি যে, এই ব্রাহ্মণ রাজবংশেই কামেশ্বর রায়ের জন্ম। তারই পুত্র দানশীল ভোগীশ্বর—দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ যাকে পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং প্রিয়সখা বলে সমাদর ও সম্মান করতেন। তাঁর পুত্র গএনশ (গণেশ বা গণেশ্বর) রাজ্যলুব্ধ অসলান নামক এক মুসলমানের হাতে নিহত হলে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহের সহযোগিতায় পিতৃহন্তারকের বিরুদ্ধে অভিযান ও আক্রমণ চালিয়ে কীর্তিসিংহ অসলানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাভূত করেন এবং জৌনপুর সুলতানের সামন্তরাজরূপে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কীর্তিসিংহ রাজা গএনশের মধ্যম পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ বীরসিংহ এবং কনিষ্ঠ রাঅসিংহ (রায়সিংহ, রামসিংহ বা রাজসিংহ)।

যাই হোক, বিদ্যাপতি অসলানের সঙ্গে কীর্তিসিংহের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষদর্শীর জীবন্ত বর্ণনাই পাওয়া যায় 'কীর্তিলতা' গ্রন্থে। ১৪০২ থেকে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কীর্তিসিংহ পিতৃরাজ্য ত্রিহুত উদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের মধ্যেই যে বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' রচনা সমাপ্ত করেছিলেন তার প্রমাণ, কবি প্রতি পল্লবেই নৃপতি কীর্তিসিংহকে লক্ষ্য করে তাঁর সাফল্যের জয়গান করেছেন। গ্রন্থখানি মূলত মৈথিলী 'অবহট্ট' ভাষায় লিখিত হলেও সংস্কৃতবহুল এবং তার শেষ শ্লোকটি পুরোপুরি সংস্কৃত রচনা। ভূপরিক্রমা, পুরুষ-পরীক্ষা, বিভাগসার, শৈবসর্বস্বসার বা শম্ভুবাক্যাবলী ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখেছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তখনো দেশে দেবভাষার অসামান্য প্রভাব বর্তমান ছিল, যদিও ক্রমশই তা ক্ষীয়মাণ হয়ে চলেছিল।

উপরোক্ত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থ এবং বিদ্যাপতি রচিত অন্যান্য আরো গ্রন্থ কোনো-না-কোনো রাজা বা রাণীর আজ্ঞায় লিখিত এবং তাঁদের স্ব স্ব কালের

কাহিনীই তাতে বর্ণিত। সেই হিসাবে এগুলিকে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ বলা যেতে পারে। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় বিদ্যাপতি যে কিরূপ অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, 'কীর্তিলতা' থেকেই তা প্রথমে দেখানো যেতে পারে।

'কীর্তিলতা'র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ২৫২ লক্ষ্মণ সম্বতের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে অর্থাৎ ১৩২২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে অসলানের হাতে গএনশের মৃত্যু ঘটে। সেই থেকে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে কীর্তিসিংহের সিংহাসন আরোহণের সময় পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছরকাল ধরে ত্রিহুত রাজ্যে যে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল, তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় 'কীর্তিলতা'র বর্ণনায়। সেখানে স্বভাবতই সামাজিক অধঃপতনের চেহারাটিও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। এই বিষয়ে একটি পল্লবে বিদ্যাপতি লিখেছেন—

ঠাকুর ঠক ভত্রে গেল, চোরেঁ চুপরি
ঘর লিজ ঝিঅ।
দাসে গোমাঞ্চ নিগছিঅ, ধম্ম গএ
ধন্ধ নিমজ্জিঅ॥
খলে সজ্জন পরিভাবঅ কোই
নহি হোই বিচারক।
জাতি অজাতি বিবাহ,
অধম উত্তম কাঁ প'রক॥
অখখ্‌র-রস বুঝঝ নিহার নহি,
কই কুল ভমি ভিখ্‌খারি ভঁউ।
তিরহুত্তি তিরোহিত সব্বগুণে,
রাত্র গএনস জবে সগ্‌গ গঁউ।

সোজা বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ গণেশ বা গণেশ্বর রাজার স্বর্গগমনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিহুত রাজ্যের সমস্ত গুণও লোপ পেল। ঠাকুরব্যক্তিরা অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা সব ঠক হয়ে গেল; চোরেরা সব ঘরবাড়ি দখল করে বসলো। ভৃত্যদের হাতে প্রভুরা নিগৃহীত হতে থাকলেন এবং ধান্ধায় পড়ে ধর্ম উচ্ছন্নে গেল। খলের কাছে সজ্জনদের পরাজয় স্বীকার করে চলতে হলো, কারণ তখন বিচারক কেউ ছিল না। জাতি-অজাতির মধ্যে তখন বিয়ে চলছিল। উত্তমের চেয়ে অধমের মর্যাদা সে সময় বেড়ে গিয়েছিল। বিদ্যার ধর্ম বুঝতে পারার মতো লোক তখন পাওয়া যেতো না। কুলীন ব্যক্তিরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকরাও ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল।

যুদ্ধকালীন লোক-দুর্দশারও অনেক বর্ণনা রয়েছে 'কীর্তিলতা'য়। যুদ্ধের সময় মূল্য বৃদ্ধির দরুণ যে দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল সকলকে কীর্তিসিংহের রাজ্যলাভের পূর্বে, তারও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন বিদ্যাপতি।

পানীয় জল তখন স্বর্ণ মুদ্রায় বিকোচ্ছিলো, এমন কি সৈন্যদেরও জল কিনে খেতে হচ্ছিলো। চন্দনের মূল্যে জ্বালানী কাঠ বিক্রি হচ্ছিলো আর তখন লোকে ঘি কিনছিলো ঘোড়া বেচে।

এই গ্রন্থে সমাজচিত্রের আরো অনেক দিকই কবি তুলে ধরেছেন। তখন সৈন্যদের অত্যাচার-ভয়ে তরুণীদের মধ্যে কোনো নিরাপত্তাবোধ ছিল না। জৌনপুরের নগর-সৌন্দর্যের এবং সেখানকার বারবনিতাদের সাজসজ্জা ও আচরণের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বিদ্যাপতি, তাতে সেকালের নগরজীবনের একটা রূপ পাঠকের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এছাড়া তখনকার হাট-বাজারের কথা, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি নানা বিষয়েরই পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে। মুসলমান সুলতানরা কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন হিন্দু সামন্ত নৃপতিদের, 'কীর্তিলতা' পাঠে সে ধারণাও হবে।

এমনিভাবেই পর পর একেক রাজার আমলে লিখিত একেকখানি গ্রন্থে সমসাময়িক সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন বিদ্যাপতি। 'কীর্তিলতা'র পরেই বিদ্যাপতির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ভূপরিক্রমা'। এ বই লিখেছিলেন তিনি কীর্তি সিংহের জ্ঞাতিকাকা (পিতামহ ভোগীশ্বরের ভাই ভবসিংহ বা ভবেশের প্রথম পুত্র) দেবসিংহের কথায়। গ্রন্থারম্ভেই কবি তা স্বীকার করে নিলেও তিনি কোথাও দেবসিংহ বা তাঁর পুত্র শিবসিংহকে এই গ্রন্থে রাজা বা কুমার বলে স্বীকার করেন নি, বরং বলেছেন যে, সে সময়ে দেবসিংহ সপুত্র নৈমিষারণ্যে বাস করছিলেন। হয়তো অসলানের অত্যাচার ভয়েই তিনি সপুত্রকে অরণ্যবাসী হয়ে থাকবেন বিদ্যাপতিকে সঙ্গে নিয়ে। ভোগীশ্বর-পুত্র রাজা গএনশকে (গণেশ বা গণেশ্বর) হত্যা করে অসলান প্রথমে ত্রিহুতের অর্ধাংশ মাত্র অধিকার করেছিলেন। অপরাংশ তখন ভোগীশ্বর-ভ্রাতা ভবসিংহ বা ভবেশ-তনয় দেবসিংহের শাসনাধীনে থাকার কথা। কিন্তু গএনশকে হত্যার পর তাঁর রাজ্য অধিকার করে ত্রিহুতের অপরাংশে আক্রমণ করা অসলানের দিক থেকে মোটেই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলে গণ্য হতে পারে না। এবং সেরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে আশার দৃষ্টি রেখে দেবসিংহের পক্ষে সপুত্রক বনে আশ্রয় নেওয়াও নিশ্চয়ই বিচিত্র কিছু নয়।

'ভূপরিক্রমা'য় মিথিলা থেকে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের বিবরণ

রয়েছে। এ-থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, দেবসিংহ ও শিবসিংহের সঙ্গে বিদ্যাপতিও পথের সমস্ত তীর্থ পর্যটন শেষ করে নৈমিষারণ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর জৌনপুর সুলতানের সাহায্যপুষ্ট কীর্তিসিংহের হাতে অসলানের পরাভবের পর তাঁরা সবাই আবার স্বরাজ্যে ফিরে এসে থাকবেন। ভোগীশ্বর রাজা হয়ে রাজ্যের অর্ধাংশ ছোট ভাই ভবসিংহকে অর্পণ করে ভ্রাতৃপ্রেমের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এতে কিছুকালের জন্যে ত্রিহুত দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভোগীশ্বরের অপুত্রক পৌত্র কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্ল-পিতামহ ভবসিংহ-তনয় দেবসিংহের হাতে আবার সমগ্র ত্রিহুতের শাসনভার এসে পড়ে। তবে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত দেবসিংহ অল্প কিছুদিন বাদেই পুত্র শিবসিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে অবসর গ্রহণ করেন।

দেবসিংহের ঐ স্বল্পকালীন শাসন-সময়ে রচিত কয়েকটি পদে বিদ্যাপতি এই রাজাকে 'জাচক জনপতি' অর্থাৎ প্রার্থীদের আশাপূরণকারী দানশীল নরপতি বলে বন্দনা করেছেন। ঐ সকল পদে রাণী হাসিনি দেবীরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কামেশ্বর বংশের যে পাঁচ-ছয়জন রাজার রাজত্বকালে দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতি অর্ধ-শতাব্দী ধরে কাব্য রচনা করেন তাঁদের এবং রাজ-মহিষীদের অনেকেরই দানশীলতার গুণগান করেছেন কবি। ভারতীয় সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দান ধর্ম ও সেবাবৃত্তি সবিশেষ বন্দিত হয়ে আসছে। সে ধারা তখনো যে অব্যাহত গতিতে চলে আসছিল, বিদ্যাপতির রচনায় তার বহু প্রমাণ মিলে।

দেবসিংহের স্বর্গারোহণ ও শিবসিংহ ভূমের সিংহাসন লাভ বিষয়ে বিদ্যাপতি রচিত একটি মৈথিলী পদের গুরুত্ব সমধিক। এই পদে দেখা যায় যে, পিতৃ-বিয়োগান্তে শিবসিংহ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে নিজ হাতে শাসন ভার নিয়েছেন। কিন্তু মিথিলার রাজপঞ্জীতে নির্দেশিত সন-তারিখের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই এবং প্রকৃতপক্ষে পিতা থাকতেই তিনি রাজা হয়েছিলেন। তা হলেও তখনকার পরিবেশ-পরিচয় হিসাবে উক্ত পদটির ভাবানুবাদ এখানে উল্লেখযোগ্য। কবি বলছেন—

হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্বরাজা দেবসিংহ বর্তমান ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের (১৪০০ খৃঃ) চৈত্র-কৃষ্ণপক্ষের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গের দেবরাজ-সিংহাসনের অর্ধভাগী হয়েছেন। রাজ্য রাজশূন্য হয়নি, তাঁর পুত্র শিবসিংহ রাজা হয়েছেন। শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান। তিনি সম্মুখবর্তী যবনদের তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞানে অমৃতধাম জাহ্নবী-অঙ্কে পিতার শব দাহ করে মুহূর্তে

যবনরাজের সৈন্যদের পরাভূত করেছেন। তারপর তোমাদের নতুন রাজা অকুতভয়ে অগণিত সৈন্য-দর্পিত যবনরাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে,—দেখনি আকাশে সারি বেধে দেবতারা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। মুহূর্ত মধ্যে যবনরাজ পলায়ন করলেন। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজলো। শিবসিংহের মাথার ওপর কতই না সুরতরুকুসুম পড়তে লাগলো। বিদ্যাপতি কবি বলছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা, তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

কবি বিদ্যাপতির 'পদসমুদ্র' থেকে উদ্ধৃত আত্মচরিতমূলক পদটিতে দেখা যায়, শিবসিংহ ভূপ বিদ্যাপতিকে কৃপা করে নিজ পাশে নিয়ে তাঁকে বিসফি নামক একটি গ্রাম দান করেছিলেন। কোথায় এই বিসফি গ্রাম? যতদূর জানা যায়, মিথিলার সীতামারি মহকুমাস্থিত জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নামক নদীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। কিন্তু রাজা শিবসিংহের কাছ থেকে বিসফি গ্রাম দান হিসাবে পাবার অনেক আগেই বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' ও 'ভূপরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থ ও পদ রচনা করে যে 'কীর্তিমান পণ্ডিত' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা আমরা পূর্বেই জেনেছি।

যে দানপত্র বলে বিদ্যাপতি বিসফি গ্রাম লাভ করেছিলেন তাতে শিবসিংহ 'দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ' বলে কীর্তিত হয়েছেন এবং কবি বিদ্যাপতিকেও সেখানে 'মহাপণ্ডিত' ও 'নবজয়দেব' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। প্রায় তিন শ' বছর পর জয়দেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-কাব্যের ধারায় বিদ্যাপতি ঠাকুর নতুন করে রাধা-কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন বলে কবি নিজেই 'নবজয়দেব' বলে নিজেকে ঘোষণা করে থাকতে পারেন অথবা এ তাঁর প্রাপ্ত উপাধিও হতে পারে। কিন্তু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন দানপত্রে বিদ্যাপতি সম্পর্কে 'মহাপণ্ডিত' এবং 'নবজয়দেব' আখ্যায় আপত্তি তুলেছেন। তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই বিষয়ে লিখেছেন যে, 'ভূমিদানকালে বিদ্যাপতির বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,—তদূর্ধ্বে বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতির জীবনী ১২৩ বৎসরেরও বেশী হইয়া পড়ে। ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে 'মহাপণ্ডিত' এবং 'নবজয়দেব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এরূপ নবযুবককে মহারাজ শিবসিংহ একখানি বড় গ্রাম দান করিবেন—ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান।'

কিন্তু কোনো 'অদ্ভুত অনুমানকে' অপ্রমাণ করবার জন্যে কারো বয়েস বাড়ানো-কমানো কি সমর্থনযোগ্য? আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এরূপ 'কল্পনা' করতে চেয়েছেন যে, শিবসিংহ যখন কবিকে গ্রাম দান করেন তখন

বিদ্যাপতির বয়েস ছিল ২০ বছর মাত্র। কিন্তু এরূপ কল্পনা করার পূর্বে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, শিবসিংহের আগে অল্প কিছুকালের জন্যে হলেও তাঁর পিতা দেবসিংহ ত্রিহুতের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং তাঁর আদেশেই কবি 'ভূপরিক্রমা' নামক ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করেছিলেন। দেবসিংহ তাঁর সম্পর্কিত অপুত্রক ভ্রাতুষ্পুত্র কীর্তিসিংহের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। খুব বেশিদিন না হলেও কীর্তিসিংহও কয়েক বছর রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁরই আজ্ঞায় লিখিত হয়েছিল বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'। দানে বিসফি গ্রাম প্রাপ্তির সময় বিদ্যাপতির বয়েস মাত্র ২০ বছর ছিল কল্পনা করে নিতে গেলে স্বভাবতই এটা ধরে নিতে হয়, 'কীর্তিলতা' একেবারে কিশোর-কবি বিদ্যাপতির রচনা। ঐরূপ একখানি অসামান্য গ্রন্থ লেখা কি কোনো কিশোরের পক্ষে সম্ভব? সেটা কি আরো 'অদ্ভুত অনুমান' বলে মনে হবে না?

সুতরাং 'কীর্তিলতা' রচনার সময় গ্রন্থকারের বয়েস অন্তত বিশ বছর ছিল বলে 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' রচয়িতা ডঃ উমেশ মিশ্র যে অনুমান করেছেন তাই গ্রহণীয় বলে মনে হয় এবং সেই বিচারে বছর আট থেকে দশ বছর পর শিবসিংহ রাজা হলে বিদ্যাপতি সেই আনুপাতিক বয়েসে বিসফি গ্রাম দানস্বরূপ গ্রহণ করে থাকবেন, সেরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাতে যদি শেষ গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' রচনাকালে কবির বয়েস ৯৬ বছরও দাঁড়ায় তাও ততটা বিস্ময়কর বলে মনে হবে না, চৌদ্দ-পনেরো বছরেব ছেলের পক্ষে 'কীর্তিলতা' লেখা যতটা অসম্ভব বলে প্রতিভাত হবে।

বিদ্যাপতি 'উত্তমায়ু' লাভ করেছিলেন অর্থাৎ শতাব্দিক বছর বেঁচেছিলেন। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র পরেও তিনি কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন পরবর্তী রাজাদের সময়ে। তিনি যে উত্তমায়ু পুরুষ ছিলেন এও তার একটা প্রমাণ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অপর কয়েকজন বিদ্যাপতি নামীয় কবির অনেক পদ 'কবিকণ্ঠহার নবজয়দেব' বিদ্যাপতির রচনায় প্রক্ষেপিত হয়ে থাকলেও তাঁর নিজস্ব রচনা সম্পদের পরিমাণও বড়ো কম নয়।

বিদ্যাপতি প্রথম যুগে ইতিহাসের কবি, ইতিবৃত্তকে তখন তিনি গাথায় গেঁথেছেন; মধ্যযুগে তিনি সার্থক প্রেমের কবি—সেখানে তাঁর ভাবসম্মেলনের পদগুলি অতুলনীয় প্রেমানুভূতির নিবিড়-গভীরতায় এক একটি যেন রসসিন্ধু। সেখানে কবি ভক্তসাধকের পর্যায়ে উন্নীত হলেও সেইসব পদাবলী নিয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আর এই সার্থক প্রেমের কবিই যে আবার প্রার্থনারও শ্রেষ্ঠ কবি সে প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

এমন একজন দীর্ঘায়ু কবির আত্মচরিতের ভিত্তিতে সমকালীন সমাজ বিষয়ক আলোচনা একটি মাত্র নিবন্ধে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই এখানেই প্রাক শিবসিংহ যুগের বিদ্যাপতি-কালের সমাজচিত্রের আলোচনা শেষ করা হলো। পরবর্তী প্রবন্ধে শিবসিংহ ও তৎপরবর্তী যুগের বিদ্যাপতি-রচনাবলীর পটভূমিকায় সে সময়কার সমাজজীবনকে তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ বিদ্যাপতির সে-সব রচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মজীবনীমূলক।

রাজা শিবসিংহ ও তৎপরবর্তীকালের বিদ্যাপতি-কথা

শিবসিংহ মিথিলার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পরেই বিদ্যাপতি রাজকবি পদে বৃত হয়েছিলেন। শিবসিংহের শাসনকাল আরম্ভের সন-তারিখ নিয়ে নানা মতের নজির রয়েছে। এমন কি রাজপঞ্জী এবং স্বয়ং বিদ্যাপতি লিখিত পদে বর্ণিত কালের মধ্যেও দুস্তর প্রভেদ। তবে সমকালীন সমাজবিষয়ক আলোচনায় আমাদের সেইসব সন-তারিখের অত গোলমালের মধ্যে যাবার কোনোই প্রয়োজন করে না। শুধু এইটুকু সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, দেবসিংহের জীবিতাবস্থায় পুত্র শিবসিংহকে ত্রিহুত রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করা হয় এবং সে সময়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর যৌবনোত্তীর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত কবি হিসাবে সর্বত্র সম্মানিত।

নতুন রাজা শিবসিংহের আদেশে প্রাক্তন মিথিলাপতি দেবসিংহের জীবনকালের মধ্যেই বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক দানধ্যান ও সত্যধর্মাদিবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। বিশেষ করে বিষয়ের গুরুত্বের জন্যেই এবং বিদ্যাপতির ভাষা-লালিত্য ও উপমাগুণের জন্যেও এ বইখানি সারা ভারতে সমাদৃত। মনে হয় সারা ভারতে প্রচারের আশাতেই 'পুরুষ-পরীক্ষা' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে দেখা যায়, কবি কোনোরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচবোধ না করেই রাজা শিবসিংহকে একেবারে 'ক্ষিতিপতি' ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কারণ তখন যে তিনি সত্যি ত্রিহুতরাজ! শিবসিংহের বীরত্ব ও কীর্তিগাথা বর্ণনা করে কবি বিদ্যাপতি আরেকখানি কাব্যগ্রন্থও প্রণয়ন করেন, সেটির নাম 'কীর্তিপতাকা'। গল্পচ্ছলে দান, দয়া, বিদ্যা ও সত্যধর্ম প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনাযুক্ত সংস্কৃত নীতি-গ্রন্থ রচনা করে 'পুরুষ-পরীক্ষায়' কবি একদিকে রাজা শিবসিংহের যুগের মহৎ নৈতিক আদর্শের দিকটি সর্ব-ভারতের জন্যে তুলে ধরেছিলেন এবং অন্যদিকে রাজ্যের 'অবহট্ট' লোকভাষায় 'কীর্তিপতাকা' লিখে তিনি প্রজাবর্গের মধ্যে রাজকীর্তি প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

শিবসিংহের শাসনকালও খুব দীর্ঘ হতে পারেনি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের হিসাব অনুসারে মোটামুটি ১৪১০ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে তিনি মাত্র তিন বছর নয় মাস রাজত্ব করেছিলেন। 'পুরুষ-পরীক্ষা' ও 'কীর্তিপতাকা' ছাড়া কবি বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের নামে প্রায় দু'শ পদ

(এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত) উৎসর্গ করেছেন। কবির নানা গ্রন্থ ও পদাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কীর্তি সিংহ, দেবসিংহ শিবসিংহ ছাড়াও বিদ্যাপতি শিবসিংহের ভাই পদ্মসিংহ ও তাঁর স্ত্রী বিশ্বাস দেবী, রাজা দেবসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র হরিসিংহ-তনয় নরসিংহ ও তাঁর পত্নী এবং তাঁদের তিন ছেলে ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও চন্দ্রসিংহের নামও কয়েকটি গ্রন্থে ও বিভিন্ন পদের ভণিতায় ঘোষণা করেছেন।

কামসিংহ রাজবংশের বাহিরেও কবির আরো কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন ঐ রাজবংশেরই মন্ত্রী বলে অনুমিত এবং দু'জন মুসলমান। ঐ মন্ত্রীত্রয় কোন্ কোন্ রাজার মন্ত্রী তা এ পর্যন্ত জানা যায়নি, সমকালীন সমাজ-সমীক্ষায় তার তেমন কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ বিদ্যাপতির জীবনকালে ত্রিহুতে যে কয়জন রাজা রাজত্ব করেছেন তাঁদের প্রায় সবলের আদেশ-নির্দেশেই তিনি কাব্য রচনা করেছেন এবং তাতে তাঁর সময়ের সমাজ-রূপ প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে কবি যে'দু'জন বা ততোধিক (বিদ্যাপতি ব্যাখ্যাকার নগেন গুপ্ত হুসেন শাহ, নসীর শাহ, আলম শাহ প্রভৃতির নামেও উৎসর্গীকৃত যে কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির রচনা বলে গ্রহণ করেছেন, তার পরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি) মুসললমান পৃষ্ঠ-পোষকের নামোল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একজন হলেন বাঙলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯), যিনি পিতৃহন্তারক হলেও দানশীল কাব্যামোদী সুশাসক বলে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। শিবসিংহ ও দেবসিংহের অল্প কিছু আগের এই বঙ্গ-সুলতান সম্পর্কে বিদ্যাপতি একটি পদে তাঁর দীর্ঘ-জীবনের জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে লিখেছেন, 'মহলম জুগপতি চিরে জীবে জীবথু গ্যাসদীন সুলতান।' অর্থাৎ ঈশ্বরানুগৃহীত যুগপতি সুলতান গিয়াসুদ্দীন চিরজীবি হোন, এই হলো বিদ্যাপতির প্রার্থনা।

জৌনপুরের পাঠান সুলতান ইব্রাহিম শাহ যেভাবে কীর্তিসিংহকে তাঁর পিতৃ-সিংহাসন উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন এবং বাঙলার পাঠান সুলতান গিয়াসসুদ্দীন বা পঞ্চগৌড়েশ্বর নাসুরুদ্দীন মামুদের (১৪৪২-৫৯) দীর্ঘজীবন কামনায় কবি বিদ্যাপতিকে পদ রচনা করতে দেখা যায়, তাতে বলা যেতে পারে যে এসব দৃষ্টান্ত রয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান শাসনকালের অকাতর প্রশংসা করতে পেরেছেন।

জয়দেবের কালে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ে পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ বঙ্গদেশ দিল্লীর সুলতানদের সাময়িক অধীনতা থেকে বিদ্যাপতির যুগে আবার

কিছুকালের জন্যে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছিল। সে সম্পর্কে জয়দের ও বিদ্যাপতি বিষয়ক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'তারপর বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায় যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া পাইল। প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবনশাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে, জাতীয়জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবনবলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাদের পূর্বগামী, পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয়জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেবের প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন —তাহাতে নূতন রঙ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগতৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন।'

'জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম লুপ্ত, বিধর্মীগণ প্রভু, জাতীয়জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন।······ বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকৃত ধর্মের নবাভ্যুদয়ের, এবং রঘুনাথকৃত দর্শনের নবাভ্যুদয়ের পূর্বসূচনা হইতেছিল; বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাভ্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি।'

এখন বিদ্যাপতির রচনাবলী থেকে তখনকার সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কামেশ্বরবংশীয় নৃপতিবর্গ বার্ধক্যে পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করাকে কুলধর্ম বলে মনে করতেন। দেবসিংহও জীবিতাবস্থায়ই পুত্র শিবসিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে দেখা যায় যে, যবনদের সঙ্গে রাজা শিবসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি গৌড়ের রাজাকে 'নম্রীকৃত' করেছিলেন। গৌড়ের এক সুলতান শিবসিংহের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, 'শম্ভুবাক্যাবলী'তেও (শৈবসর্বস্বসার) বিদ্যাপতি আরেকবার তা উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কে ঐ গৌড়পতি সুলতান? ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ১৪১০ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে (শিবসিংহের রাজত্বকাল) বাঙলায় গণেশ নামে এক প্রবল

পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার সুলতান নিয়োগের ক্ষমতা পর্যন্ত প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরই মনোনীত দুই সুলতান সিহাবুদ্দীন রায়াজিদ শাহ এবং তাঁর ছেলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৪১১—১৪১৩) পরে তিনি নিজেই দনুজমর্দনদেব উপাধি নিয়ে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। শোনা যায় যে, বাঙলায় হিন্দুরাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নুর কুতুব-উল-আলাম নামক এক মুস্লিম পীর উত্তেজিত হয়ে জৌনপুরের সুলতানকে বাঙলা আক্রমণে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম শাহ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী নিয়ে গৌড় আক্রমণ করেন, কিন্তু রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

গৌড়ের প্রতাপশালী হিন্দু রাজা গণেশের সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু সামন্তরাজা শিবসিংহ যে সখ্যতা রক্ষা করে চলবেন এটাই স্বাভাবিক এবং তিনিও যে জৌনপুরের অধীনতাপাশ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন নৃপতি হতে চেয়েছিলেন তারও প্রমাণ রয়েছে। রাজা গণেশের মতো তিনিও নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। কোন্ ভরসায় তিনি এভাবে জৌনপুরের সুলতানকে অস্বীকার করতে সাহসী হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই গৌড়পতি গণেশের ভরসায় এবং জনশ্রুতি এই, ইব্রাহিম শাহের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে যে রাজা গণেশের সঙ্গে মিলিত হয়েই তিনি ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধেই (১৪১৪) হয় নিহত না হয় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। এইসব বিচার করে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গণেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিবসিংহ গণেশের পূর্ববর্তী বঙ্গাধিপতি সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকেই (অল্প কয়েক মাস তিনি রাজত্ব করেন) পরাভূত করেছিলেন যার ফলে গণেশ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদসাধনে প্রতিবেশী দুই হিন্দু রাজার পক্ষে এভাবে সম্মিলিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

যাই হোক কবি বিদ্যাপতি তাঁর কয়েকটি পদেই যবনদের বিরুদ্ধে শিবসিংহের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেকটা কবিভাবাপন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো। স্বধর্ম রক্ষায় স্বয়ং রামচন্দ্রই শিবসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এমন কথাই বলতে চেয়েছেন বিদ্যাপতি। এবং তিনি যে কত বড়ো বীর ছিলেন তা বুঝাতে তিনি একটি পদে বলেছেন—

দুর দুগ্‌গম দমসি ভঞ্জেও
গাঢ় গড় গূঢ়ীঅ গঞ্জেও
পাতিসাহ সমীম সীমা
সমর দরসেও রে॥

অর্থাৎ মিথিলা রাজ্যের সৈন্যদল দূরবর্তী শত্রুপক্ষীয় দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে ফেলেছে এবং (আক্রমণকারী) বাদশাহের রাজ্যের সীমায় যুদ্ধকে ঠেলে নিয়ে গেছে। এরপর ঘোরতর যুদ্ধপরিবেশের বর্ণনা দিয়ে ঐ পদেরই শেষাংশে কবি স্বধর্মরক্ষায় রামের সঙ্গে এবং দানগৌরবে দধীচির সঙ্গে তুলনা করে শিবসিংহকে সর্বগুণসম্পন্ন রাজারূপে গণ্য করবার জন্যে দেশবাসীর প্রতি নির্দেশ রেখে লিখেছেন—

রামরূপে সধম্ম খিথ্অ
দান দপে দধীচি রখ্খিঅ
সুকবি নব জয়দেব ভনিও রে ॥
দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
সত্রু নরবই কুল নিকন্দন
সিংঘ সম সিবসিংহ রায়া
সকল গুনক নিধান গণিও রে ॥

বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিপতাকা' গ্রন্থে রাজা দেবসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি ও পুত্রের রাজ্যারোহণ ছাড়াও একাধারে শিবসিংহ সম্বন্ধে বীররস ও শৃঙ্গাররস পরিবেশন করেছেন। তবে গৌড়ের এক সুলতানকে পরাভূত করে যেভাবে মিথিলা-রাজ তাঁর কীর্তিপতাকা উড়িয়েছিলেন সেটাই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার ধরে নেওয়া যায় যে শিবসিংহের প্রায় চার বছরের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হয়েছে। ফলে তখন সমাজে যে শান্তি ছিল না এবং সেজন্যে বিদ্যাপতিকেও যে অনেক সময় অশান্তির মধ্যেই কাটাতে হয়েছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে গোটা পঞ্চদশ শতকই উত্তর ভারতের পক্ষে একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সামাজিক অসুস্থতার যুগ বলে বিবেচিত। একমাত্র জৌনপুরে ইব্রাহিম শাহের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হলেও বাঙলায়, ত্রিহুতে, দিল্লীতে এবং অন্যান্য রাজ্যে শাসনকর্তৃত্বের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সর্বদিক থেকে সামাজিক শিথিলতা অনেকদিন ধরে প্রশ্রয় পেয়ে চলছিল। লুঠপাট, অত্যাচার-অবিচার ও নৈতিক অধঃপতনের সেই যুগেও শাসনকার্যে নারীর সফল্য আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বিদ্যাপতির বিভিন্ন রচনার কাল পর্যালোচনায় দেখা যায় শিবসিংহ যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত বা নিরুদ্দিষ্ট হলে অপুত্রক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহ কিছুকাল ইতস্তত করার পর ইব্রাহিম শাহের পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মিথিলার

রাজপদ গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু কবি বিদ্যাপতি তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না এবং সেই সঙ্কটকালে তাঁকে বেশ কিছু সময় বাইরে বাইরে ঘুরে বা আত্মগোপন করে কালাতিপাত করতে হয়। তারপরে দেখা যায় যে, কবি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্রোণবার রাজ্যাধিপতি পুরাদিত্যের আশ্রয় লাভ করেছেন এবং রাজধানী রাজবনৌলিতে বসে রাজাদেশে 'লিখনাবলী' রচনা করে চলেছেন। কম করে হলেও অন্ততপক্ষে দশটি বছর যে বিদ্যাপতি রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয়েই ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে রাজবনৌলিতে থাকার কালেই ভাগবতের অনুলিপি করার কাজ শেষ করেন। তারও বছর দুই পর ১৪৩০ থেকে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কবি বিদ্যাপতি রাজা পদ্মসিংহ ও রাণী বিশ্বাস দেবীর নামে একটিমাত্র পদ এবং দুইখানি গ্রন্থ 'শৈবসর্বস্বসার (শম্ভুবাক্যা-বলী) ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' উৎসর্গ করেছেন লক্ষ্য করা যায়। তাতে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে রাজ্যে কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কবি মিথিলায় ফিরে এসেছিলেন এবং নতুন রাজা-রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য সৃষ্টি করে চলে-ছিলেন। যে একটিমাত্র পদ বিদ্যাপতি রাজা পদ্মসিংহ ও বিশ্বাস দেবীকে অর্পণ করেছিলেন তাতে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই বিরহ-ব্যাকুলতা যে কি বিশ্বাস দেবীর প্রতি রসজ্ঞ নৃপতি পদ্মসিংহ তা জানেন — 'বিসবাস দেবিপতি রসকোবিন্দক নৃপতি পদুমসিংহ জানে।'

এর পর বিদ্যাপতির আর কোনো পদে রাজা পদ্মসিংহের নাম পাওয়া যায় না। কবির রচনা বিশ্লেষণে এরূপ অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে তিনি বিশ্বাস দেবীর আদেশে 'শৈবসর্বস্বসার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' ইত্যাদি রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 'শৈবসর্বস্বসারে' (শম্ভুবাক্যাবলী) পুত্র পরম্পরায় ভবসিংহ, দেবসিংহ ও শিবসিংহ এবং তার পরেই শিবসিংহানুজ পদ্মসিংহ ও তদীয় পত্নী বিশ্বাস দেবীর নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ 'গঙ্গাবাক্যাবলী'তে শুধুমাত্র বিশ্বাস দেবীর কথা থাকায় গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'শৈবসর্বস্বসার' রচনার কাল থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বাস দেবীই স্বামীর হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন। বিদ্যাপতি নিজেও 'শৈবসর্বস্বসার' গ্রন্থে রাজসিংহাসনে বসে বিশ্বাস দেবীর রাজ্য শাসনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। আড়াই হাজারেরও বেশি শ্লোকের এই সংস্কৃত গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকে শিবসিংহ-অনুজ পদ্মসিংহকে 'সংগ্রামে ভীমসদৃশ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সে জন্যেই অনুমান করা হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রের গুরুতর আঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় তিনি রাণীর ওপর শাসনভার ছেড়ে দিয়ে থাকবেন। রাণী বিশ্বাস দেবী সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে অশেষ

কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে 'শৈবসর্বস্বসারে'র সপ্তক থেকে একাদশ শ্লোকের মধ্যে। তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, স্বামীর সিংহাসনে বসে বিশ্বাস দেবী মিথিলা মহামণ্ডল শাসন করতেন এবং তাঁর ন্যায়নীতি অর্থাৎ রাজনীতিবোধ সমগ্র বিশ্বের খ্যাতি অর্জন করেছিল। সমুজ্জ্বল বুদ্ধি ও মধুর স্বভাবের এই মহিয়সী নারী দানে ছিলেন অতুলনীয়া। বিশ্বভাগ নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়ে তার চার দিকে তিনি এক চমৎকার উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাবত্তার দিক থেকেও তিনি যে কম ছিলেন না, সেকথা স্বয়ং বিদ্যাপতিই বলেছেন। 'গঙ্গাবাক্যাবলী' প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস দেবীরই লেখা, তিনি তাকে পূর্ণতা দিয়েছেন মাত্র, এমনি কথাই বলেছেন বিদ্যাপতি। কবির বর্ণনায় অতিশয়োক্তি কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু পাঁচশ' বছর আগের এক ভারতীয় নারীর রাজ্যশাসন দক্ষতার পরিচয়ে আমাদের সকলেরই গর্বিত বোধ করার কথা।

ভারতবর্ষের মানুষ স্বভাবতই তীর্থ-বিলাসী। পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীদের জন্যেই বিশ্বাস দেবী তাঁর পরিকল্পিত 'গঙ্গাবাক্যাবলী' কবি বিদ্যাপতিকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। তাতে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর অবধি গঙ্গাতীরবর্তী সব পুণ্যক্ষেত্রের তীর্থকৃত্যবিধি লিখিত রয়েছে।

বিদ্যাপতির পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ৫৮৫ টি শ্লোকের 'বিভাগসার' গ্রন্থ। পদ্মসিংহ ও বিশ্বাস দেবীর পর ত্রিহুত সিংহাসনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী রাজা নরসিংহ। শিবসিংহের খুল্লতাত হরি সিংহের পুত্র এই নরসিংহ রাজা হয়েই দর্পনারায়ণ উপাধি গ্রহণ করেন এবং বিদ্যাপতিকে 'বিভাগসার' রচনায় নিযুক্ত করেন। এই গ্রন্থখানি যুগ-যুগ ধরে হিন্দু সমাজের কাছে অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এতে দায়ভাগ, অপুত্রকের সম্পদভাগ, স্ত্রী-ধন বিভাগ, গুপ্তধন ভাগ প্রভৃতি অনেক সামাজিক বিষয়ের বিচার লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রাজা নরসিংহের রাণী ধীরমতী সেই যুগের আরেক মহিয়সী মহিলা যাঁর গুণ-কীর্তনেও আমরা বিদ্যাপতিকে মুখর দেখতে পাই। এই রাণীর নির্দেশেই কবি 'দানবাক্যাবলী' রচনা করেছিলেন। নামেই এই গ্রন্থের পরিচয়। ধর্মশালা নির্মাণে, কূপাদি খননে, তীর্থপথিক ও ভিক্ষুকদের সুখাদ্য দানে এই দানশীলা রাজমহিষী অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। দেশের শ্রেষ্ঠ কবিকে দিয়ে তিনি যে দানবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী থাকতে পারে?

বিদ্যাপতি রচিত শেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। রাজা

নরসিংহের জীবদ্দশায়ই তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাজভ্রাতা ভৈরবসিংহের নির্দেশে উক্ত গ্রন্থখানি লিখতে আরম্ভ করেন এবং রাজা ধীরসিংহকে তা উৎসর্গ করেন। কবি এই গ্রন্থে রাজাকে 'কংসদলন' বলে এক শ্লোকে উল্লেখ করেছেন এবং আরেকটি পৃথক পদে বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ নাগরী একমাত্র এই 'কংসদলন নারায়ণ সুন্দর' ধীরসিংহ রাজারই রঙ্গিণী হতে পারে।

পদ্মসিংহ ও বিশ্বাস দেবীর কোনো সন্তানাদি না থাকায় তাঁদের পর কবি বিদ্যাপতিকে কিছুকালের জন্যে শিবসিংহ-পদ্মসিংহের খুল্লতাত-ভ্রাতা ও ত্রিপুর-সিংহের পুত্র অর্জুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে দেখা যায়। অর্জুনের হাতে অল্প সময়ের জন্যে হয়তো ত্রিহুত রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা এসে থাকবে। সে জন্যেই নায়কনায়িকার বিরহ ও অভিসার বিষয়ক কয়েকটি পদ রাজা অর্জুন ও তাঁর কনিষ্ঠ অমর সিংহকে বিদ্যাপতি উৎসর্গ করে থাকবেন। ঐ কয়টি পদ থেকেই জানা যায় যে, রাজা অর্জুনের দুই রাণী ছিলেন—রাণী কমলা দেবী ও গুণাদেবী এবং কুমার অমর সিংহের পত্নীর নাম ছিল জ্ঞান দেবী।

রাঘব সিংহের নামেও বিদ্যাপতির তিনটি পদ উৎসর্গীকৃত দেখা যায়। কিন্তু কে এই রাঘব সিংহ, সে প্রশ্ন নিয়ে মতান্তর আছে। বিদ্যাপতি কর্তৃক রাজা বলে বিশেষিত এবং মোদবতী ও সোনামতী নামের দুই রাণীর পতি বলে অভিহিত এই রাঘব সিংহ রাজা শিবসিংহের অপর খুল্লতাত হরিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাজা নরসিংহের কনিষ্ঠ সহোদর বলে এক দল মতপ্রকাশ করেছেন। আবার অনেকের মতে ইনি নরসিংহের পরবর্তী নৃপতি ধীরসিংহের পুত্র এবং সংশ্লিষ্ট পদ কয়টি কবি বিদ্যাপতির শেষ বয়েসের রচনা।

বিদ্যাপতি রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পদাবলীতে উল্লিখিত মিথিলার রাজারাণীদের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিদ্যাপতির কালে পুরুষের একাধিক বিয়ে খুবই প্রচলিত ছিল। লছিমা দেবী ছাড়াও রাজা শিবসিংহের যে আরো রাণী ছিলেন রাজকবির পদাবলীতেই তার সন্ধান রয়েছে। পরবর্তী রাজাদের মধ্যেও অনেকেই যে একাধিক বিয়ে করেছিলেন বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যাপতির সমকালীন সমাজচিত্র বিষয়ে আলোচনার উপসংহারে সে-সময়ের ধর্মীয় পরিবেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাপতি উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিবিধ রচনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা লক্ষ্য করার মত। বৈষ্ণব কবি বলে পরিচিত হলেও তাঁর

প্রথম গ্রন্থ ‘কীর্তিলতা’ তিনি আরম্ভই করেছেন শিবস্তুতি দিয়ে। শিব, দুর্গা ও গঙ্গা প্রভৃতি দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রও প্রণয়ন করেছেন। কোনো কোনো পদে তিনি এমনও বলেছেন যে, ‘ইন্দ্র, চন্দ্র, গণেশ, কমলাসন হরি, সকল দেবতাকে ছেড়ে হে শিব-শঙ্কর, আমি তোমারই শরণ নিলাম— তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর’ এবং ‘ভন বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি’ ইত্যাদি তাঁরই নিজের কথা। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে তিনি যেমন বহু পদ রচনা করেছেন, তেমনি হর-গৌরী নিয়েও তাঁর বেশ কিছু পদ আছে। ‘পুরুষ-পরীক্ষা’য় পরমশৈব বলা হলেও রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত রাজা শিবসিংহ নিজে বোধহয় আসলে বৈষ্ণব ছিলেন। সম্ভবত সেজন্যেই রাজকবি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা উপলক্ষে রাজপরিবারের ওপর তার কতকাংশ আরোপ করে শিবসিংহ ও তাঁর মহিষীদ্বয়কে খুশী করার জন্যে অপূর্ব ভাষায় কামকলারস পরিবেশন করেছেন এবং নিজেকে ‘নবজয়দেব’ বলে ঘোষণাও করেছেন। এ সম্পর্কে আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, বিদ্যাপতি কয়েকটি বিখ্যাত পদে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেরও জয়গান গেয়েছেন যা থেকে হঠাৎ মনে হতে পারে যে, তিনি বোধহয় একেশ্বরবাদী ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে ইসলামী শাসন কায়েম হয়েছে এবং কবির জন্মভূমি ত্রিহুত রাজ্যের ওপরেও সে ঝড় এসে পড়েছে। দুই সংস্কৃতির সেই সঙ্ঘর্ষের পরিচয়ও বিদ্যাপতি তাঁর গ্রন্থাবলী ও পদাবলীতে একান্ত বাস্তবানুগভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

এ বিষয়ে এবং বিদ্যাপতির সমকালীন সমাজ-জীবন সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত উদ্ধৃত করেই আলোচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, ‘বিদ্যাপতি কীর্তনের গান লিখেন নাই। তাঁহার দু-দশটি গান লইয়া কীর্তনীয়ারা তাহাদের কীর্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন। বিষ্ণুর উপাসনায় কিছুই আপত্তি ছিল না। তিনি শিব-গঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্য তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব ভাব তাহাতে নাই বলিলেও হয়। তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরসের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম খুব বড় জিনিস, তিনি তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক সময় কৃষ্ণ-রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই প্রধান লক্ষ্য। মিথিলার রাজসভায়, ব্রাহ্মণ রাজার সভাসদগণের মধ্যে, বাহিরে একটা পবিত্র ভাব দেখান, একটা সংযত ভাব দেখান, একটা ধর্মের ভাব দেখান, খুব দরকার ছিল।

বিদ্যাপতি তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, রাজা ও রাজসভাসদেরাও ত রাজা ও রাজসভাসদই ছিলেন; গান, বাজনা, কাব্য, কবিতা, হাসিমস্করা এসবও ত তাঁদের সভায় ছিল। এগুলিও বিদ্যাপতি বেশ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজগণের কাব্যপ্রিয়তার কথা বিদ্যাপতি এক জায়গায় এইরূপে বলিয়াছেন ঃ—

গেহে গেহে কলৌ কাব্য
শ্রোতা তস্য পুরে পুরে।
দেশে দেশে রসজ্ঞাতা, দাতা জগতি দুর্লভঃ॥

দাতা জগতি দুর্লভঃ, কিন্তু মিথিলার রাজারা সকলেই কাব্যমোদী ছিলেন, কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁহাদের সময়ে মিথিলায় বিদ্যাপতির মত রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল।'

জীবনের শেষ অধ্যায়ে ভোগাসক্ত কবি বিদ্যাপতি ভোগবন্ধন কাটিয়ে উঠে ঊর্ধ্বতর চেতনার জগতে পদক্ষেপ করেছেন এবং চরমতম উপলব্ধিতে সেখানে তিনি 'জগ-তারণ দীন দয়াময়' শ্রীমাধবচরণে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন করে বললেন—

ভনঈ বিদ্যাপতি শেষ সমন-ভয়
তুঅ বিনু গতি নাহি আরো।
আদি-অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা॥

শেষ বয়েসে মৃত্যুভয়ের সম্মুখীন হয়ে আদি-অনাদির নাথ মাধবকেই দেখতে পেলেন কবি এবং শ্রীমাধব ছাড়া অন্য গতি নেই জেনে তাঁরই শরণ নিলেন। এমনিভাবেই ভোগের কবি প্রেমের কবি বিদ্যাপতি প্রার্থনার কাব্যেও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

চণ্ডীদাসের যুগে বাঙালী সমাজ

'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস প্রেমকেই সহ্য করিবার কবি।'—এই ভাষায় এক নিঃশ্বাসে জাতির দুই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যকৃতি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু কাব্যালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুগ-প্রতিনিধি হিসাবেই এসব কবিমনীষীর আত্মকথার পটভূমিতে তাঁদের কালের জাতীয় সমাজচরিত্র বা সমাজচিত্র বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য এবং সেই সূত্র ধরেই ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের ধারাকে সর্বসমক্ষে যথাযথ তুলে ধরা আমাদের স্ব-নির্ধারিত কাজ। যাঁরা আত্মকথা প্রকাশ করেছেন কিংবা আত্মচরিত লিখেছেন তেমনি সব প্রতিভাধরদের পূর্বাপর কাল নির্ণয় করে নেওয়াই সে-কাজে প্রথম প্রয়োজন।

বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ আলোচনায় পরিষ্কার করেই দেখানো হয়েছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক তাঁদের কর্মকাল। মিথিলার বিদ্যাপতির ন্যায় বাঙলার চণ্ডীদাসও সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষভাগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুই কবিতে যে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে বহু মহাজন-পদেই তার উল্লেখ রয়েছে, কাজেই অবিশ্বাস্য বলে সে তথ্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না। এবং চণ্ডীদাস রচিত বিভিন্ন পদে তাঁর আত্মপরিচয়মূলক আরো যে সব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে যথার্থভাবেই এরূপ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে বৈষ্ণবভূমি বীরভূমের নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'চণ্ডীদাসের নিবাসভূমি পবিত্র নান্নুর পল্লী এখনও আছে—পাগলচণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাশুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে।' যাঁর কাছে চণ্ডীদাসের কবিতা আশৈশব সুখদুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ এবং বহু বৎসর ধরে যিনি চণ্ডীদাসের গানকে 'গায়ত্রিমন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ' করে গেছেন সেই বিজ্ঞবর আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের চণ্ডীদাস বিষয়ক সুন্দর আলোচনায় চণ্ডীদাস কবির কালের বঙ্গসমাজ সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পদাবলীর যেসব অংশে কবি তাঁর আত্মকথার বর্ণনা রেখেছেন তার ভিত্তিতেই অর্ধসহস্র বছর পূর্বের বঙ্গীয় সমাজের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র। তিনি লিখেছেন—

'চণ্ডীদাস ৫০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি বাশুলিমন্দিরে স্বর্ণ-মণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্যের আলোকে এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, সেই শুভ-দৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি বাশুলীর নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন 'আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি, আমি কত তপস্যা দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকি, আমার একি হইল, তোমা অপেক্ষা রামী আমার নিকট সত্য হইল? আমি পতিত হইয়াছি, আমি কি করিব বলিয়া দাও।' বাশুলীর আদেশ তিনি শুনিলেন 'তুমি ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস ইনি তোমার হৃদয়কে যে পবিত্রতা দিবেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব না।' তাহাই হইল, জয়দেবীভাব ইতিপূর্বে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, রামীর প্রেমের দীক্ষা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নূতন পথ দেখাইল।'

ব্রাহ্মণ বংশে চণ্ডীদাসের জন্ম, কবি নিজেই সে-কথা বলেছেন এবং সাহিত্য-গবেষণার ফলে এ পর্যন্ত জানা গেছে যে চণ্ডীদাসের পিতা দুর্গাদাস বাগচী ছিলেন বাশুলী বা বিশালাক্ষী চণ্ডীদেবীর পূজারী। এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন 'চণ্ডীদাসের পিতা বাশুলিদেবীর পূজক ছিলেন, তজ্জন্যই বোধহয় পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখা হইয়াছিল। এখনও ঐ নান্নুর গ্রামে বাশুলিদেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্বাহিত হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরির মতে তারা ধুবনী) কবির হৃদয়ে অপূর্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল।'

ঐ মন্দির-সেবিকা রামমণিই (স্বর্গত জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিত চণ্ডীদাস জীবনীতে 'রামতারা' বলে উল্লিখিত। নরহরির 'তারা ধুবনী'র সঙ্গে এ-নামের সঙ্গতি রয়েছে বলে দীনেশচন্দ্র এই রামতারা নামটিই গ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।) রজকিনী রামী যাঁর কথা যাঁর নাম পদে পদে গেয়ে চলেছেন তিনি প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস। এই রজকিনীর প্রেমে পড়েই তাহলে চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীর দ্বারস্থ হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, 'আমি পতিত হয়েছি, কি করবো বলে দাও!'

রজকিনী-প্রেমের কলঙ্কহেতু তিনি যে সমাজচ্যুত, সে-বিষয়ে চণ্ডীদাস অবহিত ছিলেন। একদিন তাঁরই জ্ঞাতিজনেরা তাঁকে এসে যে-কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখে তিনি নিজেই এক পদ রচনা করে লিখেছেন, 'শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকলে ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বনাশ। তোমার পিরীতে

আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিয়া উঠাব কুলে।'

এই প্রসঙ্গ আলোচনায় দীনেশচন্দ্র বলেছেন যে, কুটুম্ব ভোজন করিয়ে পতিত চণ্ডীদাস-পরিবারকে জাতে তোলবার ব্যাপারে কবির বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবে তাঁর প্রতিপত্তিশীল ভাই নকুল এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়ে গ্রামের ব্রাহ্মণদের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের হয়ে অনুনয়-বিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা চণ্ডীদাসকে 'নীচ প্রেমে উন্মাদ' বলে অভিহিত করলেন এবং 'পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহারা সম্মতি নহে' ইত্যাদি আপত্তি দেখিয়ে 'কুটুম্ব ভোজনের আমন্ত্রণ গ্রহণে প্রথমে অসম্মতিই জানিয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত নকুলের আগ্রহাতিশয্যে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে 'তুমি একজন বট মহাজন, সকল করিতে পার' ইত্যাদি প্রশংসাবাক্যে তাঁকে আপ্যায়ন করে 'নিমন্ত্রণ-গ্রহণসূচক পান দান' করেছিলেন।

এদিকে তো চণ্ডীদাসের জাত যাবার কথা চারদিকে জানাজানি হয়ে গেছে। রামীর কানেও সব কথা এসেছে। তিনি 'নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে।' তাই 'গৃহকে যাইঞা পালঙ্ক পাড়িয়া শয়ন করিল তায়। কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায়।' তাই রামী মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে গিয়ে সোজা বকুলতলায় চলে যান। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একা একা কাঁদতে থাকেন।

এর মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হয়েছে। নানা রকম মিষ্টদ্রব্য সেখানে আনীত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণগণ আহার আরম্ভ করবেন ঠিক সেই সময়েই এক অঘটন ঘটে বসলো, যখন 'দ্বিজগণ ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে ধোবিনী তখন ধায়।' রজকিনী রামীর এরূপ আকস্মিক উপস্থিতিতে নকুল আয়োজিত কুলরক্ষামূলক ঐ 'কুটম্ব ভোজন' অনুষ্ঠানটির কী পরিণতি দাঁড়িয়েছিল, তা আর জানা যায় না। কারণ চণ্ডীদাস লিখিত এই আত্ম-পরিচয়মূলক রচনার শেষাংশটুকু এমনই কীটদষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে যে তা থেকে কোনো কথাই গবেষকদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

তাহলেও এই বর্ণনা থেকে তখনকার দিনের বঙ্গদেশের সমাজ-শাসন ধারার সঙ্গে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। চণ্ডীদাসের মতো যুগ-প্রতিনিধি কবিকেও অসামাজিক প্রেমের জন্যে পতিত হতে হয়েছিল, এবং তাঁর পরিবারের পুনরায় জাতে ওঠবার জন্যে, স্বচেষ্টায় না হলেও ছোট ভাইয়ের চেষ্টায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে প্রায়শ্চিত্তে উদ্যোগী হতে হয়েছিল, এটা সত্যি লক্ষ্য করার মতো।

কিন্তু চণ্ডীদাসের কাছে সমাজ তো বড়ো কথা নয়, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বা হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ তো তিনি স্বীকার করেন না—তাঁর কাছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এই পরম সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি যাঁর হয়েছে তাঁর পক্ষে রজকিনী রামী বা বেগম সাহেবার প্রেমে পড়তে আর বাধা কোথায়? ঘৃণা-লজ্জা-ভয়েরই বা আর কী থাকতে পারে তাঁর কাছে? 'সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালো-মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপ-পুণ্য মম, তোমার চরণ মানি।' এমনিভাবে যিনি সবকিছুই শ্রীরাধার মতো প্রেম-দেবতার চরণে সমর্পণ করে বসে আছেন, তাঁর আবার অন্য ভাবনার কী দরকার? আর তাঁর প্রেম তো সাধারণ মানুষী প্রেম নয়, 'কামগন্ধ নাহি তায়—এমনি প্রেম। সেজন্যেই চণ্ডীদাস তাঁর প্রেমিকাকে বলতে পেরেছেন, 'তুমি হও পিতৃ মাতৃ, 'তুমি বেদমাতা গায়ত্রী', 'তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস' ইত্যাদি। এবং সেজন্যেই প্রেম-চর্চায় শ্রীরাধিকার মতো কোনো কলঙ্কেরই পরোয়া করতেন না চণ্ডীদাস। তাই দেখি তাঁর নিজের কথাই তিনি যেন একটি পদে শ্রীরাধিকার বয়ানে বলছেন,

'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রায় সর্বত্রই একটি আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত। তবে বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসও ছিলেন একাধিক, সাধারণভাবে এটাই স্বীকৃত। সেই কারণে চণ্ডীদাস নামের সমস্ত পদে সুরের সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। তাহলেও মূল চণ্ডীদাস যে একজনই এবং তিনি যে নান্নুরের সেই চণ্ডীদাস ঠাকুরই, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন ঐ সুর বিচার করেই। তিনি লিখেছেন 'চণ্ডীদাসের একটি সুর আছে,…সেই সুরটি আমি চিনি…।' কাজেই তিনি যখন দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বলছেন যে, 'বিভিন্ন ভণিতা দেখিলেই যে কবি স্বতন্ত্র, এরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে' এবং কবি চণ্ডীদাস ও 'কৃষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি বলে তিনি যে অভিমত দিয়েছেন, সে মতকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

তাছাড়া রামীর চণ্ডীদাসের ভাষা যে 'অন্যের অনায়ত্ত' সে-কথাও অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদাবলীর তুলনায় 'কৃষ্ণকীর্তন' কি নিকৃষ্ট নয়? এ-প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র। 'কৃষ্ণকীর্তন'কে তিনি 'পাড়াগেঁয়ে কৃষক কবির অকপট লালসার কথা' এবং 'গ্রাম্য ব্যভিচারী প্রেমের শ্লীলতাশূন্য আবর্জনা' বলে উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীদাস কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য যে 'আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য' ও 'ব্যোমস্পর্শী পবিত্রতা' 'কৃষ্ণকীর্তনে' তার অভাবের কথা দীনেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন। তবে এ-বিষয়ে যে যৌক্তিকতায় তিনি 'কৃষ্ণকীর্তন'কে নান্নুরের কবি চণ্ডীদাসেরই রচনা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সে-যুক্তিকে সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না।

দীনেশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ আলোচনায় লিখেছেন, 'শ্রেষ্ঠ কবি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি বর্তমান যুগের কবি এবং ভবিষ্যৎ যুগের নির্দেশক। তিনি স্বীয় যুগকে আঁকিতে যাইয়া হঠাৎ দিব্য সংজ্ঞা বলে ভাবী যুগের ছায়াপাত করেন। চণ্ডীদাস যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে? তিনি সে-যুগের বাঙ্গালা ভাষার অমার্জিত রূপ, রুচি ও ইঙ্গিতকে তাঁহার রচনায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভাবী প্রেম-সাধনার যুগের আলো দেখিয়াছিলেন, সেই আলো তাঁহার লালসার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছিল এবং সেই আলোকপাতে তাঁহার 'রাধা-বিরহ' অভিনব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছিল। 'জন্মখণ্ড' 'তাম্বুলখণ্ড' 'দানখণ্ড', 'বৃন্দাবনখণ্ড'—গাহিতে গাহিতে তিনি বাগ্দেবীর কৃপায় নূতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। সেই মন্ত্রের মোহিনীতে 'রাধাবিরহ' আশ্চর্যরূপে উপাদেয় হইয়া উঠিল। এখন রামীর দুর্লভ প্রেম সেই মন্ত্রের প্রেরণা দিয়াছিল কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।'

হয়তো তাই। তা না হলে চণ্ডীদাস ঠাকুর লিখবেন কেন যে, শত শত বাশুলী তাঁকে যে প্রেমের শিক্ষা দিতে পারতেন না, স্বয়ং ব্রহ্মার পক্ষেও তাঁকে যে-জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হতো না, রামী তাঁকে তাই শিখিয়েছে, তাই দিয়েছে।

এভাবেই দীনেশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে, পদাবলীর কবি এবং 'কৃষ্ণকীর্তনে'র 'অনন্ত' নামীয় ও 'বড়ু' উপাধিধারী কবি একই চণ্ডীদাস এবং 'যদিও কৃষ্ণকীর্তনের রুচি গর্হিত, ভাব গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট, তথাপি এই পুস্তক যিনি বিশেষ অনুধাবন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহার চক্ষে পাড়াগাঁয়ের অমার্জিত কিন্তু অকপট সৌন্দর্য

উদ্‌ঘাটিত হইবে—আদর্শের খর্বতা তাঁহাকে সেই গ্রাম্য-রস উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না।'

আর 'কৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিখানি যে জাল গ্রন্থ নয়, তার প্রমাণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজলাইব্রেরীতে ঐ পুঁথিখানি সংরক্ষিত ছিল। চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কোনো লিপিকারেরই অঙ্গুলিখিত বলে চণ্ডীদাস প্রণীত 'কৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিখানি বীর হাম্বীর বা তাঁর পরের কোনো রাজা সংগ্রহ করে সযত্নে রক্ষা করে থাকবেন বলে দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছেন।

স্বর্গত সুধী বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে যে শোকাবহ প্রবাদ কাহিনীটি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরই আবিষ্কৃত রামী-রচিত একটি গীতি-কবিতায় চণ্ডীদাসের মৃত্যুর যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকেও সে-যুগের সমাজরূপের একটি পরিচয় মিলবে। তাছাড়া রামীর রচিত ঐ পদটি তাঁর আত্মকথারই অংশ।

বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'কৃষ্ণকীর্তনে'র ভূমিকা নিয়েই প্রথমে উক্ত প্রসঙ্গটির আলোচনা করা যাক। ঐ ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, নান্নুরে বাশুলী মন্দিরের কাছে যে ভগ্নস্তূপ পড়ে আছে, সেখানে এক নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তাঁর বিখ্যাত কীর্তন-দলসহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হয়েছিলেন। প্রকাশ, নবাব তাঁর প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তাঁর গান শোনার জন্যে। কিন্তু নবাবেরই দুর্ভাগ্য, চণ্ডীদাসের কণ্ঠে ভক্তিপ্রেমোন্মাদনাময় পদাবলী গান শুনে তাঁর বেগমসাহেবা এমনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, সেই থেকে তিনি ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন চণ্ডীদাসের গান শোনার জন্যে। এ-ব্যাপারে বেগম সাহেবা এমনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন যে, স্বয়ং নবাবও কঠোর শাসনে তাঁকে নিরস্ত করতে পারছিলেন না। কী করেই বা পারবেন? চণ্ডীদাসের গানের সুর যে সত্যি সত্যি তাঁর 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবেশ করে গিয়েছিল, সেই মর্মভেদী সঙ্গীত বেগম সাহেবার সব লজ্জা-ভয় দূর করে দিয়েছিল। কিন্তু নবাব তো আর এ-অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারেন না। রাগে তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। তাই নবাব-সৈন্যের কামানের গোলায় নান্নুরের নাট্যশালা একদিন ভূমিসাৎ হলো। চণ্ডীদাস সদলবলে তখন কীর্তনানন্দে মেতে ছিলেন সেখানে—সদলবলেই সেই বিধ্বস্ত নাট্যমন্দিরের ভগ্নস্তূপের তলায় তাঁর সমাধি-লাভ ঘটলো।

কিছু সত্যের সঙ্গে কিছুটা কল্পনা মিশিয়েই এই প্রবাদ-কাহিনীটি প্রচলিত হয়ে থাকবে। চণ্ডীদাসের মহাপ্রয়াণ সম্পর্কে রামী প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে এর তাই সামান্ত মিল থাকলেও সম্পূর্ণ মিল নেই। এবং এ-ব্যাপারে রামীর বর্ণনাই যে যথার্থ বলে ধরতে হবে সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চণ্ডীদাসের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথায় কী বলেছেন রামী? তিনি প্রথমেই লিখেছেন—

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডিদাস।
চাতকিপিয়াসীগণ না পাইআ বরিসণ
নআনের লাগয়ে পিয়াস॥
কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।
না জানিয়া প্রেম লেহ ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥

রামী এখানে পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর 'প্রাণের দোসর'কে গৌড়েশ্বরই বধ করেছেন। কিন্তু কেন, কি কারণে? তারও বিবরণ রয়েছে শোকগাথায়। শোকার্ত স্বরে রামী তাঁর প্রাণপতিকে লক্ষ্য করে যেন ঐ শোকগাথায় গাইছেন—

কেন বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ মঞ্চ (মর্ত্য) পাতালপুর
আবির্ভূত পশু নর।
মানিনীর না রহিল মান॥
গান শুনি পাচ্ছার (বাদশাহের) বেগম।
রাজারে কহে জানিঞা মরম॥
রাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিলা।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্যা॥

গীতি-কবিতাটির এই অংশ পাঠে আমরা বুঝতে পারছি যে, চণ্ডীদাস গৌড়ের বাদশাহের আহ্বানে রাজসভায় গান গাইতে গিয়েছিলেন। সেই গান শুনে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তথা সমগ্র মনুষ্যজগৎ ও পশুজগৎ মুগ্ধ। এমন কি মানিনীর মান রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়লো। বাদশাহের বেগম মনের কথা গোপন রাখতে পারলেন না; গান শুনে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তিনি যে প্রেমে

পড়ে গেছেন, সে-কথা নিজেই তিনি রাজাকে বলে ফেললেন। তার ফলে কী অবস্থা দাঁড়ালো ?

বাদশাহ রুষ্ট, ক্ষুব্ধ এবং ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলেন। চণ্ডীদাসকে তিনি হত্যার আদেশ দিলেন।

রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরাণিত হস্তি আনি
পিষ্ঠে পেলি (ফেলি) বান্ধ টানি
পিষ্ঠ খুদে বৈরী ছাড় গিয়া॥

কী নির্মম নির্দেশ ? মন্ত্রীকে ডেকে রাজা বলে দিলেন, তাড়াতাড়ি হস্তীপৃষ্ঠে তাঁকে বেঁধে নিয়ে টেনে নিতে নিতে পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে শত্রুকে বধ করতে হবে। এই আদেশ তো ঘোষিত হলো, রামীর মনের অবস্থা কী তখন ? তিনি নিজেই তাব বর্ণনা দিচ্ছেন এই বলে ঃ

আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্তি চলে অতি জোরে
ভালস্তে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত॥

এরপরে শোকগাথায় রামী চণ্ডীদাসের ওপর শত বৈরীর অকথ্য নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে 'দৈবের কর্মফাঁস না যায় খণ্ডন' বলে একটি মন্তব্যের পর লিখেছেন—

আমা মুখ চাঞা গজপিষ্ঠে স্থঞ্যা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়েশ্বর দুষ্ট কলেবর
কেহ না বুঝাল তাকে॥
নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না স্থনে রাজন
বুঝিল (বুঝিবা ? কৃষ্ণের লীলা॥
স্থন্ধ কলেবর হইল জর্জর
দারুণ সঞ্চান ঘাতে।
এ দুস্থ দেখিয়া বিদরএ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে॥

বদ্ধ অবস্থায় হাতীর পিঠে শয়ান চণ্ডীদাস রামীর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

রামী তাঁর প্রতিবিধান করবেন, সেই আশা। কিন্তু কেউ যেখানে রাজাকে সংযত-শান্ত করতে পারেনি, সেখানে সামান্য রজকবালা রামীর কতটুকুই বা আর শক্তি—রাজা তাঁর কথায় কানই বা দিতে যাবেন কেন? তাই বিশুদ্ধ-কলেবর চণ্ডীদাসকে আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত হতে দেখে রামীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি তাই এই প্রার্থনাই করছিলেন, চণ্ডীদাস তাঁকে যেন তাঁর শেষ যাত্রায় সঙ্গিনী করে নেন।

কিন্তু চণ্ডীদাসের এমন অবস্থা কেন হলো সেটাই বড়ো প্রশ্ন। আত্মচরিতমূলক এই শোকগাথাটির মধ্যে সে-প্রশ্নেরও উত্তর রয়েছে। বাঙলার প্রথম মহিলা কবি রামী সেখানে চণ্ডীদাসের কাছে অনুযোগ তুলেছেন। ভয়ঙ্কর সে অনুযোগ।

কহেন রামিনী শুন গুণমণি
জানিলাঙ তোমার রীতি।
বাসুলি বচন করিলে লংঘন
সুনহ রসিক পতি॥

এই শোকগাথায় পূর্বেও একবার চণ্ডীদাসের 'বাসুলি বচন লংঘনে'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কী সেই 'বাসুলি বচন' সেখানে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশও হয়েছে। 'ছাড়ি পরিবার মোর সঙ্গ কর' অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ছেড়ে একমাত্র রামীর সঙ্গ করারই নির্দেশ ছিল বাশুলীর চণ্ডীদাসের ওপর। কিন্তু 'সেই বচন স্মরণ না করে' তিনি বেগমের প্রেমে মজে গিয়েছিলেন। দেবীর আদেশ অমান্য করার ফলেই আজ তাঁর এই অবস্থা। কিন্তু যাঁর জন্যে তাঁর আজ এই শাস্তি, সেই বেগম সাহেবার কী অবস্থা? সে বর্ণনাও রয়েছে রামীর শোক-গীতিকায়। দুঃখ করে বেগম সাহেবা বলছেন—

সুন নৃপ চূড়ামণি।
সুন রসের স্বরূপ সে
কেন বিনাস করহ তাহার দে॥
সে সামান্য মানুষ নহে।
রতি স্থিতি তার দেহে॥
জাহার সুস্বর গানে।
বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেন কৈলে এমন কাজ।
ভূবনে রাখিলে লাজ
রাজা হে জবন জাতি।

রসের স্বরূপ চণ্ডীদাস সামান্য মানুষ নন। যার মধুর কণ্ঠের গান আমার প্রাণকে কেড়ে নিয়েছে, সেই অসামান্য মানুষটিকে বিনাশ করে হে নৃপ-চূড়ামণি যবনরাজ, সারা পৃথিবীতে তুমি লজ্জার কারণ হয়েই থাকলে,—এই বলেই বেগম সাহেবা চণ্ডীদাসকে ধ্যান করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন, আর তা শুনে মুগ্ধ ধোবিনী রামী ছুটে গিয়ে বেগমের পায়ে গিয়ে পড়লেন।

স্বনি শ্রস্তা ধবিনি ধায়
পড়িল বেগম পায়॥

চণ্ডীদাসের হত্যা-কাহিনী নিয়ে রামী রচিত শোকগাথার এখানেই শেষ। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর পরে বাশুলী দেবীর মন্দিরসহ নান্নুরের বিখ্যাত নাট্যশালাটি ধ্বংস করে থাকবেন, এরূপ অনুমান করা হয়ে থাকে।

এরপরে স্বাভাবিকভাবেই এ-প্রশ্ন তুলতে হয়, কে এই গৌড়াধিপ সুলতান যাঁর আদেশে চণ্ডীদাসের মতো মহামানবকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং যাঁর বেগম চণ্ডীদাসের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে ও তাঁর প্রেম-বিরহে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

বিদ্যাপতির আত্মকথা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে, মিথিলারাজ শিবসিংহের আমলে গৌড়বঙ্গে গণেশ নামীয় এক ব্রাহ্মণ জমিদার সুলতান সৈফুদ্দিন হামজাকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেকে গৌড়েশ্বর বলে ঘোষণা করেন। এইভাবেই বাঙলাদেশে আবার হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এক প্রভাবশালী মুসলমান ফকিরের আহ্বানে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ রাজা গণেশকে বিতাড়নের জন্যে গৌড় আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এমনি পরাক্রমের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও গৌড়বঙ্গে খুব বেশিদিন হিন্দু-রাজত্ব স্থায়ী হতে পারেনি। কয়েক বছর রাজত্বের পর রাজা গণেশ পুত্র যদুর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর কিছুকাল যেতেই নতুন রাজা যদু কোনো লোভে বা নিরাপত্তার আশায় স্বধর্ম পরিত্যাগ করে জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ্ নামে আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন। রাজার অনুসরণে স্বভাবতই তখন বহু হিন্দুই ধর্মান্তরিত হয়ে থাকবে। বিশেষত মুসলমান হয়েই রাজা যখন হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে দিয়েছিলেন, তখন ভয়ে ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকেই যে রাজার ধর্মগ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

এ থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি ধর্মান্তর গ্রহণের হিড়িকে সেই সময়ে গৌড়ীয় সমাজে একটা ওলট-পালট চলছিল। রাজা গণেশের শাসনকালেই

চণ্ডীদাস গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে খ্যাত হয়ে থাকবেন এবং সেই খ্যাতিই স্থলতান জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ্‌কে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে তাঁকে রাজপুরীতে গান শোনাবার জন্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে। নবাবের ধমনীতে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত। কাজেই তাঁর পক্ষে চণ্ডীদাসের গান শোনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক এবং তাঁর প্রথমা মহিষী হিন্দু-কন্যা বলেই হয়তো চণ্ডীদাসের গান তাঁকে অমন প্রেমোন্মাদিনী করে তুলেছিল। পরিবেশ পর্যালোচনায় এমনি করেই প্রমাণ করা চলে যে, স্থলতান জালালুদ্দীনের শাসনকালেই রাজরোষে চণ্ডীদাসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

কিন্তু বেগম সাহেবা নবাবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, চণ্ডীদাস সাধারণ মানুষ নন, তাঁকে হত্যা করে তিনি এমন কলঙ্কভাগী হতে চলেছেন, যে কলঙ্ক বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। অনেকটা অভিশাপের স্থরেই এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল যা রামী তাঁর রচিত শোকগাথায় গেঁথে রেখে গিয়েছেন।

সে অভিশাপ ফলেও ছিল। জালালুদ্দীনের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ আততায়ী হস্তে নিহত হলে ঐ বংশের শাসন সেখানেই লুপ্ত হয়ে যায়। আবার পাঠান শাসন শুরু হয় গৌড়ে। জৌনপুরের স্থলতানদের পক্ষ থেকে তারপরেও বারবার আক্রমণ চলতে থাকে এবং অপশাসন ও অত্যাচার অনাচারে বাঙলার সমাজ-জীবন পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি চূড়ান্ত বিড়ম্বনার মধ্যেই অতিবাহিত হয়।

এমন অন্ধকার যুগে চণ্ডীদাস মানুষের জয়গান গেয়েছিলেন। মানবতার সেই পরম পূজারীর উদ্দেশে রামী তাঁর একটি পদে বলেছেন—

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার
স্থহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার।

কিন্তু শুধু রামীর কাছেই নয় গোটা বাঙালী সমাজের কাছেই সেদিন চণ্ডীদাসহীন জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কবি কৃত্তিবাসের কালে বাঙালীর জীবন-যাত্রা

পঞ্চদশ শতকের আরেক বাঙালী কবি কৃত্তিবাস, যাঁর রচিত বাংলা রামায়ণ যুগ-যুগ ধরে বঙ্গীয় সমাজ-মানসে অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সুষ্ঠুভাবে লালন করে আসছে।

কৃত্তিবাসকে যদিও বাঙলার আদি কবি বলা হয়ে থাকে তবু আজও পর্যন্ত এ বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারিত করা যায় নি যে, তিনি চণ্ডীদাসের অগ্রবর্তী অথবা পরবর্তী কবি। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মতো তাঁর জন্মকাল এবং জীবনকাল নিয়েও গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পূর্ববর্তী কবি হলে চণ্ডীদাস তাঁর রচনাবলীর কোথাও না কোথাও কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ করতেন, এ অনুমান খুবই স্বাভাবিক। কোথাও তা পাওয়া যায় না বলেই অনেক গবেষকের মতে কৃত্তিবাস চণ্ডীদাসের পরবর্তী কবি। কাজেই বাঙলার আদি কবি, তাঁদের মতে, কৃত্তিবাস নন, চণ্ডীদাস।

কিন্তু পরবর্তী সব কবিকেই অগ্রবর্তী সমস্ত যশস্বী কবির নামোল্লেখ করতে হবে তাঁদের রচনায়, তেমন কথা কি জোর করে বলা যেতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। কাজেই কৃত্তিবাস ও চণ্ডীদাসের মধ্যে কে আগে এবং কে পরে অবির্ভূত, তা নির্ধারণ করা বা তার মীমাংসায় আসা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই কৃত্তিবাসের কালের সমাজচিত্র উদ্ঘাটনে তাঁরই আত্মবিবরণীর পটভূমিকায় বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে তাঁর জীবনকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির যে আত্মকথা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করেই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের দরবারেই কবি কৃত্তিবাস সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। সেই সম্বর্ধনা এবং সঙ্গে-সঙ্গে রাজসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন কৃত্তিবাস তা থেকেই দীনেশচন্দ্র ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

গৌড়েশ্বরকে কৃত্তিবাস পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে উপহার পাঠিয়েছিলেন। রাজা সেই শ্লোক-কয়টি পড়ে 'ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস'কে রাজসভায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কি রূপ দেখেছিলেন রাজসভার?

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রসহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্মাদিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥

রাজসভার এরূপ বর্ণনা পড়ে স্বভাবতই এ ধারণা হবার কথা যে, গৌড়ের রাজা তাহলে তখন হিন্দুই ছিলেন, তা না হলে সভাসদগণের মধ্যে এত হিন্দুর ছড়াছড়ি ঘটবে কি করে?

রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হবার পরে কবি কৃত্তিবাসকে যেভাবে ও যে প্রথায় সম্বর্ধিত করা হয়েছে তাও হিন্দু রীতি-নীতিরই পরিচায়ক। কবি নিজে সে সম্বর্ধনার যে বিবরণ কাব্য-কথায় লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকেই এরূপ স্বাভাবিক অনুমানে আমাদের পৌঁছুতে হয়। তিনি সে সম্পর্কে লিখেছেন—

রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আনি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়ে গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥

আত্মবর্ণনার এ অংশে দেখা যাচ্ছে সরস্বতীর প্রসাদে যে সব সংস্কৃত শ্লোক কবি কৃত্তিবাস আপনা থেকে আবৃত্তি করে চলেছিলেন রাজসভায় রাজা সেগুলি বুঝতে পারছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দিত করে তাঁর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে পট্টবস্ত্র (পাটের পাছড়া) দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। আর রাজার অন্যতম সভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া বৃষ্টি করে মাঙ্গলিক নির্দেশ করেছিলেন। এ সবই হিন্দুদের শুভ আচার-অনুষ্ঠানের পরিচায়ক। তা ছাড়া যেভাবে স্বর্ণদণ্ডধারী দ্বারীর সঙ্গে 'নয় দেউড়ী' পেরিয়ে গিয়ে কবি সিংহাসন পরে রাজাকে সিংহসম উপবিষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি যে সাধারণ রাজা হতে পারেন না তা সহজেই অনুমেয়। কবি সেকথা নিজেই বলে দিয়েছেন, 'পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা' অর্থাৎ সারস্বত, কাণ্যকুব্জ, মিথিলা, উৎকল ও গৌড়—পঞ্চগৌড় নামে বর্ণিত এই পঞ্চ রাজ্যের রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্রাট সদৃশ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই পঞ্চ গৌড়েশ্বর নানা গুণে এমনই গুণান্বিত ছিলেন যে, তাঁর পূজা করলে গুণেরই পূজা করা হয় বলে তিনি মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে এও লক্ষ্য করার বিষয় যে, আত্মকথার বর্ণনায় কৃত্তিবাস কোথাও তাঁর সময়ের গৌড়াধিপকে স্লুলতান বা বাদশাহ (পাদশা কি পার্চা) বলে উল্লেখ করেন নি, সকল ক্ষেত্রেই তাঁকে রাজা বা মহারাজা বলেছেন। এসব যুক্তিতেই গৌড়ের শক্তিমান অধীশ্বর রাজা গণেশের রাজসভাতেই কবি কৃত্তিবাস অভিনন্দিত হয়েছিলেন বলে আচায দীনেশচন্দ্র সেন যে অনুমান করেছেন তা সমর্থনীয় বলে মনে হয়। রাজ-আমাত্য কেদার খাঁর 'খাঁ' উপাধিটি একটি মুসলমানী উপাধি বটে, তবে সেটি গৌড়ের পূর্ববর্তী কোনো স্লুলতানের দেওয়া বংশগত বা তাঁকে ব্যক্তিগত-ভাবে অর্পিত উপাধিও হতে পারে।

দীনেশচন্দ্র বলেছেন, মুসলমান বিজয়ের পরে একমাত্র (হিন্দু) রাজা গণেশ (ই) সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন কাল কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ ধরিয়া লইলে কবি এই কালের মধ্যে কোন সময়ে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি কোনো তারিখে কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন এবং ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গণেশ রাজত্ব করেন ধরে নিলে তিনি ১৮ বা ১৯ বছর বয়েসে রাজসভায় ঐরূপ সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন মেনে নিতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলেই মনে হয় এবং ঐ বয়েসের কবিকে রামায়ণ রচনার ভার দেওয়াটাও কোনো রাজার পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে গ্রহণ করা যায় না। রাজা গণেশ ১৩৯৮

পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন, একথা ইতিহাস স্বীকার করে না—গণেশ গে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে এবং কঠোর হস্তে কয়েক বছর রাজ্য শাসনের পর পুত্র যদুর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি অবসর নিয়েছিলেন। যদু রাজা হবার কিছু পরেই ইসলামের আশ্রয় নিয়ে জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। সুলতান জালালুদ্দীনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে আততায়ী কর্তৃক নিহত হওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের বংশই গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। এই সময়ই কবি কৃত্তিবাসের খ্যাতির কাল, ঐতিহাসিক পরিবেশ বিচারে ও তাঁর আত্মকথার পটভূমিকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। যদু রাজা হবার পরে এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগেও গৌড়-রাজসভায় কবি কৃত্তিবাস সম্বর্ধিত হয়ে থাকতে পারেন। তখনো যদু রাজা জালালুদ্দীন হননি বলেই কবির চোখে রাজসভায় অতখানি হিন্দুয়ানি ধরা পড়েছে এবং তাঁর সম্বর্ধনাতেও অতটা হিন্দু আচার-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। হিন্দু রাজা বলেই যদু রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কবিকে বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনার আদেশ দিয়ে থাকবেন, এ অনুমানও খুব অসম্ভব নয় যদিও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নানা প্রমাণাদির উল্লেখে জোরের সঙ্গেই বলেছেন, 'কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহ নহেন।'

সাহিত্য-গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে?' শীর্ষক এক প্রবন্ধে একই সঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের এবং উক্ত প্রশ্ন মীমাংসায় আধুনিকতম প্রয়াস অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মত খণ্ডন করেছেন। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে ডঃ শহীদুল্লাহ লিখেছেন—

'কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৬৮, ৩১শে ডিসেম্বর) পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আমি বলিয়াছিলাম—"কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক গৌড়েশ্বর। তাঁর প্রশংসায় কবি বলেছেন—

পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা করিলে গুণের হয় পূজা॥

'এই গৌড়েশ্বর 'খুব সম্ভবতঃ রাজা গণেশ নন, কিন্তু তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। রাজা গণেশের রাজত্বকাল অল্প এবং আশান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে কোথাও দেখি না। অন্য পক্ষে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯—৩১ খৃষ্টাব্দ)। তিনি ভরত মল্লিককে নানা উপহারসহ

'বৃহস্পতি' ও 'রাজমুকুট' এই দুই উপাধি দিয়েছিলেন। স্বধর্মত্যাগী বলে বোধহয় কৃত্তিবাস এই গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। রাজা গণেশ যে কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না, তাহার অন্য কারণ গণেশের রাজত্বের শেষ বছরে কৃত্তিবাসের বয়স ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। আত্মজীবনী অনুসারে ১১ বৎসর পূর্ণ করিয়া কৃত্তিবাস গুরুগৃহে গমন করেন। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল ধরিলে ইহার তারিখ হইবে ১৪১১ খৃষ্টাব্দ। পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, আত্মজীবনী হইতে এইরূপ বুঝা যায়। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর হইবে। পাঠ সমাপন করিতে গুরুগৃহে তাঁহার ১২ বৎসর কাটিয়াছিল মনে করা অসঙ্গত হইবে না।'

রাজা গণেশ কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর নন, জালালুদ্দীন সেই গৌড়েশ্বর। পূর্বোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করে ডঃ শহীদুল্লাহ তা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তারপরে তিনি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস পরিচয়' গ্রন্থের সমালোচনা করে লিখেছেন, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসকে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯—১৪৭৪ খৃঃ) অনুগৃহীত মনে করিয়াছেন। তিনি আত্মজীবনীতে উল্লিখিত কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায় রাজসভাসদ-গণের সময় বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।' ডঃ শহীদুল্লাহও ঐ তিনজন সভাসদকে নিয়ে 'নিজের বিবেচনা অনুযায়ী সময় বিচার' করে দেখিয়েছেন যে, ৭১ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসের এই রাজসভায় (রুকনুদ্দীন বারবক শাহের) গমন অস্বাভাবিক এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায় গৌড়েশ্বর জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহেরই সভাসদ ছিলেন এবং কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর তিনিই।'

কৃত্তিবাস তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আত্মজীবনীতে অনেক কথা বলেছেন এবং সেকালের বঙ্গসমাজের অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু পরিচয় সেখানে লিপিবদ্ধ আছে। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় থেকেই আমরা জানতে পাই যে, তখনো এগার বছর পূর্ণ হলে বালকদের গুরুগৃহে গমনের রেওয়াজ ছিল এবং বার বছর সেখানে থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করতে হতো। সেকালে শ্রেষ্ঠ কবিরা রাজ-সম্মান লাভ করতেন, কৃত্তিবাস নিজেই আপন অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তা জানিয়েছেন।

কিন্তু নিজের জন্ম সম্বন্ধে কী লিখেছেন কৃত্তিবাস? লিখেছেন—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তিথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥

কৃত্তিবাস বর্ণিত এই বিবরণের 'পূর্ণ মাঘ মাস' কথাটিকে মাঘ সংক্রান্তি ধরে নিয়ে এবং তার সঙ্গে রবিবার ও শ্রীপঞ্চমী জুড়ে নিয়ে রায়বাহাদুর যোগেশ-চন্দ্র কবি কৃত্তিবাসের জন্মদিন' ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মাঘ' নির্ধারণ করেছেন। দীনেশচন্দ্র এই সিদ্ধান্তকে এই বলে বাতিল করেছেন যে, 'পূর্ণ মাঘ মাস' কথার একটা পরিষ্কার অর্থ হয় না, উহা পুণ্য মাঘ মাস হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতঃপর পূর্বপুরুষদের বংশ তালিকা বিশ্লেষণ করে দীনেশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পূর্বপুরুষেদের সম্পর্কে কৃত্তিবাস আত্মজীবনীতে কী লিখেছেন এবার তাই দেখা যাক। কবি তাঁর আত্মকথার আরম্ভেই লিখেছেন—

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পুত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥

কৃত্তিবাসের কাল নিরূপণে তাঁর আত্মজীবনীর ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য মনে হলেও সেই আসল আত্মজীবনীতে পরবর্তীকালে পাঠবিকৃতি ঘটেছে। তাই দেখা যায় ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃতির মধ্যে মিল নেই। ডঃ ভট্টশালী যে পুঁথি অবলম্বনে কৃত্তিবাস কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে প্রথম অমিলই চোখে পড়ে কবির আত্মজীবনীর দ্বিতীয়ছত্রে। তাঁর উদ্ধৃতিতে রয়েছে—

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পুত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥

কবি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর শুরুতেই পাঠ-বিভ্রান্তি আবিষ্কার করেছেন গবেষকবর্গ। বঙ্গদেশের কোন অংশে 'বেদানুজ মহারাজা' বলে কোন রাজা কখনো রাজত্ব করেননি। কাজেই আচার্য দীনেশ চন্দ্র ও ডঃ শহীদতুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, 'বেদানুজ মহারাজা' নয় 'দনুজ মহারাজা'ই

হলো যথার্থ পাঠ। ডঃ শহীদুল্লাহ কৃত্তিবাসের বংশতালিকা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন দনুজ রাজের মধ্যে ইতিহাসে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে দনুজ রায়ের দেখা পাওয়া যায় তিনিই কৃত্তিবাসের দনুজ মহারাজা। এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

'কৃত্তিবাসের বংশতালিকা এইরূপ—আয়িত-উদ্ধব-শিব-নারসিংহ-গর্ভেশ্বর মুরারী-বনমালী-কৃত্তিবাস।

'আয়িতের জন্ম আনুমানিক ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কৌলীন্যপদ প্রাপ্ত হন। এই বংশতালিকায় হয়তো দু-একটি নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও নরসিংহকে কিছুতেই পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদের দনুজমর্দন দেবের (রাজা গণেশের) সমসাময়িক করিতে পারা যায় না। তাঁহার পৃষ্টপোষক অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের শেষপাদের ব্রাহ্মণ বংশীয় দনুজ রায়। তিনি পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

"দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার
বঙ্গ ভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥"

'১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সুলতান শামসুদ্দীন ফীরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১—১৩২২ খ্রী:) পূর্ববঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

'এই সময় বঙ্গদেশ অর্থে পূর্ববঙ্গ বুঝাইত। নারসিংহ ওঝা সম্ভবতঃ ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ফুলিয়ায় বিবাহ করেন। তাঁহার ফলে তাহার পুত্র গর্ভেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইহা আমরা আনুমানিক ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ৩১ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে মুরারির জন্ম ১৩৩৬, বনমালীর জন্ম ১৩৬৭ এবং কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করিতে পারি যদি ২৫ বৎসর এক পুরুষ ধরা হয় তবে কৃত্তিবাসের জন্ম বৎসর হইবে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ।' আর যদি একে পঁচিশ বছরের বেশী ধরতে হয় তাহলে সেই অনুপাতে কৃত্তিবাসের জন্মকালও পিছিয়ে যাবে।

এই বিষয়ে আর্চার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে লিখেছেন, 'নৃসিংহ (নারসিংহ) ওঝা বঙ্গদেশব্যাপী যে ঘোর প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা সোনারগাঁয়ে হিন্দু-রাজত্বের ধ্বংস ও মুসলমান প্রভাবের অভ্যুদয়

সূচিত করিতেছে। সামসুদ্দিন ফিরোজ সা হিন্দু স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ১৩০২ হইতে ১৩২২ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। এই সময় তুর্কী গাজি জাফর খাঁ—যিনি প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের ঘোর বিরোধী থাকিয়া শেষে আমাদের ধর্মের প্রতি এতদূর অনুকূল হইয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন—তিনি ২৪পরগণা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন—সুতরাং এই অঞ্চলের ফুলিয়া গ্রামে নৃসিংহ ওঝা বাস করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ ওঝা সম্ভবতঃ ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন।'

এর পর দীনেশচন্দ্র কৃত্তিবাসের পূর্ব-পুরুষদের বংশপঞ্জী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কৃত্তিবাস উৎসাহ হইতে অধস্তন নবম পুরুষ, বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে উৎসাহ বল্লালের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎসাহের জন্মকাল ধরিলে তিন পুরুষের ১০০ বৎসর পরিকল্পনাপূর্ব্বক আমরা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃত্তিবাসের জন্মকাল পাইতেছি।'

এ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে আচার্য দীনেশচন্দ্র এবং ডঃ শহীদুল্লাহ উভয়েই অনেকটা একমত—চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন, উভয় পণ্ডিতই ইতিহাস ও বংশপঞ্জী বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। নির্দিষ্ট কোন বছরে কবি কৃত্তিবাস আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে অবশ্য দীনেশচন্দ্রের কোনো স্থির মন্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ডঃ শহীদুল্লাহ কিন্তু এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সূত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য একটা সিদ্ধান্তেও তিনি এসেছেন, সমস্ত দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে যে সিদ্ধান্তকে গ্রহণীয় বলেই মনে হবে।

অন্যান্য নানা যুক্তি বিচারের পর শেষ পর্যন্ত ডঃ শহীদুল্লাহ পরলোকগত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনাকে মেনে নিয়ে লিখেছেন, 'আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণিত ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ বলিয়া স্থির করিতে পারি।' বিদ্যানিধি মহাশয় অবশ্য কৃত্তিবাসের জন্মকাল নিরুপণ করতে বসে চারটি সম্ভাবিত তারিখ উল্লেখ করেছেন—৭ই জানুয়ারী, ১৩৭৫; ২৩শে জানুয়ারী, ১৩৭৯; ৩রা জানুয়ারী, ১৩৮৯ এবং ১৩ই জানুয়ারী, ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। অনেক গবেষকের মতে এই শেষ তারিখটিই কৃত্তিবাসের সম্ভাব্য জন্মকাল এবং ডঃ শহীদুল্লাহও এই মতকে মেনে নিয়ে এরূপ অনুমান প্রকাশ করেছেন যে কৃত্তিবাস ৭০ বছর বয়েস অবধি বেঁচে ছিলেন। সে হিসাবে তিনি ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পরলোকগমন করেন। তার কয়েক বৎসর পরেই

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে বাঙলার মাটিতে। তাহলেই আমরা একরূপ অব্যবহিত প্রাক-চৈতন্য যুগের বঙ্গীয় সমাজেরই একটি চিত্র পাই কৃত্তিবাসের আত্মকথা থেকে যা তিনি তাঁর প্রণীত রামায়ণে সযত্নে যুক্ত করে রেখে গেছেন। সেই আত্মকথা থেকে আমরা আগেই জানতে পেরেছি যে কৃত্তিবাস তাঁর পূর্বপুরুষ নারসিংহ (বা নরসিংহ) ওঝা থেকে আত্মজীবনী রচনা শুরু করেছেন।

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহের সময়ে বঙ্গদেশ বলতে পূর্ববঙ্গকেই বুঝাতো। চতুর্দশ শতাব্দীর আরম্ভে পূর্ববঙ্গে মুসলমান শাসন বিস্তৃত হলে সেই দেশের উপান্ত যেখানে ব্রাহ্মণেরা সুখে ঘর-সংসার করছিলেন তা ছেড়ে নারসিংহ ওঝা চলে এলেন রাণঘাট স্টেশন থেকে সাত মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে, যার সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখেছেন—

মালী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এখানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন-ধান্যে পুত্রে-পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥

এর পরেই কৃত্তিবাস পুরুষ পরম্পরায় নারসিংহবংশীয়দের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন তাঁর আত্মকথায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের কীর্তিকলাপেরও যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়েছেন। নারসিংহের পুত্র লাভ থেকে কৃত্তিবাস লিখছেন—

গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নামে যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্মচর্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥

এইভাবে কৃত্তিবাস দেখিয়ে চলেছেন যে,

'কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥

তার পরেই তিনি নিজের বাপ-মা ও ভাই-বোন প্রভৃতির কথায় চলে এসেছেন। সেখানে বলছেন—

মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সত্যই উদার॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥

এত বলার পরেও কৃত্তিবাস নিজের কথা বলতে নারাজ। কারণ মুখটি বংশের আরো অনেক কথাই যে তাঁর বলার রয়েছে। তাই এর পরেই তিনি লিখেছেন—

আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরও কৈতে আছে॥

এখানেই আমরা জানতে পারি যে, কৃত্তিবাস ছিলেন মুখটি বংশের সন্তান এবং ওঝা ছিল তাঁদের বংশগত উপাধি মাত্র। মুখটি বংশের কীর্তির জন্যে গর্বের অবধি ছিল না কৃত্তিবাসের। তাই দেখা যায় আত্মকথা লিখতে গিয়ে তিনি বংশ-গৌরব বর্ণনায় একেবারে মুখর হয়ে উঠেছেন। মুরারি ওঝার পুত্র-পৌত্রাদির পরিচয় দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, মুরারি-ভ্রাতা সূর্য এবং গোবিন্দ-তনয়াদির কীর্তির বিবরণও তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কৃত্তিবাস লিখেছেন—

সূর্য পুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাষা জোড়া॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র, ওঝা তাঁহার কোঙর॥

সূর্য ও গোবিন্দ ওঝার পুত্রদের এই পরিচয় থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা

যাচ্ছে যে মুখটি বংশীয়েরা ফুলিয়ায় আসার তিন পুরুষের মধ্যে এমন প্রতিপত্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন যে, হাজার লোক নিশাপতি ওঝার দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত থাকত, স্বয়ং গৌড়েশ্বর তাঁকে প্রসাদী ঘোড়া (যজ্ঞের ঘোড়া ? এই গৌড়েশ্বরই কি তবে রাজা গণেশ ?) পর্যন্ত উপহার দিয়েছিলেন।

সূর্যপুত্র নিশাপতি শুধু নয়, মুরারিতনয় ভৈরবও রাজার সভায় অধিক গৌরব লাভ করেছিলেন বলে কৃত্তিবাস পূর্বেই উল্লেখ করেছেন। ভৈরবও নারসিংহ (বা নরসিংহ কি নৃসিংহ) ওঝার তৃতীয় পুরুষ। এই ভৈরবের ছেলের যশও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখেছেন—

ভৈরব-সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে যাহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥

এমনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় মুখটি বংশের যশোগান করার পর কৃত্তিবাস নিজের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন যে বিষয় নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তার পরেই তিনি তাঁর শিক্ষা-জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন—

এগার নিবড়ে (শেষে) যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥

শিক্ষা সাঙ্গ করার পর নানা জায়গা থেকে বিদ্যা-বিতর্কে যোগদানের জন্যে কৃত্তিবাসের কাছে আমন্ত্রণ আসতে থাকলে তিনি সে সব বিতর্কে যোগ দিয়ে বুঝতে পারেন যে,

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥

বড়গঙ্গাতীরবর্তী যশোহরে শিক্ষা সমাপন করে ফুলিয়ায় স্বগৃহে ফেরবার জন্যে কৃত্তিবাস আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু সমাজবিধি অনুসারে গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে

তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তো বাড়ি যেতে হবে। আর এতো যে সে গুরু নন, ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকি-চ্যবনের মতো গুরু এবং স্বয়ং ব্রহ্মার মতো তেজস্বী তিনি। কাজেই তাঁর সন্তোষবিধান করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। সে সম্বন্ধে কবি লিখেছেন--

বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উন্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুর স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিল মোরে অশেষ বিশেষে ॥

এভাবেই গুরু-দক্ষিণা অর্পণ করে এবং গুরুর অশেষ বিশেষ প্রশংসা-আশীর্বাদ নিয়ে কৃত্তিবাস গুরুগৃহ থেকে ঘরে ফিরেছিলেন। এবং তার পরেই—

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥

এর পরে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ এবং গৌড়ের রাজসভায় তাঁর সম্বর্ধনার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে কৃত্তিবাসের আত্মকথায়। কবির জন্ম ও জীবনকাল নির্ধারণের ব্যাপারে এ বিষয় নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী পর্যালোচনায় তৎকালীন সমাজরূপের কয়েকটি দিক বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। তখন সারা বাঙলা দেশ জুড়েই মুসলমান শাসন কায়েম হয়ে উঠেছিল। নিরাপত্তার আশায় অনেক পরিবার বাস্তুত্যাগী হয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। সেকালে দ্বাদশ বর্ষে পুত্র সন্তানকে গুরুগৃহে পাঠাতে হতো। সেটা ছিল বৃহৎ সংসারের যুগ এবং তখন পাঁজি-পুঁথির প্রভাবও ছিল যেমন যথেষ্ট, ধর্মচর্চা ও শাস্ত্রালোচনায়ও লোকের ছিল গভীর আগ্রহ। কুল-গৌরব ও বংশ-গৌরব রক্ষায় সেকালের মানুষ যত্নবান ছিলেন, পতিব্রতা নারীর যশ ঘরে-ঘরে কীর্তিত হতো। ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা রাজপণ্ডিত হওয়া মহাগৌরবের বলে মনে করতেন। কৃত্তিবাসও সে সম্মান লাভ করেছিলেন, কিন্তু রাজার কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণে তিনি রাজী হন নি। তাই রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি যখন নানা শ্লোকে রাজাকে মুগ্ধ করে রাজার কাছ থেকে পুষ্পমালা লাভ করলেন এবং যখন—

পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥

কৃত্তিবাস তখন পরিষ্কার বলে দিলেন—

কারে কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

বর্তমান যুগে এ ধরনের নির্লোভ লোকের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়, তবে সেকালের সমাজে তেমন লোক যে অনেক ছিলেন কৃত্তিবাস স্বয়ং তার প্রমাণ। বৈষয়িক লোভের চেয়ে তখন নাম-যশ ও কীর্তির আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রবলতর। তাই উপহার-পুরস্কার তাঁর কাম্য নয়, কৃত্তিবাস 'গৌরব মাত্র সার' মনে করেন জেনে—

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥

এত বড়ো কাজের দায়িত্ব স্বয়ং রাজা যার ওপর অর্পণ করেন, তিনি কি সামান্য লোক হতে পারেন—তিনি অসামান্য। তাঁকে দেখবার জন্যে লোকে ছুটোছুটি করবে না তো কি? 'মুনিদের মধ্যে যেমন বাল্মীকি মহামুনি, তেমনি 'পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী।' সেই মহাগুণী যখন—

প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥

তার পরেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনা আরম্ভ হয়ে যায় যাতে লোকশিক্ষার জন্যে কবি নানা কথা-কাহিনীকে স্থান দিয়ে সমকালীন বঙ্গীয় সমাজকেও নানাভাবে প্রতিফলিত করেন। এই বিষয়ে আত্মজীবনীর উপসংহারে কৃত্তিবাস লিখেছেন—

বাপ-মায়ের আশীর্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে।

এই আত্মজীবনীর স্থানে স্থানে কবির আত্মগৌরব ঘোষণা সময় সময় কিঞ্চিৎ

পীড়াদায়ক বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু তাঁর সমস্ত গৌরবের কৃতিত্বই সরস্বতীর চরণে সমর্পণ করেছেন। সরস্বতীর বরেই তাঁর পক্ষে রামায়ণী গীত রচনা সম্ভব হয়েছে অকুণ্ঠভাবেই আত্মকথার শেষ পদে কৃত্তিবাস তা ঘোষণা করেছেন। এখানে সে-কালের জ্ঞানী মানুষদের ঈশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ তথা আত্মসমর্পণের মনোভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত।

ভারতের নানা প্রান্তে নানা ভাষায় যুগ-পরম্পরায় রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হয়ে আসছে আদিকবি বাল্মীকির মূল রামায়ণ-কথাকে অবলম্বন করে। মূল রাম-সীতার কাহিনী সর্বত্র প্রায় একই রূপ থাকলেও স্থান-কাল ভেদে এবং কবিকল্পনা অনুসারে তার মধ্যেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং এক এক ভাষার রামায়ণে নতুন নতুন ও পৃথক পৃথক সব কাহিনীকে মূলের সঙ্গে দিব্যি মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃত্তিবাসের লেখনী অদ্ভুত চমৎকারিত্বে রত্নাকর দস্যুকে রূপান্তরিত করেছেন বাল্মীকিতে। লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবনের জন্যে বীর হনুমানের বিশল্যকরণী আনতে গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসার কথাও মূল রামায়ণে নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেই বিচিত্র কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং কবি নিজেই সে সম্বন্ধে লিখেছেন—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার॥

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কৃত্তিবাস 'অদ্ভুত রামায়ণ' থেকে বিশল্যকরণী আনয়নের কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন। ঠিক তেমনিভাবেই তিনি লব-কুশের হাতে নিহত রামচন্দ্রের তিন ভ্রাতার বাল্মীকির দয়ায় পুনর্জীবন লাভের কাহিনীটি নিয়েছেন 'জৈমিনী রামায়ণ' থেকে এবং সে বিষয়ে বলেছেন—

এসব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই গীত তাহা বাল্মীকির মতে॥

করুণা ও সহানুভূতিই যদি কাব্যের মূল কথা হয়ে থাকে তাহলে কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ-শরে নিহত হতে দেখে বেদনায় অভিভূত বাল্মীকির মুখ থেকে হত্যাকারী ব্যাধের উদ্দেশ্যে শ্লোকাকারে যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হয়েছিল সে কাব্যের তুলনা সহজ-লভ্য হতে পারে না। একমাত্র তাঁর পক্ষেই দেশের সমকালীন সমগ্র সমাজকে এবং তার পারিপার্শ্বিক দেবদেবী রক্ষ, যক্ষ, বানর, পশুপক্ষী ও অরণ্য-পর্বত, নদী-সমুদ্র প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে

অমন করুণা-মমতা মিশ্রিত রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব। সেই পরম জ্ঞান, গুণ ও শক্তি আমরা নিশ্চয়ই কৃত্তিবাসের কাছে আশা করতে পারি না। তাহলেও তাঁর রচিত ও সম্পাদিত রামায়ণের নানা গল্পে ও পরিবেশ-পরিচয়ে বাঙলার তৎকালীন সমাজ তথা গ্রাম ও গৃহস্থ-জীবন এবং অধ্যাত্মবোধ বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়ে আছে বলেই সাধারণ বাঙালীর কাছে যুগ যুগ ধরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের এত সমাদর, তার প্রতি এত শ্রদ্ধা। গৌড়েশ্বরের দান গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে যিনি শুধুমাত্র আপন রচনার প্রশংসা শোনবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি যে কাব্যরচনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে কোনোপ্রকার ত্রুটি রাখবেন না তা জানা কথাই। এমন মানুষের ওপর রামায়ণ রচনার ভার দিয়ে গৌড়েশ্বর যে একটি মহৎ কাজ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্ব-সম্পাদিত রামায়ণের ভূমিকায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনও সে কথাই বলেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন—

'কৃত্তিবাস মুখটি বংশের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ বা গৌড়েশ্বরের প্রসাদ-চিহ্ন ঘোটক এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি লাভ করিয়া রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন; কেহ বা মার্কণ্ড ও ব্যাসের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও ঋষিতুল্য চরিত্রবান ছিলেন। কেহবা সহস্র সংখ্যক অনুচর পরিবৃত হইয়া অমাত্যবন্ধুদের সঙ্গে সৌভাগ্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে আসীন ছিলেন। যে সকল ব্যক্তির প্রসঙ্গ কবি অপূর্ব স্ফূর্তি সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ স্বয়ং পড়িয়া দেখিবেন। কিন্তু আমরা বলিব, কৃত্তিবাসই এই মুখটি বংশের মুকুটমণি ছিলেন; তিনি যাঁহাদের গৌরব কীর্তন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার উল্লেখের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; তাঁহারা তাঁহার অমৃতস্পর্শে অমর হইয়াছেন, নতুবা এই পাঁচশত বৎসর পরে কে তাঁহাদিগকে চিনিত? এমন কি যে গৌড়েশ্বরের পঞ্চগৌড় ব্যাপক অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া কবি রাজকীয় অনুগ্রহে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন কৃত্তিবাস তাঁহার সভায় পদধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা এত আগ্রহের সহিত সেই রাজা কে ছিলেন, তাহা জানিতে চাহিতেছি; এবং তিনি যখন কবিকে দান দিতে চাহিলেন, কবি সগর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই সময় পঞ্চগৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকটি হইতে কবির মস্তকশোভী বাণী-প্রদত্ত নির্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। ধন্য কেদার খাঁ—যিনি কবির শিরে চন্দনের ছড়া ঢালিয়া বাণীর বরপুত্রকে অভিনন্দিত

করিয়া সত্যই হস্ত পবিত্র করিয়াছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ধন্য, যিনি কবিকে রামায়ণ অনুবাদের ভার দিয়া বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ হিতসাধন করিয়াছিলেন।

যাই হোক, মূল কৃত্তিবাসী অনুবাদ-রামায়ণের সঙ্গে পরবর্তীকালের অনেক কৃত্তিবাসী রামায়ণের অমিল দেখা যায়। কোনোটিতে বৈষ্ণবী প্রভাবের আধিক্য আবার কোথাও শাক্ত প্রভাবের। কিন্তু পূর্ববঙ্গে প্রচারিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে সাধারণত বীরবাহু, তরনী সেন প্রভৃতির যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব এবং শ্রীরাম কর্তৃক চণ্ডীপূজা প্রভৃতি মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয়গুলি দেখা যায় না। কৃত্তিবাসের যুগ বৈষ্ণব ও শাক্তদের প্রতিযোগিতার যুগ। সেই পটভূমিকা বিশ্লেষণ করেই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলতে চেয়েছেন যে, 'শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তবগান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।'

দীনেশচন্দ্রের পূর্বোক্ত অনুমান খুবই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ভাববন্যার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই পরিবেশেই কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। সেটা অদ্বৈত আচার্যের কাল। কাজেই কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাক্ষসবীর বীরবাহুকে 'ধরনী লুটায়ে রহে যুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥' বলে যদি বৈষ্ণব পন্থায় করুণাভিক্ষা করতে দেখা যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকতে পারে না। তাই দীনেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণে শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ প্রায় গৌর-নিতাই হয়ে উঠেছেন, তরনী সেন অঙ্গে রাম নাম লিখে একরূপ পরম বৈষ্ণব সেজেই যুদ্ধে চলেছেন এবং অনুরূপ নানা দৃষ্টান্ত থেকে একথাই বলতে হয় যে, বঙ্গীয় রামায়ণ ক্ষাত্র বা রাক্ষসী বীর্যবত্তার চেয়ে বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও করুণাকেই পরিবেশ-প্রভাব ও যুগপ্রভাবে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। এর অনেকটাই হয়তো পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত। তা হলেও এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন যে, 'তথাপি বোধহয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি উল্লঙ্ঘন করে নাই। বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্যকরী হইয়াছিল; এই বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে শাসিত।......যদি পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠ্য ঠিক হইয়া থাকে তবে একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,—তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা।' তবে

এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের সবচেয়ে যে বড়ো কথা তা হলো, 'বাঙ্গালীর নিজভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে।'

কৃত্তিবাসের তিরোধান-কালের বিষয়েও সঠিক কিছু জানা যায় না। ডঃ শহীদুল্লাহ্ যদিও কৃত্তিবাসের জীবন-কাল অনুমানে সত্তর বছর ধরে নিয়েছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্রের যুক্তিতে সেই অনুমান খণ্ডিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

'...১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) লিখিত, ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে দেখিতে পাই ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) গঙ্গানন্দী, সদানন্দী এবং মালাধারী মেল প্রবর্তিত হইয়াছিল। গঙ্গানন্দ ও সদানন্দ কৃত্তিবাসের জ্ঞাতি-ভ্রাতা, কিন্তু মালাধর তাঁহার আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র। যদি কৃত্তিবাস বা তাঁহার ভ্রাতৃগণের কেহ জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া মালাধরের নামে মেল প্রবর্তিত হইত না, মালাধর ইহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন এবং ধ্রুবানন্দ ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান সাম্য শান্তিজনপ্রিয়ঃ। এতাদৃশ ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে মেল গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প—সেকালে কোন পরিবারের সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত প্রায়ই এরূপভাবে উল্লিখিত হইতেন না। সুতরাং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস কিম্বা তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের কেহ জীবিত ছিলেন না। বিশেষতঃ ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, তাঁহার বহু পূর্বে অদ্বৈত ও শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতের জন্মকাল ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে এবং নরহরি সম্ভবতঃ ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের সময় কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে তাহার উল্লেখ অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যে থাকিত। জয়ানন্দ, অগ্রবর্তী কবি স্বরূপ অপরাপর কবির সঙ্গে কৃত্তিবাসের বন্দনা করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছিলেন কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় কোন বিবরণেও ফুলিয়ার কবির কোন নাম নাই সুতরাং এদিক হইতেও মনে হয় কৃত্তিবাস বহু পূর্বে ধরাধাম হইতেও অপসৃত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের একখানি প্রাচীন অরণ্যকাণ্ডের পুঁথির ভনিতায় লিখিত আছে, তিনি অরণ্যকাণ্ড লিখার সময়ই রোগজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণে মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।'

সে যাই হোক, কৃত্তিবাস ঠিক কোন বছরে জন্মেছিলেন এবং কোন বছরে পরলোকগমন করেছিলেন আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে সেটা খুব বড়ো কথা নয়। কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী এবং তাঁর রচিত রামায়ণ তাঁর কালের বঙ্গসমাজকে জানবার পক্ষে যে শ্রেষ্ঠ দলিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেই প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্যেই এই দীর্ঘ আলোচনা।

শ্রীচৈতন্যের যুগে পাঠান শাসিত ভারত

হিন্দু রাজাদের আত্মকলহের ও দুর্বলতার সুযোগে উত্তর পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে মুসলমান শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে ভারতের মাটিতে। খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুদেশে আরব আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল বটে কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগে গজনীর রাজা সুবক্তগিনের ভারত আক্রমণ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসক জয়পালের পরাজয় বরণের আগে পর্যন্ত মুসলমান শক্তি ভারতীয় জনসাধারণ ও নৃপতিবর্গের কাছে কোনোরূপ বিপদের কারণ বলে বিবেচিত হয়নি। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাবুল ও পার্শ্ববর্তী আরো কিছু অঞ্চল অর্পণ করে সুবক্তগিনকে শান্ত রাখা সম্ভব হলেও কয়েক বছর পরেই জয়পাল ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ বুঝতে পারলেন মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় ভারতের পক্ষে কতদূর বিপজ্জনক হতে পারে।

সুবক্তগিনের মৃত্যুর পর পুত্র মামুদ ৯৯৭ খৃস্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করে 'আমীরে'র পরিবর্তে 'সুলতান' উপাধিটি গ্রহণ করলেন এবং শক্তিমত্ততার অধীরতায় একের পর এক সতেরোবার অভিযান চালালেন ভারতের বিরুদ্ধে। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে ধনরত্নাদি লুণ্ঠন, হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা ও পৌত্তলিকদের হত্যা করাই ছিল তাঁর ভারত অভিযানের মূল লক্ষ্য—স্বীয় রাজ্যের বিস্তার সাধন নয়। বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে তিনি গজনীকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেছিলেন। একমাত্র সোমনাথের মন্দির থেকেই সুলতান মামুদ দু'কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও অপরিমেয় মণিমুক্তা আহরণ করেছিলেন বহু সহস্র বাধাদানকারী হিন্দুর প্রাণহনন করে। তারও আগে ঠিক একইভাবে তিনি ঐতিহাসিক মথুরানগরীর লুণ্ঠনপর্ব শেষে ছোটবড়ো দশ হাজার মন্দির ধ্বংস করে নগরীর কেন্দ্রস্থলবর্তী হিন্দুস্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৃহত্তম মন্দিরটিকে তাঁর আদেশে ভস্মীভূত হতে দেখে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়েছিলেন। তাঁর এইসব কাজের জন্যেই তিনি নিজেকে 'গাজী' (বিজয়ী) এবং 'বাত শিকান' (মন্দির ধ্বংসকারী) উপাধি-ভূষিত করে অশেষ আত্মতৃপ্ত হয়েছিলেন।

এভাবেই ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল এবং মুসলমান শাসকদের মধ্যে অনেকেই পৌত্তলিক নিগ্রহে এবং মন্দির বিধ্বংস ও বিগ্রহ অপবিত্রকরণে সুলতান মামুদের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঠান যুগে মহম্মদ তুঘলক ও তাঁরই পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

. সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র আত্মকাহিনী থেকে পাঠান শাসনকালের ভারতীয় সমাজজীবন সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারি। তা ছাড়াও জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাস কবির আত্মচরিত কথা থেকেও আমরা পাঠান যুগের সমাজচিত্রের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত হয়েছি।* তবে সে-সবই প্রাক্-চৈতন্য পাঠানযুগের সমাজ পরিচয়। এবার ঠিক চৈতন্য-যুগই হবে আমাদের আলোচ্য এবং শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত বাণীর আলোকেই আমরা তখনকার সমাজ পরিবেশ ব্যাখ্যার চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত 'চৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ দু'খানি আমাদের প্রধান অবলম্বন এবং চৈতন্য-দেবের সমসাময়িক ও পরবর্তী বৈষ্ণব প্রভুদের রচনার সাহায্যও আমরা গ্রহণ করবো।

'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্যদেবের যে জীবনালেখ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন যে, ১৪৮৬ খৃস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র পৈত্রিক বাস শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে পড়তে এসে পাঠ সমাপনান্তে নবদ্বীপেরই নীলাম্বর চক্রবর্তীর (প্রাক্তন শ্রীহট্টবাসী) গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে যান। সাত কন্যা ও দুই পুত্রের জনক জননী এই দম্পতিকে পর পর সন্তান-শোক ভোগ করতে হয়। সাতটি কন্যারই অল্পবয়েসে মৃত্যু ঘটে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীবিশ্বরূপ মাত্র ষোলো বছর বয়েসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে কনিষ্ঠ নিমাইকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে পিতা জগন্নাথ মিশ্র এই যুক্তিতে কোনোরূপ লেখাপড়া শেখাতে চান নি, কারণ তা হলে তাঁকেও হয় তো বিশ্বরূপের মতোই হারাতে হতে পারে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে এ বিষয়ে জগন্নাথ মিশ্রের উক্তি বলে যা প্রকাশিত আছে এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। জগন্নাথ বলছেন—

এহি যদি সর্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাই।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥

এই বিবরণটুকু থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তির মুখে (১১৯৭) বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন

রাজধানী নবদ্বীপ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়ে রাজধানী-নগরীর প্রভা-প্রভাবকে অনেকখানি ম্লান করে দিলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন কেন্দ্ররূপে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও নবদ্বীপ ছিল সারা ভারতে অদ্বিতীয়।

তবে 'বাঙলার বৃন্দাবন' বলে বাঙালীর পরমতীর্থরূপে পরিগণিত হলেও নবদ্বীপের প্রাচীনত্বের তেমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারতে এর কোনো উল্লেখ নেই। গঙ্গাতীরে বাসের সুবিধার জন্যে সেনরাজগণ নবদ্বীপে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। একাদশ শতাব্দী থেকে তাই এই নগরের ঐতিহাসিক পরিচিতি। দ্বাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কাল জুড়ে রাজত্ব করেন বহু শাস্ত্রবিৎ কবি ও পরম বৈষ্ণব মহারাজা লক্ষ্মণসেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁর সহায়তা স্মরণীয়। একদিকে জয়দেব, বিদ্যাপতি; চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ দীর্ঘকাল ধরে আগমনী গান গেয়ে পতিতপাবন শ্রীভগবানের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করছিলেন আর লক্ষ্মণ সেনের মতো বৈষ্ণব নৃপতি সেই আবির্ভাব পরিবেশই সৃষ্টি করে চলেছিলেন।

> যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমর্ধমস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতার এই মহাবাণীকে আরেকবার প্রমাণ করার জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাংশে অবির্ভূত হলেন পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে সারা ভারতবর্ষ যখন অধর্ম-অনাচারে ছেয়ে গেছে। তিনি অবতীর্ণ হলেন এমন এক স্থানে যে স্থান লোকে লোকারণ্য, যে স্থানের ঐশ্বর্যের অবধি নাই এবং যেখানকার অধিবাসীদের শাস্ত্রজ্ঞান-অহঙ্কারেরও শেষ নাই। 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সেই নবদ্বীপ সম্বন্ধে লিখেছেন—

> নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
> যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাঞি॥
> নবদ্বীপের ঐশ্বর্য কে বর্নিবারে পারে।
> একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

এই নবদ্বীপের নামকরণ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মত প্রচলিত। কারো কারো মতে গঙ্গা-গর্ভ থেকে নবোত্থিত বলে এর নাম নবদ্বীপ অর্থাৎ নতুন দ্বীপ; আবার কেউ কেউ বলেন, এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে নয়টি দীপ জ্বেলে

রাত্রিতে যোগসাধনা করতেন বলে একে 'নব দ্বীপ' বা 'নদীয়া' বলা হতো। তবে অধিকাংশেরই কথা, গঙ্গা থেকে একই সময়ে কাছাকাছি নয়টি দ্বীপের উৎপত্তি ঘটেছিল বলে লোকে তাদের সমষ্টিগত নাম দিয়েছিল নবদ্বীপ—যার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' গ্রন্থপ্রণেতা বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তীর কথায়—

নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়ের নবদ্বীপ সম্বন্ধে আচার্য দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখেছেন, 'নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপে চর্চা হইতেছিল। এসকল সত্বেও নবদ্বীপবাসী স্বল্প-সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি ও ষষ্ঠীর পূজা, যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত এবং পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থলী দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন। হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দুরহীন রমণী-ললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীর ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে অশ্রুপাত করিতেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য অগ্রগণ্য। প্রবাদ আছে, 'ইঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন।'

কিন্তু এতো হলো ভক্তিমার্গের কথা, ভক্তের ডাকে ভগবান আসেন—সেই বিশ্বাসের কথা এবং আবার সেই পুরনো অবতারবাদের কথা। তা হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে, সে সময়ে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে 'ত্রাহি, ত্রাহি' রব উঠেছিল। যাঁরা সদ্ভাবে জীবনযাপন করতে চাইতেন তাঁদের পক্ষে তা ছিল এক অতি দুরূহ ব্যাপার। একদিকে মুঘলশাসনের কঠোর নিপীড়ন এবং অন্য দিকে হিন্দু-সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনাচার ও কুসংস্কারের প্রাবল্যে এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে তখন কাল কাটাতে হচ্ছিল মানুষকে। সেই চরম দুর্দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন চৈতন্যদেব।

সে যুগটা ছিল বিচ্ছিন্নতার যুগ—মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মানুষ থেকেও সে তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সুপণ্ডিত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'এক মহাবিনষ্টির যুগে জাতীয় জীবনের এক ভীষণ দুর্দিনে এই জাতিকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন মহাপ্রভু। জাতীয় জীবনের মহাদুর্যোগে এ জাতি

নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচিয়াছিল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মহাকরুণায়—ভাগবতের মধ্যস্থতায়। পূর্ব-পূর্ব অবতারে শ্রীভগবান অস্ত্রধারণ করিয়া আসুরিক শক্তির বিনাশ সাধনকরত ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কিন্তু অস্ত্রধারণ করেন নাই। কাহাকেও আঘাত করেন নাই। কি দিয়া যে কি করিলেন, কি উপায়ে যে হীনতা দুর্বলতার পাতিত্য হইতে জাতিকে রক্ষা করিলেন ইহা বিস্ময়কর বটে।

'তৎকালীন সমাজে ধনৈশ্বর্য, বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রানুশীলন প্রভৃতি থাকিলেও একটি পরম বস্তুর অভাব ছিল, যার জন্য নরনারী আর্তনাদ করিতেছিল, যাহা মিটাইয়া দিয়া মহাপ্রভু সমাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজাইলে ইটের পাঁজা হয়—বাসের ঘর হয় না। ইটের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিয়া দুই দুই ইটে মিলাইয়া দিতে হয় সিমেণ্ট দ্বারা, তদ্রূপ কতকগুলি মানুষ হইলেই একটা সমাজ বা রাষ্ট্র হয় না। একটা জাতি তৈয়ারী হয় না। মানুষে মানুষে যে শত শত প্রকারের ব্যবধান আছে—তাহা দূর করিয়া এক-প্রাণতায় মিলাইতে পারিলে তবে জাতির সংগঠন হয়। ইটকে মিলাইতে পারে সিমেণ্ট মসলা। মানুষকে মিলাইতে পারে শ্রদ্ধা-ভালবাসা, ইহারই অপর নাম প্রেম। সমাজে এই প্রেমের অভাবই সর্বাধিক মর্মান্তিক অভাব, ইহা স্থির জানিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন সনাতন গোস্বামীপাদকে—'সনাতন, প্রেম প্রয়োজন'। যাহার অভাবে মানব সমাজ খাঁ খাঁ করিতেছে তাহার নাম প্রেমধন।

'ঈশ্বরকে ভালবাসার নাম ঈশ্বরপ্রেম। মানবকে ভালবাসার নাম মানবপ্রীতি। দুইয়ের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা। মানবপ্রীতি দাঁড়াইতে পারে না ঈশ্বরপ্রেমের ভিত্তিভূমি ছাড়া। মানবপ্রীতি—বিশ্বপ্রেম এসব সম্পূর্ণ অসম্ভব শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক না হইলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া দান করিলেন ঘরে ঘরে নরে নরে মধুর কৃষ্ণপ্রেমধন আর নিবিড় মানবপ্রীতি। কৃষ্ণকে ভালবাস আর কৃষ্ণের জীবগণকে ভালবাস। এই মহাবাণী দিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর সবাইকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মধ্যস্থতায়।

'মধ্যস্থ শ্রীভাগবদ্‌পুরাণ।

'ভাগবত একটা গ্রন্থমাত্র নহে। ভাগবত একটি বিশেষ প্রকারের জীবনধারা। ভাগবতীর প্রসঙ্গ নিত্য আস্বাদনে নরনারী এক দিব্য জীবনপ্রণালী লাভ করিল। ফলে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থান্ধতা, হিংসা, বিদ্বেষ, সমাজ হইতে কমিয়া গেল। মানুষে মানুষে মিলনের বাধা সরিয়া গেল। একপ্রাণপ্রতিষ্ঠায় জাতি বাঁচিল।

'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।'

কীভাবে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পরিবেশ সম্পূর্ণ হয়েছিল 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার সে সম্বন্ধে লিখেছেন—

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥
পিতা-মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥
মাধব-ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য প্রকট হৈল সেই সাথ॥

অদ্বৈত আচার্য কেমন দেখলেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা?

প্রকটিয়া দেখি আচার্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার॥

বাস্তবিকই তখন প্রায় সমস্ত মানুষই এমন স্বার্থবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল যে, সমাজ-সংসার থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রেম-প্রীতির ভাব একরূপ লোপ পেয়েই গিয়েছিল। এই অবস্থায় সমাজে সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি! তাই—

লোকগতি দেখি আচার্য করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥

আচার্যের মতে—

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥

তাহলেই সংসার থেকে সমস্ত অনাচার দূর হবে, বিচ্ছিন্নতা দোষ থেকে মুক্ত হয়ে আবার শান্তি পাবে।

শ্রীকৃষ্ণের যে সেই ইচ্ছা! কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সেই ইচ্ছার কথাই ব্যক্ত করেছেন এই ভাষায়—

যুগধর্ম প্রবর্তামু নাম সংকীর্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

ভক্তজন মনে করেন, ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে গৌর-ভগবান ঠিক তাই করেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষ অবতারবাদে বিশ্বাসী। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে বৈষ্ণব-কবিগণ তাঁদের গভীর বিশ্বাস থেকেই শ্রীগৌরসুন্দরকেও শ্রীকৃষ্ণের মতোই ভগবানের পূর্ণাবতার রূপে উপস্থিত করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণাবতারের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণ যেমন রসবিহারে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অসুর সংহার তাঁর মূল প্রয়োজন ছিল না—সেটা ছিল তাঁর আনুষঙ্গিক প্রয়োজন, ঠিক তেমনি গৌরাঙ্গলীলাতেও গূঢ়মূল প্রয়োজনের সঙ্গে যুগধর্ম প্রবর্তনের আনুষঙ্গিক প্রয়োজনটি যুক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু গূঢ়মূল প্রয়োজনটি কি?

কৃষ্ণলীলায় দেখানো হয়েছে যে, 'শান্ত ব্যতীত চারি রসের আশ্রয়বর্গের কৃষ্ণপ্রীতিই কাম্য'—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে॥

কিন্তু—

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥

তবে এই দুইয়ের মধ্যে পরকীয় ভাবের কৃষ্ণপ্রীতিরই সর্বাধিক্য এবং কেবলমাত্র ব্রজেই তার অধিষ্ঠান, এই তথ্য পরিবেশন করে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

'ব্রজললনার পরকীয় ভাবের নিত্যাবস্থান এবং শ্রীরাধায় উহার পরাকাষ্ঠা'—

অতএব সেইভাব অঙ্গীকার করি'।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

ভক্তমতে গৌরাবতারের গূঢ় কারণ এবার আমাদের ক

কৃষ্ণলীলায় রাধাকৃষ্ণ একাত্ম হলেও তাঁরা ছিলেন দু'টি ৽'

গৌরলীলায় রাধাকৃষ্ণ এক-তনু।

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

কিন্তু পরকীয় ভাব ও পরকীয়া প্রেম শুধু ব্রজভূমেই সীমাবদ্ধ, এ কেমন কথা? চণ্ডীদাসাদির প্রেম তা হলে কী? বৈষ্ণব ভক্তজনই এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবেন।

যাই হোক, গুহ্য ও বাহ্যকারণে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আচারে ও প্রচারে নেমে গেলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে॥
এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

পার্ষদ ও ভক্তগণের সহযোগিতায় ভারতব্যাপী সেই প্রচারকার্য কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তার আলোচনাতেই চৈতন্যযুগের সমাজরূপ আমাদের কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ধর্মভাবের প্রচার শ্রীচৈতন্য আরম্ভ করেছিলেন একরূপ শৈশব থেকেই। তারপর সন্ন্যাস অবলম্বনের পর থেকে সারা ভারত পর্যটনে প্রকৃত প্রচারকের ভূমিকায় যখন অবতীর্ণ, তখন থেকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তার আগে নিমাই, গৌরাঙ্গ বা গোরাচাঁদ ও বিশ্বম্ভর। মৃতবৎসা জননী-গর্ভে এক নিমগাছ-আচ্ছাদিত গৃহে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল নিমাই, উজ্জ্বল গৌরবর্ণরূপে মোহিত হয়ে লোকে ডাকতো তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গোরাচাঁদ বলে এবং বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ হিসেবেও বিশ্বকে তিনি প্রেম দ্বারা ভরণ-পোষণ করবেন আশায় পিতা জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন মাত্র ৪৮ বছরের জীবন। সে জীবন পরিষ্কার সমান দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া চলে। তার প্রথম ২৪ বছর গৃহস্থ-জীবন, পরবর্তী ২৪ বছর সন্ন্যাসজীবন। গৃহস্থরূপে এবং সন্ন্যাসী হিসেবে তাঁর বিবিধ কার্যকলাপ, আচার-আচরণ ও কথাবার্তা থেকে আমরা সে যুগের সমাজের মোটামুটি এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে পারি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নিমাইকে তাঁর পিতা লেখাপড়া শিখাতে চান নি, লেখাপড়া শিখে পাছে তিনিও আবার জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ন্যাসী

হয়ে যান, পিতার মনে এই ছিল ভয়। মূর্খ হলেও ছেলেকে তো কাছে পাওয়া যাবে—জগন্নাথের তাই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু ছেলেও যে আবার তেমনি। সেই ছোট্ট বয়েস থেকেই বাপ-মা'কে এবং প্রতিবেশীদের তিনি নানাভাবে জ্বালাতন করে অতিষ্ঠ করে তুললেন। নোংরা জায়গায় রান্নাঘর থেকে ফেলে-দেওয়া ভাঙা ভাঙা হাঁড়ির ওপর বসে থাকতে দেখে শচীদেবী একদিন নিমাইকে গালমন্দ করলে শিশু নিমাই তার যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর ঈশ্বরসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র ৩৪ বছর পরে শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভে এই গৌরনিতাই ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন) প্রণীত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' নিমাইয়ের সেই বিখ্যাত উক্তিটি এভাবে লিখিত আছে—

প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে॥
মূর্খ আমি না জানি যে ভালমন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান॥

এই উক্তির মধ্যে ভেদাভেদজ্ঞান-শূন্য এমন এক দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত রয়েছে, যা কোনো শিশুর কাছ থেকে কখনো আশা করা যেতে পারে না। তাই প্রশ্ন ওঠে, নিত্যানন্দের আদেশে চৈতন্যচরিত রচনায় বসে ভক্তির আতিশয্যেই কি শিশু নিমাইকে দিয়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অমন অসম্ভব উক্তি করান নি? এ প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব ভক্তদের বক্তব্য, সত্যশ্রয়ী নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে যেমনটি শুনেছেন, প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-দেবের কাহিনীকে তেমনভাবেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। এ উত্তরের পরেও অবশ্য কথা থেকে যায় যে, তা হলে চৈতন্যদেবকে ভগবান বা ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্য নিয়েই অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দ চৈতন্যচরিত লেখাবার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও সে উদ্দেশ্যেই, ভাগবতের কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য যে অভিন্ন তা প্রমাণ করার জন্যে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারই জন্যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থের মূল নামটি পর্যন্ত পালটে দেওয়া হয়েছিল। এই নাম পরিবর্তন সম্পর্কে দুই রকম মত প্রচলিত আছে। জয়ানন্দ ও বৃন্দাবন দাস উভয়ের গ্রন্থের নামই 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল বলে বৃন্দাবন-জননী নারায়ণী নাকি পুত্রের গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'চৈতন্যভাগবত'। (পরবর্তী কালের লোচনদাস রচিত 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র কথাও স্মরণীয়) অন্যমতে—

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবৎ আখ্যা দিল॥

এ বিষয়টি অবশ্য আমাদের মূল আলোচ্য নয়। তখনকার যুগে সংস্কৃতই ছিল সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা এবং সেই সংস্কৃত রীতির অনুসরণেই বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁর কাছ থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা ও বহিরঙ্গ জীবনের দৈনন্দিন নানা আচার-আচরণের কথা শুনে ভাগবতের আদর্শেই এক দিব্য প্রেরণাময় জীবন আঁকতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সে জন্যেই 'চৈতন্যভাগবতে' ভাগবত ও বিভিন্ন পুরাণ থেকে উদ্ধৃত অনেক শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র তো কথাই নেই, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই সংগৃহীত বা স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যেমন নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে শোনা শ্রীচৈতন্যর নানা আত্মকথা 'চৈতন্যভাগবতে' লিপিবদ্ধ করেছেন, কবিরাজ গোস্বামীও তেমনি চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রমুখ বৈষ্ণব-গুরু-শ্রেষ্ঠদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নানা বাণী মহাপ্রভুর বয়ানে লিখে গেছেন। সত্যাশ্রিত সেই সব গোস্বামীদের কথা মিথ্যা হবে না ধরে নিয়েই পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে গৌরসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের উক্তি বলে বর্ণিত সমস্ত কথাকে বিচার করতে হয়। সেভাবেই গৃহী শ্রীগৌরাঙ্গ ও সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বিবিধ উক্তি ও আত্মকথার দর্পণে আমরা সে সময়ের বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করবো।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যচরিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীগৌরাঙ্গের চব্বিশ বছরের গৃহী-জীবনের বর্ণনা অতুলনীয়। সে বর্ণনা পাঠেই জানা যায়, পিতা জগন্নাথ মিশ্র শিশু নিমাইকে লেখাপড়া না শিখিয়ে মূর্খ করে ঘরে রাখতে চাইলে চারদিকে এমন উৎপাত তিনি করতে শুরু করেছিলেন, যার ফলে বাধ্য হয়েই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে পাঠের একাগ্রতায় অল্পসময়ের মধ্যেই নিমাই ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হয়ে উঠলেন। সহপাঠীরা তো ছাড়, বড়ো বড়ো পণ্ডিতকেও তিনি যত্রতত্র তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। মুরারি গুপ্ত তাঁর সহপাঠী হলেও বয়েসে তাঁর চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়ো। বালক নিমাই তাঁকে একদিন তর্কে হারিয়ে দিয়ে বড়োই অপ্রস্তুত করেছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে' মুরারি গুপ্তের প্রতি নিমাইয়ের সেদিনের মর্মঘাতী বিদ্রূপের এইরূপ বর্ণনা রয়েছে—

প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিধর ন্যায়শাস্ত্রী গদাধর পণ্ডিতকেও একদিন তরুণ নিমাই পণ্ডিতের হাতে কম নাজেহাল হতে হয় নি। মিথিলা থেকে কোনো ন্যায়ের গ্রন্থ বাইরে নিতে দেওয়া হতো না বলে যে গদাধর মিথিলায় ছাত্র হয়ে গিয়ে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে নিয়ে এসেছিলেন এবং নবদ্বীপেই ন্যায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই মহা-পণ্ডিতকেও একদিন পথ-চলতি অবস্থায় নিমাইয়ের হাতে কিরূপ বিব্রত হতে হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে 'চৈতন্যভাগবতে'। সেখানে দেখা যায়—

হাসি দুই হাত প্রভু রাখিয়া ধরিল।
ন্যায় পড় তুমি আমায় যাও প্রবোধিয়া।
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন।
প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ॥

নানা বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে নিমাই শেষে নিজেই নবদ্বীপে উনিশ বছর বয়েসে এক টোল বসিয়ে অধ্যাপনা শুরু করে দিলেন। অধ্যাপকের গৌরকান্তি ও অসামান্য প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ছাত্র এসে নিমাই পণ্ডিতের পাঠশালা ভরে ফেললো।

ইতিমধ্যে অনেক অঘটন ঘটে গেছে। কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতদের এসে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলে তরুণ নিমাই কীভাবে তাঁর দম্ভ চূর্ণ করেছিলেন সেই বহুপ্রচারিত ঘটনাটি সবারই জানা। 'চরিতামৃতে' দেখি সেই তর্কযুদ্ধে কেশব কাশ্মীরীর গঙ্গাস্তোত্রে ভুল প্রদর্শন করলে তরুণ নিমাইয়ের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে অহঙ্কারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলেছিলেন—

ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥

কিন্তু নিমাই যখন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে তাঁর কাব্যের ভুল প্রদর্শন করলেন, কেশব কাশ্মীরী সেই মুহূর্তেই সেখান থেকে চলে গেলেন। সরস্বতীর স্বপ্নাদেশে রাত্রিতে নিমাইকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলে জানতে পেরে পরদিন তিনি নাকি এসে তাঁর শরণ নিয়েছিলেন।

এমন পণ্ডিত হয়েও নিমাই কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেন নি। পিতামাতার মনের ভয় তিনি অনেক কাল পর্যন্ত দূরে রেখেছিলেন। তাঁকে তা করতেই হবে। তিনি যে পিতৃ-মাতৃচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে নিমাই তেমন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন বাবা-মাকে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী সে কথাই লিখেছেন—

আমি ত' করিব তোমা দুঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন॥

পিতা-মাতার সন্তোষ বিধান আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার পরিচায়ক। চৈতন্যদেব তাঁর আত্মকথায় ও কার্যকলাপে বার বার সে পরিচয় রেখেছেন। সন্ন্যাসী বিশ্বরূপ এসে একবার তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বললে নিমাই যে উত্তর দিয়েছিলেন, 'চরিতামৃতে' উক্ত তাঁর সেই উক্তিটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নিমাই বলছেন—

আমি কহি,—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক,—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া, করি পিতৃ-মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ॥

এই প্রতিশ্রুতিকে পটভূমিতে রেখেই গার্হস্থ্য জীবনের পথে এগিয়ে চলেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। কিন্তু মাত্র এগার বছর বয়েসে পিতৃহারা হয়ে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও খুব ভেঙে পড়েছিলেন। তবে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সময়ের প্রভাবে এবং বন্ধুবান্ধবের প্রবোধবাক্যে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। কৃষ্ণদাস তাই 'চরিতামৃতে' লিখলেন—

কতদিনে প্রভুচিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব কবিকুল শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্বতোভাবে ভগবানের পূর্ণ অবতারত্বে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেও গৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ মানবীয়রূপ তাঁদের কাব্যগাথার মধ্যেই মাঝে মাঝে অতি চমৎকারভাবে প্রকটিত হয়ে পড়েছে। নিমাইয়ের বিয়ের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি একটি ঘটনা। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এক সুন্দরী বালিকাকে দেখে তরুণ নিমাই

আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সেই বালিকার সঙ্গে ঘটকের মাধ্যমে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। তার বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভ আচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গা পথে॥

সেই একদিনের দেখাতেই দুয়ের মধ্যে প্রীতির ভাব দেখা দিল এবং সেই প্রীতি-সম্বন্ধেরই পরিণতি বিবাহ। কিন্তু সেই পরিণতিতে পৌঁছুতে হবে তো সমকালীন সমাজ-রীতির পথ ধরে। তাই বনমালী পণ্ডিতের ঘটকত্বের প্রয়োজন হলো। সে কথাই রয়েছে 'চরিতামৃতে'—

পূর্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা॥

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটলো।

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন॥

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' এ বিয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য করার বিষয় সাধারণ সামাজিক মানুষের মতোই শ্রীগৌরাঙ্গ সমস্ত সামাজিক নির্দেশ পালন করে চলেছেন, তাই তাঁর চরিত-কথা আলোচনায় দেখা যায় যে, যথাসময়েই নিমাইয়ের হাতে-খড়ি এবং মুখ্য শিক্ষারম্ভ হয়েছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল॥

তারপরেই পৌগণ্ড অর্থাৎ বাল্যলীলার (ছয় থেকে দশ বছর বয়েস পর্যন্ত) কাল। 'চরিতামৃত' মতে ঐ সময় ধরেই শুরু হয়েছিল নিমাইয়ের মূল অধ্যয়ন।

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন।

সমাজ-নির্দিষ্ট সময়ে উপনয়নও হয়েছিল নিমাইয়ের। এ বিষয়ে লোচন-দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও চূড়ামণি দাসের গঙ্গাবিষয়ক গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ন'বছর বয়েসে যখন 'নবম বরিখ পুত্র যোগ্য সুসময়' (চৈতন্যমঙ্গল) তখন 'অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাস' (গৌরাঙ্গ বিজয়) দেখে নিমাইকে উপবীত দেওয়া হয়েছিল। দু' বছর বাদে সহসা পিতৃবিয়োগ ঘটলে কিশোর নিমাই যথানিয়মে স্বর্গত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। তারপরে যৌবনে

পদার্পণ করে ষোল বছর বয়েসে তিনি মায়ের ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং যথারীতি সংসারধর্মে মন দেন। সংসারের প্রয়োজনে অর্থের দরকার। উনিশ বছর বয়েসেই নিমাই তাই টোল প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনা আরম্ভ করে দিলেন।

এসবই একান্তভাবে মানবীয় আচরণ। এতে ঈশ্বরত্ব আরোপের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। সামাজিক বিধি-বিধান মেনে না চললে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাতে সমাজের সামগ্রিক ক্ষতি সাধিত হয়, গৌরাঙ্গ-জীবনের প্রথমার্ধ থেকে আমরা এই লোকশিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

অধ্যাপনা আরম্ভের পরবৎসরই নিমাই পণ্ডিত বাহ্যত অর্থার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ববঙ্গ পর্যটনে গিয়েছিলেন। 'চরিতামৃতে' বলা হয়েছে, সেখানে বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে শাস্ত্রপাঠ গ্রহণ করেছিল—

বিদ্যার প্রভাব দেখি' চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে॥

কিন্তু এই উপার্জনের বাহ্য উদ্দেশ্য ছাড়াও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের একটা অন্তর্নিহিত লক্ষ্যও ছিল নিমাইয়ের। সেটা ধর্মীয় উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্য এবং বহুধা বিচ্ছিন্ন সমাজে সহজ ধর্মাচরণের পথে একটা ঐক্যসাধনপ্রয়াসও বটে। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও অপর পক্ষে মুসলমান শাসনের কঠোরতায় হিন্দু-সমাজ যখন ছিন্নভিন্ন প্রায় সেই সময় ব্যয়-সাপেক্ষ পূজা-পার্বনের পরিবর্তে শুধু ঈশ্বর-নাম কীর্তনেই যে মানুষ মুক্তি পেতে পারে, মানব-মুক্তির সেই সহজ পথের সন্ধান সেই সময় থেকে দিয়ে চলেছিলেন নিমাই। সেকথাই কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে'—

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে (পূর্ববঙ্গে) গমন।
যাঁরা যায়, তাঁহা লওয়ায় নাম-সংকীর্তন॥

সেখানেই তপন মিশ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নির্দেশে কাশীবাসী হয়েছিলেন এবং পরে কাশীতে তাঁকে তিনিই সাধ্য-সাধন তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিমাইয়ের দ্বারা পূর্ববঙ্গ-বাসীদের সকলের মঙ্গলসাধনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

এইমত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত॥

কিন্তু সেতো হলো, এদিকে যে মহা বিপদ! পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই

নবদ্বীপে ফিরে দেখেন, লক্ষ্মীদেবী আর ইহলোকে নেই। সর্পদংশনে তিনি তিরোহিতা। ভক্তগণের মতে 'বিরহ-সর্পের দংশনে' এ মৃত্যু সংঘটিত বলা হলেও সেকালে যে বহু জীবনহানি ঘটতো সর্পদংশনে এবং তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই যে সমাজে নাগপূজার প্রবর্তন হয়েছিল, কে তা অস্বীকার করবে ?

সে যাই হোক, পত্নীহারা হয়ে 'শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস'-এ মেতে উঠলেন নিমাই এবং তাঁকে শান্ত করার জন্যে মাতা শচীদেবী গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্-র প্রধানমন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত সনাতন-কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বধূরূপে ঘরে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তাই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন—

নতুন লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ।
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয় ক্রন্দন॥

তখনো আরেকটি সামাজিক কর্তব্য বাকি রয়েছে গৌরসুন্দরের। পিতৃ-পিণ্ডদান করতে হবে গয়াধামে। বেশ কিছু ছাত্র-সঙ্গী নিয়ে গেলেন গয়ায়। সেখানেই সাক্ষাৎ পেলেন তিনি ঈশ্বরপ্রতিম ঈশ্বরপুরীর। তাঁর শোকসন্তপ্ত চিত্ত শান্ত হলো, তৃপ্ত হলো। গুরুরূপে ঈশ্বরপুরীকে বরণ করে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন তিনি। গুরুর জন্মগ্রাম কুমারহট্টকে গয়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে মনে হলো তাঁর। 'চৈতন্যভাগবতে' তাই দেখি—

প্রভু বলে, কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরী যে-গ্রামে অবতার॥

নিমাই বলেছেন, 'এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন-প্রাণ।'

ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের কার্যকলাপে ঈশ্বরভাব বিশেষভাবে প্রকট হতে থাকে। বিচ্ছিন্ন ও আদর্শচ্যুত মানুষকে ঈশ্বরের নাম-বন্ধনে ও প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করে সৎ ও সংহত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি তখন এক অভিনব ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তারই ফলে সমগ্র বাঙলার সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক অভাবনীয় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

সে যুগে সংসার-ত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস নেবার একটা রীতি খুব চালু ছিল। গৌর-জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপের মতো নিতাইও মাত্র বার বছর বয়েসে নিখোঁজ সন্ন্যাসী

হয়ে বত্রিশ বছর বয়স্ক তীর্থ-পর্যটক রূপে মিলিত হয়েছিলেন তেইশ বছরের নবীন কীর্তনীয়া নদের নিমাইয়ের সঙ্গে। তার এক বছরের মধ্যেই কাটোয়ায় তপস্বী সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীকে প্রবোধ দিয়ে বলে গেলেন—

লোকরক্ষা নিমিত্ত যে আমার সন্ন্যাস।
এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥

'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখি ভক্তদের তিনি আরো বলেছেন—

যদ্যপি সহসা আমি কর্যাছোঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা—সবা হইতে নহিব উদাস॥
তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম, নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা॥

এরপর নিমাইয়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাল তাঁর পুরীধামে অবস্থানের আঠারো বছরের জীবন যে সময়ে তাঁর বৈপ্লবিক সত্তার উজ্জ্বলতম দিক ভারতীয় সমাজে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায় মাতৃ আজ্ঞায়ই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্র পুরীধামকেই তাঁর শেষ জীবনের প্রচার-ক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন, তাও বলেছিলেন। তাইতো 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আমরা দেখতে পাই, জগদানন্দ পণ্ডিতকে পুরী থেকে নবদ্বীপে শচীমাতার কাছে পাঠিয়ে তাঁকে এই খবর জানিয়েছিলেন—

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥

এই সময়ের আনুপূর্বিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চৈতন্যদেবের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল ওড়িশার প্রতি। থাকবেই তো। তাঁর পূর্বপুরুষের বাস যে ছিল ওড়িশার কটক জেলার যাজপুরে। নিমাইয়ের পিতামহ উপেন্দ্রনাথ মিশ্রই ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে যেয়ে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু তার পনের বছর পরেই সেই উপেন্দ্র-তনয় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র অর্থোপার্জনের তাগিদে নবদ্বীপে চলে আসেন স্থায়ী বসবাসের জন্যে এবং সেখানেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। স্বাভাবিক ভাবেই শচীমাতা তাঁর শ্বশুরকুলের আদিবাস উৎকল

ভূমির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং জগন্নাথ-ক্ষেত্র পুরীকে তাঁর সন্ন্যাসী-পুত্র নিমাইয়ের মূল প্রচারকেন্দ্র করে নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ লীলাভূমি রূপে সেই পুরীধাম যে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লব-তীর্থ হয়ে উঠবে সেও খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবিকই সে সময়ে 'চৈতন্য বলতে ওড়িশা এবং ওড়িশা বলতে চৈতন্যকে'ই বুঝাতো। রাজা (প্রতাপরুদ্র), প্রজাবর্গ এবং উচ্চ-নীচ সবাই তাঁর নামে ছিলেন তখন পাগল। তেমন পরিবেশে মহাপ্রভুর মনের শ্রেষ্ঠ বাসনা যে সহজেই রূপায়িত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। তাই দেখি মানুষে মানুষে সব সামাজিক ভেদাভেদ চিরতরে মুছে গেছে জগন্নাথধাম শ্রীক্ষেত্রে। পুরীতে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবনে ব্রাহ্মণের কোন বাধা নেই। মহাপ্রভুর কাছে বরং উচ্চ বর্ণের চেয়ে অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরাই পেতেন বেশি সমাদর। 'ব্রাহ্মণে দেন আলিঙ্গন আর চণ্ডালে দেন কোল' এই ছিল শ্রীচৈতন্যের রীতি এবং তাঁরই নির্দেশে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র পরিচালিত হতেন।

মহাপ্রভুর এই অতুলনীয় প্রভাবে যে কিছু লোক ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হবে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তেমনি পরিবেশেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একদিন হঠাৎ চৈতন্যদেবের জীবনাবসানের সংবাদ ঘোষিত হলো এবং তা নিয়ে প্রচারিত হতে থাকলো নানা অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনী। রথের সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আকস্মিক অন্তর্ধান ও তারপরেই উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের পুরীত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা কি তাহ'লে কোনো গভীর চক্রান্তেরই পরিণতি? তা অসম্ভব কিছু নয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্ষমতালোভীদের ষড়যন্ত্র চিরকালই চলে আসছে এবং চলবেও। তবে সেসব আমাদের আলোচ্য নয়।

সব মানুষ সমান—মহাপ্রভুর এই আদর্শ ই তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক অবদান, এ আলোচনায় এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। দুঃখের বিষয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ভক্তিমূলক সম-বোধ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেও ভারতে আজও পর্যন্ত মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রেণী-বৈষম্যহীন সেই সমন্ধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি যদিও সে বিষয়ে নতুন করে চেষ্টা শুরু হয়েছে।

প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহী সাম্যবাদী শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বিশ্বজনীন উদার প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারত সামাজিক বৈষম্য ও হিংসা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারলে বিশ্বমানব সমাজের কাছে গৌরাঙ্গ-ভূমি ভারত এক আদর্শ রাষ্ট্ররূপে প্রতিভাত হবে।

পাঠান সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আপন কথায়

একালের সঙ্গে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বঙ্গদেশ, পঞ্চগৌড় তথা ভারতবর্ষের সমাজ-কাঠামো ও সামাজিক রীতির আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি সমকালীন কীর্তিমান মনীষীদের আত্মচরিতমূলক নানা রচনা বিশেষ করে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের আত্মকথা আলোচনার মাধ্যমে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের আরেকখানি মূল্যবান আত্মজীবনী পাওয়া যায় এবং সেটি একজন পাঠান শাসকের যাঁদের শাসনকালকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির আবির্ভাব-ধন্য বলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দিত করেছিলেন।

দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের আত্মজীবনীর কথা বলছি। তা নিয়ে আলোচনা আরম্ভের পূর্বে তাঁর শাসনকাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জেনে নেওয়া দরকার। জানা দরকার তাঁর শাসন আরম্ভের পটভূমির কথা।

ফিরোজ শাহ্ তুঘলক পূর্ববর্তী সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের সম্পর্কিত ভ্রাতা অর্থাৎ তিনি তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র। নিঃসন্তান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছায় এবং অভিজাতবর্গের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফিরোজ শাহ্ তুঘলককেই দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। সে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দের কথা। ঐ সময় থেকে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ্ রাজত্ব করেন।

সুলতান বংশীয় হলেও ফিরোজ তুঘলক ছিলেন রাজপুত জননীর সন্তান। শাসন কর্তৃত্ব হাতে পেয়েই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে বিশেষত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং চারদিকের বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর হন। বিদ্রোহী বাঙলাকে দমন করতে এসে দু'বারই অবশ্য তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। প্রথমবার তিনি সসৈন্যে অভিযান করেছিলেন স্বাধীন বাঙলার সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্কে দিল্লীর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করবার জন্যে। কিন্তু পরাজিত হয়ে গভীর মনস্তাপের সঙ্গে ফিরোজ শাহ্কে যে সেবার প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল সে-কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইলিয়াস শাহ্র মৃত্যুর পর শিকান্দর শাহ্র আমলে ফিরোজ শাহ্ আরেকবারও বাঙলাকে পদানত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হন। এর পর দু'শ বছর ধরে দিল্লী আর বাঙলার ওপর কোনোরূপ উপদ্রব করতে ভরসা পায়নি।

ফিরোজ শাহ্ সুলতান মহম্মদ তুঘলকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁর সময়েই বিভিন্ন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি আগে থেকেই শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে তাঁকে ৪৬ বছর বয়েসে সুলতানের পদ গ্রহণ করতে হলেও তাঁর দীর্ঘ ৩৭ বছরের শাসন ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাঁকে শক্তিশালী সার্থক শাসক বলা চলে না।

রাজনৈতিক আকাঙ্খাহীন ধর্মনিষ্ঠ সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলককে সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনী এবং শাসস্-ই-সিরাজ আফিক্ 'শ্রেষ্ঠ মুসলমান শাসক' বলে অভিহিত করেছিলেন প্রধানত তাঁর পরোপকার-প্রবৃত্তি, ধর্মপ্রবণতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সততা প্রভৃতি গুণাবলীর জন্যে। কিন্তু কে অস্বীকার করবে যে তাঁর কালের ঢিলে শাসনের ফলেই সমাজে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, তাঁর ধর্মান্ধতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির অভাবের জন্যে প্রজা-হিতৈষী শাসক হয়েও তাঁর প্রজাবর্গের অধিকাংশের বিরূপতার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে ?

ফিরোজ শাহ্ সমর কুশলতারও তেমন কোনো পরিচয় দিতে পারেননি। একমাত্র জাজনগর (ওড়িশা) অভিযানেই তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সেখানকার বিজয়ের পর তিনি পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ পদদলিত করবার জন্যে তা দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে হিন্দু প্রজাদের মনে যে দারুণ আঘাত দিয়েছিলেন তাকে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আসল কথা তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান এবং তাঁর রাজ্যে তিনি পুরোপুরি কোরাণের শাসনই প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তা করতে গিয়েই পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন, এবং অনেক সময় অমুসলমান প্রজাদের ওপর অকারণে কঠোর নির্যাতন চালাতেও কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করেননি। অবিচার বা অত্যাচার করার উদ্দেশ্য নিয়েই যে তিনি এরূপ করতেন তা নয়, কোরাণের নির্দেশ যথাযথ পালন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। উদার-হৃদয় এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই শাসকের কার্যকাল এই গোঁড়ামির জন্যেই এত নিন্দিত।

এবার ফিরোজ শাহ্র আত্মজীবনীর ভিত্তিতেই তাঁর কাল ও সেকালের সমাজরূপকে বিশ্লেষণ করা যাক।

আত্মকথার আরম্ভেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরোজ তাঁর পিতৃ-পরিচয়ে বলেছেন যে, তুঘলক শাহ্র পুত্র মহম্মদ শাহ্, তাঁরই দাস রজবের গৃহে তিনি

জন্মগ্রহণ করেছেন। হিন্দুস্থানে সেই সময়ে অধার্মিকতা ও অন্যায়ের প্রবাহ বয়ে চলেছিল। নাস্তিকতা দমন, অপরাধ-প্রবণতা প্রতিরোধ এবং আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের একটা বিধি-নির্দেশিত প্রেরণা দ্বারা তিনি চালিত হতেন। একথাও তিনি সগৌরবে বলেছেন যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে এবং সংসারের যে দস্ত ধর্ম-পথের প্রধান অন্তরায় তাকে অপসারণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

এর পরেই ফিরোজ তাঁর পূর্বেকার রাজাদের আমলে মুসলমানদের ওপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চলতো তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, 'আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, মহান ও করুণাময় ঈশ্বর আমাকে তাঁর দয়া-নির্ভর হয়ে এই অন্যায় মুসলমান-হত্যা নিরোধে এবং তাদের ওপর থেকে, সকল মানুষের ওপর থেকে সর্বপ্রকার অত্যাচার রোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফিরোজ বলেছেন, 'সেই নির্দেশ পেয়েই 'ঈশ্বরের সাহায্যে আমি স্থির করলাম, মুসলমানদের এবং সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ লোকদের জীবন নিরাপদ করতে হবে এবং যারা আইন অমান্য করবে তাদের শাস্তি পেতে হবে।'

তাঁর আগের হিন্দুস্থানের অনেক করকেই ফিরোজ শাহ্ সরকারের জুলুমবাজি বলে মনে করতেন। সে সব কর বাতিল করে দিয়েছিলেন তিনি। সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আগে অনেক রকম বে-আইনী ও অন্যায় কর আদায় করা হতো। আমি সে সব তুলে দিলাম এবং এই মর্মে আদেশ জারী করলাম যে, রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে যারা ঐ সমস্ত কর আদায় করবে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। পবিত্র আইনের দ্বারা স্বীকৃত না হলে কোনো অর্থই সরকারী কোষাগারে জমা পড়তে পারবে না।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ সংগৃহীত না হয় এবং দুর্নীতি ও নির্যাতনের পক্ষে আদায়ীকৃত অর্থ যাতে সরকারী কোষাগারকে কলঙ্কিত করতে না পারে সে বিষয়ে ফিরোজ শাহ্ সুলতান হয়েই খুব কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। পূর্ববর্তী সুলতানদের আমলে এরূপ অর্থ সম্পর্কে কোনোরূপ বিরূপতা ছিল না। বরং সরকার থেকে তেমন অর্থ গ্রহণের ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র বিবরণ থেকেই আমরা তার প্রমাণ পাই। তিনি লিখেছেন—

'আমার আমলের আগে এরকম নিয়ম ছিল যে, নাস্তিকতা দমন করতে গিয়ে লুটপাট করে যা পাওয়া যাবে সেই লুটের মালের চার-পঞ্চমাংশ যাবে সরকারী খাজাঞ্চিখানায় আর বাকী এক-পঞ্চমাংশ পাবে দমনকারী। কিন্তু

আইন অনুযায়ী এক-পঞ্চমাংশ রাজ্য সরকারের এবং চার-পঞ্চমাংশ দমনকারীর পাবার কথা। এ-ভাবে আইন অমান্য করতে অভ্যস্ত হয়ে প্রত্যেকেই মনে করতে থাকলো যে, সে-ই লুটের মালের আইনত মালিক। এর ফলে লুঠতরাজ-কালীন বন্দিনী নারীদের গর্ভে বহু অবৈধ সন্তানের জন্ম হতে লাগলো। এ সমস্ত অনিয়ম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই আমি আদেশ জারী করলাম যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশই রাজ্য সরকারে যাবে এবং চার-পঞ্চমাংশ পাবে লুণ্ঠনকারী নিজে।'

এতো গেল নাস্তিকদের দমনের কথা এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভাগ-বাটোয়ারার কথা। শিয়াদের তিনি কীভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন, এরপরেই তিনি সে বিষয়ের বর্ণনায় লিখেছেন, 'শিয়া' সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বহু লোককে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল। তারা অনেক নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেছিল; তাদের সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্বন্ধে তারা শিক্ষা ও উপদেশ বিতরণ করে চলেছিল এবং আমাদের প্রথম যুগের ধর্ম-নায়কদের সম্পর্কে নানারূপ কলঙ্ক রটিয়ে ও গালিগালাজ বর্ষণ করে চলেছিল। আমি তাদের সকলকে আটক করে ভুল ও বিপথগামিতার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করলাম। তাদের পাণ্ডাদের আমি দণ্ডিত করলাম এবং আর সকলকে ভর্ৎসনা করে ও প্রকাশ্য শাস্তির ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলাম। তাদের লেখা সমস্ত বইপত্র আমি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেললাম এবং এইভাবেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব আমি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলাম।'

ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের এই সগৌরব স্বীকৃতির মধ্যে তাঁর গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম ভ্রান্ত ধর্ম, এমন একটা ধারণা থেকেই তিনি যে তাঁর কর্ম-নীতি স্থির করে নিয়েছিলেন বিধর্মীদের সঙ্গে ব্যবহারে বারবার তাঁর সে পরিচয় তিনি দিয়েছেন। সেজন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র খেদ বা অনুশোচনা নেই; বরং প্রচুর গর্বের সঙ্গেই তিনি সেই সব কথা তাঁর মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত আত্মকথায় তথা তাঁর শাসন-বিবরণীতে নিজে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

বাহ্যত হিন্দু বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা বলে মনে হলেও ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের অনেক কার্যকলাপকে কোরাণের নির্দেশ পালনে অত্যুৎসাহের ফল বলে ধরে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্য ধর্মমতে বিশ্বাসীদের ওপর নিছক অত্যাচার করার মনোভাব নিয়ে তিনি কখনো কোনো কাজে অগ্রসর হননি। তাঁর বিভিন্ন প্রজা হিতৈষণামূলক সংস্কার থেকেই এ সত্য

প্রমাণিত হবে। বিচার ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস, রাজ্যময় সেচের খাল খনন, আন্তঃ-প্রাদেশিক শুল্ক রদ, দেশের নানা অংশে দাতব্য চিকিৎসালয় ও সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এবং বেকার সমস্যার সমাধানে কর্মবিনিয়োগ সংস্থা স্থাপন ইত্যাদি কাজে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর সকল প্রজাই বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল এবং যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি সেজন্যে উপকারের পরিমাণটা তারাই ভোগ করতো বেশি। আর এও দেখা গেছে, মুসলমান বলেই ধর্মবিরোধী বা সমাজ বিরোধী কাজ করে তাঁর কঠোর শাসন থেকে কেউ অব্যাহতি পায় নি। এ ধরণের কার্যকলাপ যাতে প্রশ্রয় পেতে না পারে এবং সমূলে উৎপাটিত হয় সে উদ্দেশে তিনি যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিররণ পাওয়া যায় ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের আত্মকথায়।

তখনকার দিনে সমাজে ধর্মের নামে নানারূপ অনাচার-ব্যভিচার অবাধে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল। ফিরোজ শাহ্ সুলতান হয়েই সে সব অন্যায় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে বদ্ধ-পরিকর হলেন। সে বিষয়ে আত্মকথায় তিনি লিখেছেন, 'চলতি ধর্মমতের বিরোধী মতাবলম্বী সম্প্রদায় আর গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরা জনসাধারণকে প্রচলিত ধর্মের বিরোধী ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলতে চেষ্টা করছিল। তারা রাত্রিবেলায় পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ও জায়গায় মিলিত হতো। খুব পানাহার চলতো। একেই তারা ধর্মীয় উপাসনা বলতো। এসব সমাবেশে তারা তাদের স্ত্রী এবং মা-বোনদেরও নিয়ে আসতো। পুরুষরা যেন উপাসনা করছে, এমনিভাবে তারা মাটিতে শুয়ে পড়তো এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে-নারীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে ফেলতো সে-ই তার সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হতো। এই সম্প্রদায়ের বয়স্কদের আমি শিরশ্ছেদ করলাম এবং অবশিষ্টদের বন্দী করলাম ও নির্বাসন দিলাম, যাতে চিরকালের মতো তাদের এই ঘৃণ্য প্রথার অবসান ঘটে।' এরূপ সামাজিক অপরাধের উচ্ছেদে সুলতান যে কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন নিশ্চয়ই তা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। এই দোষে শিরশ্ছেদকে গুরুদণ্ড বলে সমালোচনা উঠতে পারে কিন্তু ঐরূপ জঘন্য ধর্মানুষ্ঠানকে কোনো সভ্য দেশই বরদাস্ত করতে পারে না।

অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে ফিরোজ শাহ্ যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবার তা নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে তিনি কি ভাবে শায়েস্তা করেছিলেন সে বিষয়ে ফিরোজ লিখেছেন, 'আরেকটি সম্প্রদায় ছিল, যারা ঈশ্বরকে মানতো না, সমস্ত সংযম

বিসর্জন দিয়ে মানুষকে যারা ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছিল। তাদের গুরুর নাম ছিল আহ্‌মদ বহারি। তার একদল শিষ্য তাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করতো। নিজেকে সে পয়গম্বর করে তুলেছিল এবং এরূপ প্রচার করে চলেছিল, যে তার শিষ্য না হবে সে পয়গম্বরের আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হবে। একদিন তার এক শিষ্য জোরের সঙ্গে ঘোষণা করল যে দিল্লীতে এক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে এবং আহ্‌মদ বহারিই সেই দেবতা। এই কথা যখন প্রমাণিত হলো তখন আমি তাদের উভয়কেই (গুরু-শিষ্য) আটক করতে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে আদেশ দিলাম। আর এই দুষ্ট সম্প্রদায়টির প্রভাব যাতে বিনষ্ট হয়ে যায় তার জন্যে আমি সেই দলের বাকী সকলকে ভর্ৎসনার পর অনুতপ্ত ও সংশোধিত হবার উপদেশ দিয়ে বিভিন্ন শহরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলাম।'

এখানেও দেখা যাচ্ছে, মুসলমান বলে আহ্‌মদ বহারি ও তার শিষ্যদের প্রতি ফিরোজ কোনোরূপ অনুকম্পা দেখান নি, তাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে যথাযোগ্য শাস্তি তাদের পেতে হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড হয়েছে বলে কথা উঠতে পারে। কিন্তু যেখানে যেখানে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন সেখানে তিনি অনুরূপ দণ্ড বিধানেরই নির্দেশ দিয়েছেন, অপরাধী মুসলমান বলেই তার প্রতি কোনোরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে এমন নজীর তাঁর শাসনকালে না থাকে তেমনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনার চেষ্টা করেছেন সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক।

গুরুতর অপরাধে মুসলমানদেরও ফিরোজ শাহ যে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত তাঁর আত্ম-জীবনীর পাতা থেকেই এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন, 'রুকনুদ্দীন নামে দিল্লীতে একটি লোক থাকতো। নিজেকে সে ঈশ্বরের পয়গম্বর বলে জাহির করে জনসাধারণকে অতীন্দ্রিয়বাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথে নিয়ে যাচ্ছিল। সে বলতো, কারো কাছ থেকেই সে কোনোরূপ পাঠ নেয়নি, তথাপি সমুদয় জিনিষের নাম তার জানা এবং এ এমন এক বিদ্যা যে বিদ্যার অধিকারী হওয়া আদমের পরে আর কোনো ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইমাম মাহ্‌দি বলে নিজের পরিচয় দিতো বলে সবাই রুকনুদ্দীনকে মাহ্‌দি নামেই ডাকতো। জ্ঞানবৃদ্ধ সভাসদেরা এ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় আমার গোচরীভূত করলেন এবং সে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার কাছে উপস্থিত করলেন। তারপর তাকে যখন আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হলো, আমি তার বিরুদ্ধে আনীত ভ্রান্তিমূলক কার্যকলাপ ও নষ্টামির অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলাম এবং ধর্মদ্রোহিতা ও পথচ্যুতির অপরাধে

তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। ইসলামের আশ্রিত জনসাধারণের মধ্যে জঘন্য ও অত্যন্ত ক্ষতিকর ভাবধারা ছড়ানোর জন্যে আইনবিদরা তাকে ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী বলে মৃত্যুদণ্ডই তার যথাযোগ্য শাস্তি বলে ঘোষণা করলেন। তাঁরা আরো বললেন, অবিলম্বে এসব লোকদের দমন না করা হলে এরা মহামারীর মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং বহু মুসলমান প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। একটা বিদ্রোহ (ধর্মের বিরুদ্ধে) এর ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে ; এবং তাতে বহু লোকের নরকগামী হতে হবে। আমি তখন তার (রুকনুদ্দীন) বিদ্রোহ ও নষ্টামির সমস্ত কথা সব সমাজের জ্ঞানী মানুষের কাছে এবং ছোট-বড় সকলের কাছে প্রকাশ করে দেবার জন্যে এক আদেশ জারী করলাম এবং ধর্মীয় অনুশাসনে সুপণ্ডিত আইনবিদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি-বিধানের হুকুম দিলাম। তার কয়েকজন সমর্থক ও শিষ্যসহ ঐ অপরাধীকে হত্যা করা হলো এবং একদল লোক ছুটে এসে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো, তার হাড়গুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এইভাবে তার অধার্মিকতার প্রতিরোধ করা হয়েছিল। ঈশ্বরের করুণায় এবং অনুগ্রহে আমার মত ক্ষুদ্র জীব নিযুক্ত হয়েছিল এই ধরনের নষ্টামি ও ধর্মবিরোধিতার উচ্ছেদসাধনে এবং এইভাবেই আমাকে দিয়ে সত্যধর্ম পুনঃস্থাপিত হলো। মহান ও গৌরবদীপ্ত ঈশ্বরেরই সব কৃতিত্ব, তাঁকে ধন্যবাদ !' খোদার ধর্মে আস্থাশীল ও কল্যাণকামী প্রত্যেকটি কাজই ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে করিয়েছেন এবং সে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারায় ঈশ্বর তাঁকে পুরস্কৃত করলেন, এই গভীর বিশ্বাস ফিরোজের আত্মজীবনীর পাতায়-পাতায় প্রতিধ্বনিত।

ইসলামের নির্দেশ যাতে মুসলমান সমাজে লঙ্ঘিত না হতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন সুলতান ফিরোজ শাহ্‌। ইসলামী রীতি-বহির্ভূত কার্য-কলাপ প্রশ্রয় পেয়ে এক সময়ে সমাজের ভেতর যে অনাচার প্রবেশ করেছিল তিনি তা কিভাবে দূর করেছিলেন আত্মজীবনীতে ফিরোজ তারও বিবরণ রেখেছেন।

সে বিবরণে রয়েছে, 'মুসলমান শহরগুলিতে ইসলাম আইন-বিরোধী এক রীতি ও প্রথা চালু হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন পবিত্র দিনে মহিলাগণ পাল্কি, গরুর গাড়ি বা ডুলিতে করে কিম্বা ঘোড়ায় বা খচ্চরে চড়ে, অথবা পায়ে হেঁটেই শহরের বাইরে কবরখানায় চলে যেতো। অসচ্চরিত্র লোকেরা এবং বল্গাহীন কামার্ত জন ও শিথিল অভ্যাসের মানুষেরা এসকল সুযোগ গ্রহণ করতো এবং তার পরিণতিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও

বেঁধে যেতো। আমি তাই এক আদেশ জারী করে জানিয়ে দিলাম, যদি কোনো নারী অতঃপর কবরখানায় যায় তা' হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ, কোনো মহিলা বা সম্মানিত মুসলমান নারী তীর্থপুণ্যাভিলাষে আর কবরখানায় যেতে পারেন না। ঐ প্রথা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।'

এভাবেই ফিরোজ শাহ্‌ সমাজশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শাসনকাল যাতে ইসলাম নির্দেশিত ধর্মীয় শাসনের যুগ বলে ভারত ইতিহাসে লিখিত থাকে সেভাবেই তিনি তাঁর সমস্ত কার্যবিধি নির্ধারণ করতেন এবং নিজে তিনি সে ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন তাঁর আত্মকথায় তথা তাঁর শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে।

মূর্তিপূজারীদের প্রতি সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলককে যে অনেক সময় নির্মম হতে হয়েছে সেখানে তিনি যেন অসহায়! মানবিক বিচারে সে-সব অসমর্থনীয় হলেও ইসলামের নির্দেশ তাঁকে যে পালন করতেই হবে! বর্ণে বর্ণে পালন করতে হবে—তিনি যে খোদার সেবক! ইসলামের মতে পৌত্তলিকতা অধর্ম, সর্বপ্রকার অধর্ম থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যেই ঈশ্বর তাঁকে নিযুক্ত করেছেন—সেই বিশ্বাস থেকেই এই সুলতান প্রজাকল্যাণে আত্মনিবেদিত হয়েও এমন সব কাজ করেছেন যা তাঁর প্রজাবর্গের অধিকাংশকে মর্মাহত করেছে, মুহ্যমান করেছে। সে-সব মর্মান্তিক কাহিনীর কিছু অংশ তাঁর লেখা থেকেই এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

ফিরোজ আত্মকথায় লিখেছেন, 'হিন্দুরা এবং অন্যান্য মূর্তিপূজারীরা তাদের সহ্য করা হতো বলে জর্-ই জিম্মিয়া খাতে অর্থ দানে এবং তারা যে স্বজন-পরিজনসহ নিরাপত্তা ভোগ করতো তার বিনিময়ে জিজিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। এসব লোকেরাই এখন পয়গম্বরের আইনের বিরুদ্ধে শহরে এবং শহরতলীতে মূর্তিপূজার নতুন নতুন মন্দির গড়ে তুলেছে, অথচ পয়গম্বরের আইনের ঘোষণা এই যে, এসব মন্দিরকে সহ্য করা হবে না। ঈশ্বরের নির্দেশে আমি চারদিকের সমুদয় মন্দির-ভবন ধ্বংস করে ফেললাম এবং যেসব পৌত্তলিক নেতা অন্যদের ভুলপথে পরিচালিত করছিল তাদের আমি হত্যা করলাম আর বাদবাকী সাধারণ লোকদের বেত্রাঘাত ও তিরস্কারে জর্জরিত করে সম্পূর্ণভাবে এই অপকর্মের অবসান ঘটালাম।'

এ সম্পর্কে ফিরোজ শাহ্‌ নির্দিষ্ট কয়েকটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মকথায়। মালুহ্‌ নামক গ্রামের এক পুকুরের পারে হিন্দুরা কয়েকটি

মন্দির তৈরী করে নিয়েছিল। বছরের কতগুলি নির্দিষ্ট দিনে হিন্দুরা সেখানে ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে উপস্থিত হতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তাদের স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো পাল্‌কিতে এবং গরুর গাড়িতে। এভাবে হাজার হাজার লোক মিলিত হয়ে তারা প্রতিমা-পূজা করতো। এই অন্যায় অনেককাল ধরেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল, তা বন্ধ করার দিকে কোনো নজরই দেওয়া হয়নি। তাই এই ঔদাসীন্যের ফলে বাজারের ব্যবসায়ীরা গিয়ে সেখানে দোকানপাঠ সাজিয়ে বসতো, বেচাকেনা করতো। এমনকি লোভী অপদার্থ কিছু মুসলমান নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে সেই সব মেলায় গিয়ে অংশ গ্রহণ করতো। এই খবর পেয়ে সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ একবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। চিরতরে ইসলাম-বিরোধী ঐসব কলঙ্ক ও অপকর্ম বন্ধ করে দেবার জন্যে। সেখানে গিয়ে তিনি কি করলেন? তাঁর নিজের কথাতেই সে উত্তর দেওয়া যাক। তিনি বলছেন, 'এই লোকদের যারা নেতৃস্থানীয় এবং এ সকল ঘৃণ্যকাজের যারা উদ্যোক্তা আমি তাদের হত্যার আদেশ ঘোষণা করলাম। হিন্দুমাত্রেই যাতে কঠিন শাস্তি দেওয়া না হয় আমি সেরূপ নিষেধাজ্ঞাও জারী করলাম, তবে মূর্তিপূজার মন্দিরগুলি আমি বিনষ্ট করে ফেললাম এবং সেসব জায়গায় এক একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলাম।'

স্বয়ং সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তুঘলিকপুর এবং সালারপুর নামক নগর দু'টিতে এক সময়ে পৌত্তলিকদের মূর্তিপূজার আড্ডা ছিল বলে ফিরোজ শাহ্‌ উল্লেখ করেছেন, তবে এই জন্যে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, ঐ দুই শহরেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইসলামে বিশ্বাসীদের প্রাধান্য ঘটেছে।

সাহিল্‌পুর গ্রামে একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরোজ শাহ্‌ সেই মন্দির ধ্বংস করার জন্যে এবং সেই গ্রামের অধিবাসীরা আর যেন ঐরূপ ভুল না করে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করার জন্যে সেখানে তাঁর লোকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কোহানা নামক আরেক গ্রামের একদল হিন্দুও নতুন একটি মন্দির নির্মাণ করে পূজানুষ্ঠানে সেখানে মিলিত হতো। একবার তাদের সকলকে ধরে নিয়ে গিয়ে সুলতানের কাছে হাজির করা হলে তিনি আদেশ দিলেন, 'এই ঘৃণ্য ও অসৎকর্মের নায়কদের আচরণের কথা প্রকাশ্যে সকলকে জানিয়ে দিতে হবে এবং রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সামনে তাদের হত্যা করা হবে। আমি আরো আদেশ দিলাম যে, পৌত্তলিকদের সমস্ত বইপত্র, মূর্তি এবং পূজার বাসন-কোসন প্রভৃতি যা কিছু তাদের সঙ্গে

আটক করে নিয়ে আসা হয়েছিল তার সবই লোকসমক্ষে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হবে। ভয় দেখিয়ে এবং শাস্তি দিয়ে বাকী সকলকে এমনভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যাতে মুসলমানদের দেশে কোনো জিম্মি অনুরূপ অপরাধমূলক আচার-আচরণ আর অনুসরণ করতে না পারেন।'

রাজকীয় ও সামাজিক রীতি-নীতিরও অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহ্। সে সম্পর্কে তাঁর আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, পূর্বেকার শাসকদের আমলে রাজকীয় টেবিলে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহৃত হতো, তরবারির বেল্ট ও খাপ স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্যখচিত হতো। ফিরোজ সে-সব নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের অস্ত্রাদি ব্যবহারের সব উপাদান হাড়ের তৈরী হবে এবং একমাত্র ধর্মীয় আইনানুমোদিত পান-ভোজন পাত্রাদিই ব্যবহার করা চলবে, এইরূপ আদেশ তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

পোষাক-পরিচ্ছদে, তৈজসপত্রে থালা-বাটি-গ্লাসে, চেয়ারে, তাঁবুতে, মশারিতে এবং প্রাসাদের দরজা-জানালায় ও দেয়াল অলঙ্করণ ও অঙ্কণের পূর্বরীতিও ফিরোজ শাহ্‌র আমলে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। প্রাসাদের দেয়াল ও দরজায় অঙ্কিত আকৃতি ও প্রকৃতির সমস্ত ছবি তিনি মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র আইন-সম্মত জিনিষপত্রই তৈরী করা চলবে, এই ছিল তাঁর কঠোর আদেশ।

আগে পদস্থ লোকেরা সোনার বুটি তোলা রেশমী পোষাকই পরতেন। দেখতে সেগুলি খুব সুন্দরই লাগতো, কিন্তু তেমন পোষাক পরিধান ছিল আইন-বিরোধী। তাই পয়গম্বরের বিধান-সম্মত নয় এমন পোষাক ফিরোজ শাহ্ তাঁর রাজ্যে নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং এমন এক আদেশ জারী করলেন যে, কারো পোষাকেই চার ইঞ্চির বেশী জায়গা জুড়ে সোনার বুটি তোলা বা এমব্রয়ডারি করা চলবে না। মোটকথা যা-কিছু ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধী তেমন সমস্ত কিছুই তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং তেমন কিছুর ব্যবহার দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এরপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ফিরোজ শাহ্ রাজ্যের নানাস্থানে মসজিদ, বিদ্যালয়, আর ফকির-দরবেশ ও জ্ঞানী বিশ্বাসীদের ভজনার জন্যে আশ্রয় ভবন নির্মাণ করে এবং খাল খনন, বৃক্ষ রোপণ ও আইনসঙ্গতভাবে জমিদান ইত্যাদির মাধ্যমে যেসব সদকর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন তার এক ফিরিস্তি দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। পুরাতন রাজা ও রাজন্যবর্গের বহু ভগ্ন-জীর্ণ স্মৃতিসৌধ তিনি যে মেরামত করিয়েছেন, পুনর্গঠন করেছেন, তাঁর আদেশে অনেক পুরণো দীঘি

দিল্লীর দুর্গ-প্রাচীর সমূহ যে পুনঃ সংস্কৃত হয়েছে, সে-সবেরও উল্লেখ রয়েছে সেখানে। তারপর তিনি সেখানে বর্ণনা রেখেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারু-শ সিফা'র অর্থাৎ হাসপাতালটির যেখানে সকল শ্রেণীর রোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এসবই হলো সুলতানের সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজ এবং সমাজ কল্যাণ সাধনে তিনি সর্বদাই ছিলেন তৎপর, তবে সে-সব কাজেও তিনি শরিয়ৎ-এর বিধি অনুসারেই পরিচালিত হতেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র শাসনকালে অমুসলমানদের কিভাবে ইসলাম ধর্মগ্রহণে আকর্ষণ করা হতো ফিরোজের রচনা থেকেই তা' জানতে পারা যায়। তিনি লিখেছেন, 'সুলতান মহম্মদ শাহ্‌র আমলে যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যাদের হাত-পা ও নাক-কান কাটা হয়েছিল, চোখ উপ্‌ড়ে ফেলা হয়েছিল, খোদাতালার মতলবে আমি তাদের উত্তরাধিকারীদের উপহারাদি দিয়ে শান্ত করার ব্যবস্থা করলাম।'

তারপরে কী করলেন ফিরোজ শাহ্‌? 'ঈশ্বরের নির্দেশে আমি আরেকটি কাজ করলাম—আগের আমলে সমস্ত গ্রাম, জমি আর প্রাচীন পৈত্রিক সম্পত্তির মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্বে আনা হয়েছিল। আমি সে-সব ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম।'

তারপর? এ প্রশ্নের উত্তরও সুলতানের বাচনেই দেওয়া যাক। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার পৌত্তলিক প্রজাদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছি এবং এরূপ ঘোষণা করেছি যে, মুসলমান হলেই জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। ঘোষণাটি বহু লোকের কানে গিয়েছিল এবং তার ফলে দিনের পর দিন দূর-দূরান্তের বহু হিন্দুই ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদের সকলকেই জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং নানাভাবে তাদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়েছে।'

ইসলাম ধর্মের বিচারে সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ ছিলেন এক পরম ধর্মপ্রাণ শাসক। খাঁটি মুসলমানকে হতে হবে নির্লোভ। ফিরোজও ছিলেন তেমনি নির্লোভ মানুষ, নিজেকে প্রজাকুলের রক্ষক এবং ঈশ্বর ও দরিদ্রের সেবক বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর আত্ম-জীবনীতেও সে কথাই রয়েছে। তিনি সেখানে লিখেছেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় আমার রাজত্বকালে তাঁর সেবকদের জমিজমা ও সম্পত্তি সুরক্ষিত আছে। আমি কারও এককণা সম্পদও ছিনিয়ে নিতে দিই-নি।' তারপরে দুঃখী-দরিদ্রের সেবা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'যখনি আমি কোনো ফকির বা সংসারত্যাগী উপাসকের কথা শুনতে পেয়েছি আমি নিজে

তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সমস্ত প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হয়েছি দরিদ্রজনের সাহায্যকারীর প্রাপ্য সর্বপ্রকার আশীর্বাদ লাভের আশায়।'

সংসার-জীবন কাটিয়ে প্রত্যেকেরই উচিত পরবর্তী জীবনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং পূর্বকৃত ধর্মবিরোধী সমস্ত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, একজন খাঁটি মুসলমানের মতোই ফিরোজ শাহ্ এই উপদেশ-বাণীটি রেখে দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীতে এবং ইসলামের একান্ত সেবক ও নেতারূপে তিনি যে পয়গম্বরের প্রতিনিধি খলিফার কাছ থেকে খিলাফৎ-প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ 'সঈতুস সালাতিন' উপাধিসহ রাজপোষাক, পতাকা অঙ্গুরীয় এবং পদ-চিহ্নযুক্ত সম্মানিত চাপরাস উপহার পেয়েছিলেন তারও সগৌরব উল্লেখ রয়েছে সেখানে।

আত্মজীবনীর উপসংহারে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ফিরোজ শাহ্ লিখেছেন, 'যত যত আশীর্বাদ যিনি আমার ওপর বর্ষণ করেছেন সকল করুণার আধার সেই ভগবানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্যেই আমার এই গ্রন্থ রচনা। দ্বিতীয়ত যে সব মানুষ সৎ এবং সম্পন্ন হতে ইচ্ছা করে, কোনটি তার যথার্থ পথ এ-বইটি পড়ে তা জানা যাবে। এই সংক্ষিপ্ত সূত্রটি অনুসরণ করেই ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করা যায়। মানুষের বিচার হবে তাদের কাজের ওপর, এবং তারা পুরস্কৃত হবে যে যতটুকু কল্যাণকর কাজ করেছে সেই বিবেচনায়।'

এই সূত্রকে অবলম্বন করেই নিজেও চলেছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহ্ এবং প্রধানত সে জন্যেই মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে তিনি 'শ্রেষ্ঠ মুসলমান শাসক'। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকবর্গ যে মতই ব্যক্ত করুন না কেন, নিরপেক্ষ বিচারে সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব কতদূর স্বীকার্য তা বিবেচনা সাপেক্ষ। তা সত্ত্বেও ফিরোজ শাহ্‌র আত্মকথা তথা তার শাসন কথা সমাজ-ইতিহাসের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে পাঠান যুগে শাসকের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজের অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। পাঠান শাসনে ঠিক অনুরূপ আত্মচরিতমূলক আর কোনো দলিলের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কবিকঙ্কণের কালের কথা

চারশ' বছর আগেও যেমন সমাজ-বিরোধীদের উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো, ব্যবসায়ী-দোকানদারদের ওপর জোর-জুলুম করে টাকা লুঠপাট করা হতো, অসৎ লোকেরা বে-আইনী টাকায় বাড়ির পর বাড়ির মালিক হতো কিন্তু খাজনা দিতো না, এক শ্রেণীর ক্ষমতাশালী ধনী-পুত্রদের যন্ত্রণায় যেমন বৌ-ঝিরা ঘরের বার হতে সাহস পেতো না এবং সরকার মানী লোককেও এমনভাবে বন্দী করে রাখতো যাকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হতো না, আজও কি আমরা প্রায় অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই বাস করছি না? মধ্যস্বত্বভোগীদের ও ভাঁড়ুদত্তের মতো শঠ-প্রতারকদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এখনো সুদূর পরাহত বলেই মনে হয়। আজকের অবস্থার সঙ্গে চারশ' বছর আগের সমাজ-রূপের তুলনা করে দেখবার জন্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আত্মকথা ও সমাজ-বর্ণনা নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে কয়খানি মঙ্গলকাব্য প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্তত দু'খানির রচয়িতা নিজ নিজ কাব্যে তাঁদের যে আত্মপরিচয় রেখেছেন তার ভিত্তিতে তাঁদের কালের সামাজিক রীতি-নীতিরও আমরা কিছুটা পরিচয় পাই। তার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের কাব্য-বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে সমকালীন সমাজরূপ আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদিও 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ও 'বাংলার লোক সাহিত্য' প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মঙ্গল কাব্যের ভাবগত লক্ষণটি ধর্মীয় (Sectarian); বিশেষ এক সম্প্রদায়ের আরাধ্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার পূজা-প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করাই ইহার লক্ষ্য;······সেই জন্য মঙ্গলকাব্যকে ব্যাপক ভাবে উদ্দেশ্যমূলক ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে—' তা হলেও এ তো অনস্বীকার্য যে, ধর্ম সমাজ-বহির্ভূত কোনো বিষয় নয় বরং সমাজরূপ প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম। তাই ধর্মীয় সাহিত্য হলেও 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' রচয়িতা কবি মুকুন্দরাম এবং 'অন্নদামঙ্গল' প্রণেতা কবি ভারতচন্দ্রের কালের অর্থাৎ প্রায় তিন শতকের সমাজ পরিবেশ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে কবিদ্বয়ের আত্মকথা ও কাব্যকথার পটভূমিকায়।

ষোড়শ শতকের বাঙালী কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে বর্ধমান ত্যাগ করে হৃদয় মিশ্রের এই কবি-পুত্র মেদিনীপুর জেলার আড়রার রাজা বাঁকুড়া দেবের আশ্রয় নেন এবং রাজকুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেখানে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করে রাজা বাঁকুড়া দেবের কাছ থেকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। সেই থেকেই তাঁর রচিত চণ্ডীকাব্য 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

মুকুন্দরাম তাঁর 'গ্রন্থ (চণ্ডীকাব্য) উৎপত্তির কারণ' বর্ণনা প্রসঙ্গে আত্মপরিচয় যেমন রেখেছেন সমাজের রূপও তেমনি অনেকখানি তুলে ধরেছেন। প্রথমেই তিনি 'এই গীত হইল যেন মতে' তা বলে নিয়েছেন—

উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥

এরপর জন্মগ্রাম দামুন্যা (বর্ধমান) ছেড়ে মেদিনীপুরের' আড়রায় যাবার সময়ে পথে চণ্ডীর দর্শন লাভ করেন মুকুন্দরাম। সে তথ্য বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন—

দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশন ॥

এই যাত্রা পথে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল কবিকে। একের পর এক নদী গোড়াই (গড়াই), দারুকেশ্বর, দামোদর পেরিয়ে কুচট্যা নগরের (গ্রাম?) পর এক আশ্রমে এসে কবি স্বপ্নে যে দেবী চণ্ডীর দর্শন লাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥

এরপর মুকুন্দরাম আর কালক্ষেপ করলেন না। অবিলম্বে তখন কবি-চক্রবর্তী

হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥

অতঃপর কবি সঙ্গীত রচনার আজ্ঞাই পেয়ে গেলেন দেবী চণ্ডীর কাছ থেকে।

দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইল উপনীত।

আড়রায় উপনীত হবার পর কবি মুকুন্দরাম সেখানে যে রাজ-অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন এবং কি ভাবে সেখানে রাজপুত্র রঘুনাথকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি কেমন করে 'শ্রীকবিকঙ্কণ' উপাধি ভূষিত হয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়ে তাঁর চণ্ডীকাব্য 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' বর্ণনা শেষ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন—

আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিণু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাপি দিল ধান ॥
সুধণ্য বাঁকুড়া-রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাঠে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদ্ভূত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রী কবিকঙ্কণে রসগান ॥

পাঠান্তরে উপরোক্ত শেষ পঙ্‌ক্তিটির পরিবর্তে দেখা যায়—

মুকুন্দ রচিত পুঁথি শুনি সুখে নরপতি
খ্যাতি দিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

কবি মুকুন্দরামের আত্মকথা বর্ণনার যে অংশগুলি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, বাস্তবিকই 'বিশেষ এক সম্প্রদায়ের আরাধ্য আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার পূজা-প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করাই ইহার লক্ষ্য' এবং বর্তমান ক্ষেত্রে দেশে ব্যাপকভাবে চণ্ডীপূজা প্রচলনে চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশেই মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' কাব্য (১৫৭৭) রচনা। তাঁর সমসাময়িক কবি দ্বিজমাধব বা মাধবানন্দও প্রায় একই সময়ে অপর একখানি চণ্ডীকাব্য প্রণয়নে উদ্যোগী হন (১৫৭৮)। এখানে অবশ্য

'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' ও তার গ্রন্থকারের আত্মকথার পশ্চাৎপটেই সে সময়ের সামাজিক অবস্থার বিষয় আমাদের আলোচ্য।

'কবির শিয়র দেশে' চণ্ডিকা দেবী আচম্বিতে এসে বসেছিলেন, বর্ধমানের দামুন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরের আড়রায় যাবার পথে চণ্ডী দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন কবি এবং সর্বশেষে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন চণ্ডী-কাব্যগীতি রচনার। গ্রন্থ রচনার এই কারণটুকু বলতে গিয়ে মুকুন্দরাম নিজের কথা যেমন অনেকখানি বলেছেন তেমনি সমকালীন সমাজের কথাও কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। সেখানেই আমরা পাই—

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন-রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥
উজির হলো রায় জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥

কবির আত্ম-কথনের এই অংশটুকুর মধ্যেই আমরা তখনকার সামাজিক অবস্থার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। এ বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, ছয়-সাত পুরুষ ধরেই মুকুন্দরামেরা নিয়োগী জমিদারদের (তাঁর সময়ে 'সজ্জন-রাজ' গোপীনাথ নিয়োগী) দামিন্যা (বা দামুন্যা) তালুকে বাস করে আসছিলেন। চাষ চষে তাঁদের দিনাতিপাত করতে হতো, এই কথাটি প্রকাশ পেয়েছে কবির আত্ম-কথনে। এ থেকেই ধরে নেওয়া যায়, মুকুন্দরাম ছিলেন দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের সন্তান এবং চাষবাসের ওপর নির্ভর করেই তাঁদের চলতো। সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই 'কুলে শীলে নিরবধ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য দামিন্যাটি সজ্জন-প্রধান' গ্রামে রত্নাহু নদের কূলে—

গঙ্গাসম সুনির্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।

সেই ত পুণ্যের ফলে　　　　কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে ॥

যে জন্মগ্রামের বন্দনা-গান গাইতে 'শিশু কাল' থেকেই কবি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সেই 'বিশেষ পুণ্যের ধাম' দামিন্যা (বা দামুন্যা) ছেড়ে যেতে হলো কেন তাঁকে, তার প্রত্যক্ষ কারণ উল্লেখ না থাকলেও কবিকঙ্কন তাঁর আত্মকথায় সে সময়ে সাধারণ মানুষের ওপর লাঞ্ছনার যে সমস্ত বিবরণ দিয়েছেন স্বগ্রাম ত্যাগের তাও কারণ হতে পারে।

সেটা গৌড়-বঙ্গ-উৎকলাধিপ রাজা মানসিংহের কাল বলে মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, প্রজাদের পাপের ফলেই মামুদ সরিফ-এর মতো ডিহিদারের (প্রধান কাছারীর কর্তা) এবং নিয়োগী-চৌধুরী প্রমুখ অত্যাচারী মধ্যস্বত্ব ভোগীদের নিপীড়ন প্রজাবর্গকে সহ্য করতে হচ্ছে। অত্যাচার তখন এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, গরীবের কাতর প্রার্থনায় কোনো ফলই হতো না। এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যে তখন অচল অবস্থা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের ওপরেও তখন শত্রুর মতো আচরণ করা হচ্ছিল। প্রতারণা যে কোন পর্যায়ে গিয়েছিল তার একটি বড়ো প্রমাণ, মাপে চুরি করে পনেরো কাঠার জমিকে এক কুড়বা (কুড়া, বিঘা) বলে চালিয়ে দেওয়া হতো কুড়ি কাঠার পরিবর্তে। ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের মতো আজো এদেশের কত লোককেই না নিদারুণ দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়!

সে কালের পরিস্থিতি যে কিরূপ দাঁড়িয়েছিল তার আরো পরিচয় দিয়েছেন মুকুন্দরাম তাঁর আত্মকথায়। তিনি জানিয়েছেন—

সরকার হইল কাল　　　　খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম　　　　টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ　　　　কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী　　　　বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সবার কাছে　　　　প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি　　　　বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।

কি রকম অবস্থা দেখা দিলে সরকারকে কালের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে? অকর্ষিত জমি মাত্রই খাস জমি বলে পরিগণিত হতো। পোদ্দার অর্থাৎ মহাজনেরাও যমের মতো ব্যবহার করতো সাধারণের সঙ্গে। টাকা প্রতি আড়াই আনা কম ধরে ধার নিতে হতো তখন এবং সেই ধারের টাকায় যে লাভ হতো তার থেকে প্রতিদিন এক পাই করে লভ্যাংশও পোদ্দারকে দিতে হতো। সম্মানিত লোকদের ধরপাকড় করা হতো এবং তাঁদের মুক্ত করা যেতো না, প্রজারা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে বাড়িতে বাড়িতে পেয়াদা লাগিয়ে দেওয়া হতো। এ রকম অবস্থায় প্রজারা ব্যাকুলিত হয়ে উঠবে বৈকি। আর অভাবের তাড়নায় লোকে যখন বাধ্য হয়ে ঘরের কোদাল-কুড়াল পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছিল এবং টাকা মূল্যের জিনিষ দশ আনায় বেচে দিয়ে দিনাতিপাত করছিল তখন পেয়াদার চোখ এড়িয়ে যে কেউ কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। কবি মুকুন্দরামকেও হয়তো সেই দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার কারণেই গৃহত্যাগী হতে হয়েছিল শান্তিতে কাব্য-সাধনার সুযোগ লাভের জন্যে।

রায়জাদা অর্থাৎ রাজকুমার রাজার মন্ত্রণাদাতা অর্থাৎ মন্ত্রী (উজির) হলে রাজ্যে এধরণের অরাজক অবস্থা দেখা দিতেই পারে, কবির আত্মকথনে তেমনি একটি ইংগিত রয়েছে। কিন্তু কে সেই রায়জাদা যিনি সে সময়ে উজির হয়েছিলেন? এই প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন এই, কবিকঙ্কণ যে মানসিংহের কালের কথা উল্লেখ করেছেন সেই মানসিংহ সম্রাট আকবরের সেনাপতি হয়ে থাকলে এবং তিনিই যদি 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' হয়ে থাকেন তা হলে এই 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' বর্ণনায় তিনি আসেন কি করে? 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' রচিত হয়েছে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে আর রাজা মানসিংহ বাঙলার সুবাদার (গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ) পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন আরো অন্তত বছর দশ পরে এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবে বাঙলা তাঁরই শাসনাধীন ছিল। তবে কি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' রচনা আরম্ভ করে তা শেষ হবার পর বাঙলায় মুঘল শাসন কায়েম হলে গ্রন্থকার 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশটি তাঁর মূল চণ্ডীকাব্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন?

যাইহোক, কবিকঙ্কণের এই আত্মজীবন কাহিনী প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ও অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র প্রথম ভাগের ভূমিকায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

'মুকুন্দরামের আত্মজীবন কাহিনী মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি সনাতন ধারারই অনুবর্তন—প্রত্যেক কবিই গ্রন্থারম্ভে তাঁহার কিঞ্চিৎ বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব-পুরুষ সম্বন্ধে এই একটি বিচ্ছিন্ন তথ্য পাঠককে জানাইয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের হাতে পড়িয়া এই মামুলি আত্মপরিচয় এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, নিজ ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পটভূমিকায় সমগ্র যুগের পরিচয় উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয় বর্ণে দীপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অবিচার-অরাজকতার স্বরূপ-উদ্ঘাটনে কবির কোন তীব্র উষ্মা বা মর্মদাহী জ্বালা প্রকাশ পায় নাই। যে লেখনী সাহায্যে তিনি প্রজাসাধারণের দুর্দশা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তিনি বিদ্রূপের বিস্ফোরক দ্রাবকরসে ডুবান নাই, তাহাকে এক শান্ত, কৌতুকস্মিত বিস্ময়বোধের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই অত্যাচারীদের প্রতি তিনি রক্তচক্ষু অভিশাপ বর্ষণ করেন নাই,······কবি যেন এই নির্মম অত্যাচারের দ্রষ্টা-রূপে গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন যে, এই সুস্থমস্তিষ্ক, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনটা হঠাৎ পাগলামির খেয়ালে পরিণত হইল কি করিয়া?······অত্যাচারের নিপেষণ-যন্ত্রে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে পিষ্ট ও দলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসভঙ্গী বদলায় নাই,······"তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে"—দারিদ্র্যের এই মর্মভেদী অনুভূতি তাঁহার শিল্পজনোচিত প্রশান্তি ও সার্বভৌমতাবোধকে বিচলিত করে নাই।······রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয়-ঝটিকায় উন্মূলিত ও উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত এই কবিসত্তা নিজ ক্ষতি ও সর্বনাশের দিকটা লঘু করিয়া, দেবীর প্রত্যাদেশে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফূরণজনিত আনন্দ, নূতন স্থানে আশ্রয় প্রাপ্তির নিশ্চিন্ত আরাম ও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসকেই মুখ্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।'

কবি মুকুন্দরামের আত্মচরিতের আলোয় তৎকালীন সমাজ চিত্র বিষয়ক আলোচনা এখানেই শেষ করে কবি তাঁর চণ্ডীকাব্যে সে যুগের সমাজের যে রূপ উপস্থাপন করেছেন সেদিকে একবার দৃষ্টি দিতে পারি।

এ সম্পর্কে প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল জাতীয় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই যেমন রয়েছে দেবদেবী ও তীর্থবন্দনা এবং তাতে যেমন স্থান পেয়েছে দেবতাদের স্বর্গলীলার পৌরানিক নানা উপাখ্যান, তেমনি আবার সেই সকল দেবদেবীকেই আমরা দেখতে পাই মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করে চলেছেন। এর সঙ্গে বাঙালী সংসার ও সমাজের এক একটি বাস্তবচিত্র সেখানে

স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রগুলিও হয়ে ওঠে জীবন্ত ও বাস্তব সম্মত।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'তাঁহার কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে সমাজ জীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্মস্পন্দন চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' থেকে সমকালীন সামাজিক প্রচুর উপকরণের মধ্যে সংক্ষেপে কিছুটা এখানে উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে যে এই গ্রন্থখানি কতটা তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। প্রথমত 'ভিখারী ছন্ন ছাড়া আত্ম-ভোলা মহেশ্বরের গৃহিনী ও কার্তিক-গণেশের জননী রূপে তিনি বাঙ্গালী পরিবারের পালিনী-শক্তির আধার মাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেন।' তবে চণ্ডিকা দেবীর আচরণ বা সংলাপাদি নিয়ে এখানে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ ধারা চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম কাব্য 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, সেকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল। অনার্য ব্যাধ ধর্মকেতুর সন্তান হলে কি হবে কালকেতুর জন্মকালীন আচার-অনুষ্ঠান, 'শিশু মধ্যে মোড়ল' ঐ কালকেতুর বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারের যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে তাতে দেখা যায়, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধিবিধানই কার্যকর করা হয়েছে এই ব্যাধ পরিবারের ক্রিয়াকাণ্ডে। কালকেতুর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করার ব্যাপারে এবং বরপণ নির্ধারণে ঘটক নিযুক্ত করা হয়েছিল, কালকেতুর বাবা-মাকে (ধর্মকেতু ও নিদয়া) বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী করে দেওয়া হয়েছিল এবং কাশীতে নিয়মিত খরচও পাঠানো হতো, ইত্যাদি বিষয় থেকে যেমন তখনকার সমাজরূপের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তখনকার বাঙালী সংসারে দুই সতীনের ঝগড়া (ধনপতি নামক বণিকের দুই পত্নী খুল্লনা ও লহনা), লহনার হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয় খুল্লনাকে, শেষে চণ্ডীর পূজা করে তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হয়, ইত্যাদি ঘটনা থেকে তৎকালীন সমাজ পরিবেশও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। সম্ভাবিত সতীনের হাত থেকে আত্মরক্ষায় ফুল্লরার চেষ্টা, সতীধর্মের মর্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত, কালকেতু ফুল্লরার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবন, ভাঁড়ুদত্ত-সোমদত্ত প্রভৃতি শঠ ও প্রতারকদের কার্যকলাপ—তখনকার সমাজের পুরো একটি চিত্রও আমাদের সামনে

উপস্থিত করে। একালের মতো তখনো ব্যবসায়ী-দোকানদারদের ওপর জোরজুলুম করে টাকা আদায় করা হতো, ভাঁড়ুদত্ত বিনা খাজনায় ছয়খানা বাড়ির মালিকও হয়ে গিয়েছিল আজো যেমন অনেককে হতে দেখা যায়। ভাঁড়ুদত্তের ছেলে-মেয়েরাও লুঠে অংশ নিতো। তার পুত্রের যন্ত্রণায় পল্লীর ঝি-বৌরা বেরুতে পারতো না। চূড়ান্ত দারিদ্র্য থেকেও যে মানুষ সাচ্ছন্দ্যের শিখরে উঠতে পারে এবং তার সম্পদ-প্রাচুর্য ঈর্ষার কারণ হয়ে তা যে তাকে বিপদের মুখে নিয়ে যেতে পারে কালকেতুর জীবনই তার প্রমাণ। কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর যুদ্ধে বাঙালীর সামরিক বৃত্তিরও পরিচয় রেখেছেন কবি। এ ছাড়া সে সময়ের সমাজবিন্যাসও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে।

এ বিষয়টিও অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, 'ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গোত্র ও গাঁই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এখন বৃহত্তর কয়েকটি সুপরিচিত গোষ্ঠীতে সংহত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ কবির বিশেষ ঔৎসুক্যের পরিচয় বহন করে—সম্ভবত কায়স্থ কুলতিলক ভাঁড়ু দত্তের মহিমা-রশ্মি সমস্ত জাতির উপরই বিচ্ছুরিত হইয়াছে। কায়স্থের কৌলীন্য-গর্ব ও নেতৃত্বস্পৃহা যেন ব্রাহ্মণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মসীজীবি সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততা প্রথম কায়স্থের মধ্যেই স্ফূর্ত হইয়াছে।'

'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে সে যুগের মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথাই রয়েছে। ভারতে তখন পুরাদমে মুসলমান শাসন চলেছে, কাজেই সে সমাজ তখনকার শ্রেষ্ঠ কবির চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। সে সম্বন্ধে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তিনশত বৎসরেরএকত্রাবস্থানের ফলে মুসলমান জাতি যে বাঙালী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যেও যে ধর্মগত ঐক্যের মধ্যে বৃত্তিগত নানা বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সরস বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে পাই। ......মুসলমানের জীবন যাত্রার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন সত্যানুগ, অন্যদিকে তেমনি সহৃদয়। তাহাদের ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে যে গোঁড়ামির সংমিশ্রণ ছিল তাহা কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নাই··

বড়ই দানিশবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি॥

চণ্ডীর কৃপায় বীর কালকেতু প্রচুর সম্পদশালী হয়ে গুজরাট নামে যে বাস্তবসম্মত একটি নগর প্রতিষ্ঠা করলো সেখানে কলিঙ্গ রাজ্য ছেড়ে দলে-দলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বেনে গোপ নাপিত ধীবর মালী প্রভৃতি নানা জাতির সঙ্গে বহু মুসলমানও এলো। সে প্রসঙ্গ বর্ণনায় কবি বলেছেন—

কলিঙ্গ-নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর বাড়ী
নানা জাতি বীরের নগরে।
পাইয়া বীরের পান বৈসে যত মুসলমান
দিলেন পশ্চিম দিক তারে।

এই সব মুসলমানদের মধ্যে জোলা মুকেরি পিঠারি কাবাড়ি গরসাল হাজাম তীরকর প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগের যে উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম, আজও সেই সব শ্রেণী রয়েছে। সেই সময়কার মুসলমানদের আচার-ব্যবহার নিয়েও 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে যে আলোচনা রয়েছে সে বিষয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'হিন্দুর চক্ষে মুসলমানের আচার-ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতার প্রতি কবি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই—"ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।" বর্তমান কালেও জীবিকার জন্য মুসলমানেরা যে নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে ও বৃত্তি অনুসারে নানা বিচিত্র আখ্যায় আখ্যায়িত হয়, তাহার ভিত্তিপত্তন মুকুন্দ-রামের যুগেই হইয়া থাকিবে। কালকেতুর রাজত্বে দুই প্রতিবেশী সমাজ আপন-আপন বৃত্তি ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া পরম সৌহার্দ্যের সহিত বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কোনো বিরোধের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। হিন্দুরচিত কাব্যে মুসলমানের এই অপক্ষপাত ও সহৃদয় চিত্রণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।'

ব্যাধ কালকেতু যে কাব্যের নায়ক সেখানে পশু শিকারের কাহিনী গুরুত্ব পাবেই, কিন্তু পশুপীড়ন যে অন্যায় এবং তার জন্যে যে শাস্তি প্রাপ্য কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত কালকেতুর বন্দিত্বেই তা প্রমাণিত। চণ্ডী বন্দীদশা থেকে তাকে মুক্ত করতে এসে সে কথাই বলেছিলেন—

শুন পুত্র কালকেতু পশুগণ-বধহেতু
আছিল তোমার গুরু পাপ।
নাশ গেল এতকালে রাজার বন্ধন-শালে
মনে না করিহ পরিতাপ।

'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে এমন সহানুভূতির তুলিকায় সেকালের সমাজচিত্রকে আঁকা হয়েছে যাতে তার রচয়িতাকে আধুনিক কোনো দরদী কবি-নায়কের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

কবি ভারতচন্দ্রের কালের কথা

ষোড়শ শতাব্দীর পরে আমরা চলে আসছি আরো এক শতাব্দীর অধিককাল অতিক্রম করে অষ্টাদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। এখানেও সুযোগ রয়েছে আর একটি উল্লেখযোগ্য মঙ্গল-কাব্যের রচয়িতার আত্মকথার ও তাঁর কাব্যে বর্ণিত নানা কথার পটভূমিকায় তৎকালীন সমাজের একটি যথার্থ চিত্র তুলে ধরার। এখানে কবি ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'গ্রন্থ সূচনায়' ও 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে' কবির যে আত্মকথা ও সমাজ-বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে তা 'আত্মচরিতে সমাজচিত্র' সিরিজের 'ভারতখণ্ড, প্রথম পর্বে' নিঃসন্দেহে অবশ্য আলোচ্য। বিশেষ করে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে যখন ভারতচন্দ্রকে 'অন্নদামঙ্গল রচনা করতে হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পদ্ধতি অনুসরণে তখন কবিকঙ্কণের পরেই রায় গুণাকরের কালের সমাজ-পরিবেশ নিয়ে আলোচনাটা হবে খুবই যুক্তিযুক্ত।

রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেই নিজের আত্ম-পরিচয় রেখেছেন। তাঁর 'সত্যপীরের ব্রতকথা' থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রের সন্তান। ভূপতি রায়ের বংশধর, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 'ভুরস্থট' (ভুরশিট) পরগণার বড়ো জমিদার নরেন্দ্র রায়ের (মুখোপাধ্যায়) কনিষ্ঠ অর্থাৎ চতুর্থ পুত্র ভারতচন্দ্র রায় সাংসারিক বিপর্যয়ের ফলে ভুরস্থট পরগণার 'পেঁড়ো'র বাস ছেড়ে হুগলী জেলার দেবানন্দপুরের কায়স্থ জমিদার রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে এসে বাস করতে থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় পূর্বে পারদর্শী হয়ে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে এসে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। 'সত্যপীরের ব্রতকথা'য় আত্মপরিচয়ে তিনি লিখেছেন—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হত কংস,
ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত, ফুলের মুকুটি খ্যাত
দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম,
রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়
পড়াইল পারসী।

নরেন্দ্র-সুত সেই ভারতচন্দ্র রায় সাংসারিক দুর্বিপাকে পড়ে কিভাবে প্রথমে মণ্ডলঘাট পরগণার নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে থেকে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েসের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষালাভের পর নিকটবর্তী সারদা গ্রামের এক আচার্য-কন্যাকে বিয়ে করে শেষটায় বাধ্য হয়েছিলেন দেবানন্দপুরে পালিয়ে যেতে। সেখানে থেকে কিভাবে তাঁর কবি-জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল, সংক্ষিপ্ত হলেও তার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ আমরা পাই 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থ থেকে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগের ভূমিকায় ঐ জীবন বৃত্তান্ত থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা থেকেই জানা যায়, বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায় যখন সামান্য শিশু, সেই সময় তাঁর জননী মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর বিবাদের ফলে ভুরস্ুটের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে স্বরাজ্য থেকে উৎখাত হতে হয়েছিল। শেষ অবধি নরেন্দ্র-পরিবারের মহিলাদের প্রতি করুণাবশত ঐ মহারানী তাঁদের পারিবারিক বসতি 'পেঁড়োর গড়' গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যানাদিসহ ফিরিয়ে দিয়ে বর্ধমানে চলে এলেও সেই গোলমালের সময়েই ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে গিয়ে কয়েক বছর থাকেন এবং সেখান থেকে দেবানন্দপুরে চলে যান যেখানে তিনি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাভ্যাস ও কাব্যরচনায় নিমগ্ন হন। প্রকাশ, রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়দের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন হলে বিদ্বান বলে ভারতচন্দ্রের ওপর পুঁথি পাঠের ভার পড়ে। পুঁথি নিয়ে আসার জন্যে একজনের ওপর হুকুম হলে ভারতচন্দ্র বলে ওঠেন, 'আমার নিকটেই পুস্তক আছে, পূজা আরম্ভ হউক ; আমি বাসা হইতে পুঁতি (পুঁথি) আনিয়া এখনি পাঠ করিব।' এই বলে বাসায় চলে যান এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণ অনুযায়ী 'তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁতি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন, ..গ্রন্থের সর্বশেষে ভারতের নামের 'ভণিতা' এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে' চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

গুপ্ত কবির মতে এই সত্যপীরের ব্রতকথা (ত্রিপদী) রচনাকালে 'ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।' এই বয়স নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। কবি ভারতচন্দ্র একখানি ত্রিপদীতে এবং আরেকখানি চৌপদীতে মোট দু'খানি 'সত্যপীরের ব্রতকথা' রচনা করেছিলেন এবং দু'খানিই বোধহয় দেবানন্দপুরে থাকার সময়েই রচিত হয়েছিল।

সে যাই হোক, কৃতবিদ্য ভারতচন্দ্র বছর কুড়ি বয়সে বাবা-মা ও জ্যেষ্ঠ ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে গেলে জানতে পারেন যে, পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ বর্ধমানেশ্বরের নিকট থেকে কিছু জমি ইজারা নিয়েছেন। ভাইদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে যোগ্যতম হিসাবে দাদারা ভারতচন্দ্রকেই এই বিষয়ের তদারক করতে এবং রাজস্বাদি দেবার ব্যবস্থাদি করতে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি গোলমালে পড়ে যান। নির্দিষ্ট দিনে কর না দেওয়ায় নরেন্দ্রনারায়ণের ইজারার জমি খাসভুক্ত করে নেওয়া হয় এবং তার প্রতিবাদ করায় ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। কারাধ্যক্ষের সঙ্গে ভাব থাকায় তিনি অবশ্য কবিকে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে অব্যাহতি দেন এবং একটি মাত্র ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী কটকে এসে সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আশ্রয়দাতার আজ্ঞায় সবিশেষ সম্মানে কিছুকাল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানের সুযোগ লাভ করেন। শঙ্করাচার্যের মঠে গেরুয়াধারী বৈষ্ণববেশে থাকাকালে একদিন অন্যান্য বৈষ্ণবরা তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনধাম দর্শনে যাত্রায় উদ্যোগী হলে তিনি তাঁদের সঙ্গী হয়ে পদব্রজে যাত্রা করেন এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরে এসে উপস্থিত হলে তাঁর ভৃত্য রঘুনাথ গোপনে ভারতচন্দ্রের ভায়রা ভাইকে জানিয়ে দিয়ে এলে তাঁরা এসে গোপীনাথজীর মন্দিরের কীর্তন শেষ হতেই সেখানে থেকে তাঁকে বাটিতে নিয়ে এসে কবির বৈষ্ণব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেন। অবশ্য তিনি স্বোপার্জনে সমর্থ হতে না পারা পর্যন্ত নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে চাইলেন না এবং নিকটবর্তী সারদা গ্রামে গিয়ে স্বীয় শ্বশুরকেও বলে এলেন যে, যতদিন তিনি নিজ অর্থে বাড়ি নির্মাণ করতে না পারছেন ততদিন যেন তাঁর স্ত্রীকে পিত্রালয়েই রাখা হয়। সেখান থেকে কবি ফরাসডাঙ্গায় ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ পালধি চৌধুরীর আশ্রয়ে থেকে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাহায্যে তাঁরই বন্ধু নবদ্বীপাধিপতি গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হলে মহারাজা তাঁকে কৃষ্ণনগরে চল্লিশ টাকা বেতনের একটি কাজে নিযুক্ত করে দিলেন এবং এমন স্থানে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন যেখান থেকে তিনি প্রতিদিন সকালে-বিকেলে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় ভারতচন্দ্র মাঝে মাঝে তাঁর রচিত দু'একটি কবিতা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিতেন। মহারাজা সে সব কবিতা পাঠে মুগ্ধ হন বটে এবং তাঁকে সভাসদ করে নিয়ে 'রায়গুণাকর' উপাধিও দেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র যাতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডী'র মতো 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন মহারাজা সেরূপ নির্দেশ দিলে তিনি সে গ্রন্থ লেখা আরম্ভ করেন।

এ গ্রন্থ রচনা আরম্ভ না করে উপায় কি? শুধু তো রাজাদেশ নয়, এ যে অন্নদা মায়েরও আজ্ঞা—

স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বেলায়ও এমনি অবস্থাই ঘটেছিল। অন্নদামায়ের মতোই চণ্ডিকা দেবীও 'উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে' আচম্বিতে এসে বসেছিলেন এবং শেষে 'আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীতে'। মঙ্গলকাব্যের রীতিই এই।

রাজা বাঁকুড়া রায়ের অনুগ্রহে মুকুন্দরাম যেমন চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত ভারতচন্দ্রও তেমনি 'অন্নদা-মঙ্গল' লিখেছিলেন। মা অন্নদা অন্নপূর্ণার নির্দেশেই মহারাজা এই মঙ্গলকাব্যটি লিখিয়েছিলেন। কবি প্রায় গ্রন্থারম্ভেই তার বর্ণনা রেখেছেন—

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর॥

'অন্নদামঙ্গল' রচনা প্রসঙ্গে কবি গ্রন্থারম্ভে আরো বলেছেন, সত্যি সত্যি একদিন শেষ রজনীতে তাঁর মাতৃবেশে মা অন্নপূর্ণা তাঁকে এসে 'গীত' রচনা করতে বললে ভারতচন্দ্র তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তখন

অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥

এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা।

গ্রন্থ-সূচনায় যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে 'যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব' তার একটি বিস্তৃত পটভূমি তুলে ধরেছেন কবি। তাতে দেখা যায়, পাটনার নবাব (বিহারের শাসক) আলিবর্দি খাঁ তখন খুব প্রতাপান্বিত হয়ে উঠেছেন; সুজা খাঁ নবাবের পুত্র নবাব সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে হত্যা করে তিনি বাঙলারও নবাব হলেন (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) এবং কটকের নবাব মুরসীদ্‌কুলি খাঁকেও (বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ নন) বিতাড়িত করে সেখানে ভ্রাতুষ্পুত্র সৌলদজঙ্গকে নবাব-পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওড়িশায় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং মুরাদবাখর নামক বিদ্রোহী নেতার নেতৃত্বে 'নারী গারী' ও অন্য সব সম্পদ লুণ্ঠন তো চলতেই থাকে এমন কি নবাব সৌলদজঙ্গকেও বন্দী করা হয়। এই সংবাদ পেয়ে বাঙলা-বিহারের শাসনকর্তা 'মহাবদজঙ্গ' (দিল্লীর বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি) নবাব আলিবর্দি খাঁ কটকে উপস্থিত হয়ে কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করে সৌলদজঙ্গকে মুক্ত করলেন এবং সে সময়ের যুদ্ধে ওড়িশা ছারখার হয়ে গেল। এমন কি 'দুর্গাসহ শিবের সর্বদা অধিষ্ঠান' যেখানে সেই 'মহেশের স্থান' ভুবনেশ্বরে গিয়েও যখন আলিবর্দি বাহিনী দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলো, শিবভক্ত ক্রুদ্ধ নন্দী তখন 'দুরাত্মা মোগল' নিধনে প্রলয়ের শূল উদ্যত করেছিল বলে ভারতচন্দ্র গ্রন্থ সূচনায় লিখেছেন এবং স্বয়ং শিব তাকে নিরস্ত করে নাকি বলেছিলেন যে, অকালে প্রলয়-শূল নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই, গড় সেতারায় যে শিবভক্ত বর্গিরাজ আছেন তাঁকে স্বপ্ন দেখালেই তিনি মোগল দৌরাত্ম্য দমনের সব ব্যবস্থা করবেন। 'আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়। আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥'

শিবের নির্দেশে বর্গিরাজকে স্বপ্ন দেখালে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল বাঙলা-বিহার-ওড়িশা তিন সুবার? স্বপ্ন ইত্যাদি নানা অলৌকিক অংশ বাদ দিলেও বর্গির হাঙ্গামার যে বর্ণনা রয়েছে 'অন্নদামঙ্গল'-এর গ্রন্থ সূচনায় সেখানে বাস্তবিকই তখনকার সমাজের এক বিপর্যয়কর তথ্যচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥

তারপর কি হলো? বহু লোককে হত্যা করা হলো, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো এবং ঝি-বৌদেরও লুটপাট করে নেওয়া হলো অর্থ সম্পদ লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে। এ বিবরণও আমরা পাই ঐ গ্রন্থারম্ভে যেখানে লেখা রয়েছে —

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

সে অবস্থায় নবাবকে অর্থাৎ আলিবর্দি খাঁকে পালিয়ে থাকতে হয়েছিল —

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥

এমন কি 'নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্ত মূর্তি'

'দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়।
এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন দায়॥'

কি রকম দায়ে পড়তে হয়েছিল এমন কি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেও সেই পরিস্থিতিতে? সে কথা জানলেই সে সময়ে সাধারণ প্রজাবর্গের কিরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা অনুমান করা যাবে। তা ছাড়া যে পরিস্থিতিতে কৃষ্ণনগরে অন্নপূর্ণা পূজা উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল এবং 'অন্নদামঙ্গল গীতরচনার পশ্চাৎপট তৈরি হয়েছিল তারও একটি ছবি পাওয়া যাবে। বর্গিদের হাঙ্গামা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মাঝে মাঝেই তাদের থেকে থেকে অনেক টাকা দিতে হতো। সে টাকা আসতো কোথা থেকে? প্রজাকুলের ওপর বেশি করে কর চাপিয়ে দিয়ে এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত রাজরাজড়াদের কাছ থেকে বিরাট নজরানা আদায় করে বর্গি-তোষণের দায় মেটাতেন নবাব আলিবর্দি। কিভাবে এবং কত টাকা আদায় করা হয়েছিল নবদ্বীপাধিপতির কাছ থেকে? মহাবদজঙ্গ আলিবর্দির অর্থ সংগ্রহের সেই বিবরণ দিয়ে ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেক মুর্শিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥

ঐ অবস্থায় মহারাজা বিবিধ প্রকারে দেবী পূজা করেও চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব পাঠ করে দেবীকে তুষ্ট করলে যথারীতি তিনি স্বপ্নে অন্নপূর্ণা ভগবতীর আজ্ঞা পেলেন—

শুন রাজা (বাছা) কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥

এইভাবে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রকাশ ঘটেছিল এবং নবদ্বীপে তথা বাংলায় অন্নপূর্ণা পূজা উৎসবের প্রচলন হয়েছিল।

এর পর 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' শীর্ষক অংশে ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রানীর গর্ভজাত পুত্র-কন্যা-জামাতা ও ভগ্নী-ভগ্নীপতি, ভাগ্নে-ভাগ্নী ও ভাগ্নী-জামাই তো আছেই, এমন কি পিসেমশাই ও তাঁর পুত্র-জামাতাদের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপরেই রয়েছে সভাসদ-পারিষদ প্রমুখ প্রিয়জনদের কথা এবং সর্বশেষে আছে গণক, বৈদ্য, দেওয়ান, মুনশী, গায়ক, নর্তক, আমীন, পেশকার, তীরন্দাজ, সৈন্য-সেনাপতি এমন কি 'হাতী ঘোড়া উট আদি' যোগান দেবার ভার যার ওপর অর্পিত ছিল সেই হাবসী প্রধানের প্রসঙ্গ। এরপর রায় গুণাকর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যসীমা দেখিয়ে বলেছেন—

অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥

এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর সংসারে যিনি দেবীপুত্র নামে বিদিত এবং স্বয়ং নবাব যাকে ধর্মচন্দ্র নাম দিয়েছেন

সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥

যাবতীয় আত্মজীবনীর ক্ষেত্রেই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, আত্মকথার সঙ্গে সঙ্গে সমকালের ও সমকালীন সমাজের একটা ছবি খুব স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানেও ভারতচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত আত্মবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষদের, তাঁর প্রভুদের পরিচয় যেমন এসে পড়েছে তেমনি এসে গেছে মুঘল যুগের শেষে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সমাজ-কাঠামোর কথা। তা ছাড়া সে সময়ে বাঙলায় মাৎস্যন্যায়ের যে খেলা চলছিল তারও একটা স্পষ্ট ছবি লক্ষ্য করার মতো। তখনকার যৌথ পরিবার, অল্পবয়সে বিবাহ, বিদ্বানের সমাদর, পারসী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক, নারীত্বের অবমাননা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ এবং তৎকালীন সংসার-ধর্মের রূপ ইত্যাদি যেমন কবির আত্মকথা প্রসঙ্গে তেমনি তাঁর কাব্য কথায়ও প্রকাশ পেয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল' রচনা শেষ হলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে 'বিদ্যাসুন্দরে'র সরস উপাখ্যান রচনা করে ভারতচন্দ্র সেটিও তার সঙ্গে যুক্ত করে দেন এবং একই ভাবে 'ভবানন্দ মজুমদারের পালাটি'ও ঐ একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বিদ্যা-সুন্দর' উপাখ্যান শতাধিক বছর ধরে অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তার অশ্লীলতা রমেশচন্দ্র দত্ত ও দীনেশচন্দ্র সেনের ন্যায় মনীষীদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। 'অন্নদামঙ্গলে'র দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানকে এক হিসাবে 'কালিকামঙ্গল' বলা হয়ে থাকে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত এই কাহিনীটি রাজার ইচ্ছায় 'অন্নদামঙ্গলে' প্রক্ষিপ্ত হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি রাজা মানসিংহকে সামনে এনে কাহিনীটিকে কবি সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দরে' 'রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন' বর্ণনায় তখনকার বাঙলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়। দিল্লির বাদশাহকে যিনি মানতে নারাজ প্রবল প্রতাপশালী সেই যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করবার জন্যেই বিরাট এক বাহিনীসহ রাজা মানসিংহ বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক বাঙলায় প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত সবংশে নিহত বসন্ত রায়ের একমাত্র জীবিত সন্তান কচু রায়ের কাছ থেকে সমস্ত খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর সেই কচু রায়কে সঙ্গে দিয়েই মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা মানসিংহ বর্ধমানে এসে উপনীত হলে

নবাব সরকারের কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার (কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভেট নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বাঙলার সমস্ত সমাচার তাঁকে বলেন। কয়েকদিন পর বিদ্যাসুন্দরের অপূর্ব কাহিনীটিও মানসিংহকে তিনিই শোনান। সেই উপকথায় প্রাচীনকালে বর্ধমানে বীরসিংহ নামে এক নরপতির কন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দরের আশ্চর্য প্রেমোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যেই চোর, কপট ও ধূর্ত নর-নারীর সন্ধান মেলে। অন্য যে সমস্ত সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সন্ধান মেলে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সেসব ভারতচন্দ্রের কালেরই সমাজরূপের ছায়া মনে করা যেতে পারে। সুন্দর বর্ধমানে এসে যে পুরচিত্র দেখতে পায় তা যথার্থই একটি সুসংবদ্ধ সমাজের ছবি। চতুর্দিকের নগর-সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক শোভা ছাড়াও সুন্দরের চোখে পড়লো—

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেনে মনি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তাম্বুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসা ধোবা চাসা কৈবর্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক॥

এই সব নানা বৃত্তিজীবী মানুষকে নিয়েই তো গড়ে উঠতো সেকালের সমাজ। এদের কোনো কোনো শ্রেণী বিগত তিনশ' সাড়ে তিনশ' বছরের

মধ্যে হয়তো লুপ্ত বা প্রায় লুপ্ত, তবু আজো মোটামুটি এই কাঠামোর ওপরেই বাঙালী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

যাই হোক, কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর (চল্লিশ বৎসর বয়েসে রচিত), মানসিংহের পালা, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, নাগাষ্টক, চণ্ডীনাটকের কিয়দংশ, এবং আর আর কবিতা সকল' পাঠে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, এ সবের রচয়িতা ভারতচন্দ্রকে তিনি 'কাব্যকর্তা কবিকেশরী' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর রচিত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে।

এই 'কবিকেশরী'কে কিন্তু সারাটি জীবনই দুঃখ ও লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে কাটাতে হয়েছে। মাত্র আট চল্লিশ বছরের জীবনে (বাং ১১১৯ থেকে ১১৬৭ এবং ইং ১৭১২ থেকে ১৭৬০) বাল্যেই যাকে গৃহহারা হয়ে প্রথমে মাতুলালয়ে ও পরে পরাশ্রয়ে শিক্ষালাভ করে দ্বার হতে দ্বারান্তরে আশ্রয় প্রার্থী হতে হয়, কারাবাস সহ্য করতে হয় এবং কিছুকালের জন্যে যাকে বৈষ্ণব-বৈরাগীর জীবনও যাপন করতে হয় সেই ভারতচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপালাভ করেও কি বাকী জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন? চল্লিশ বছর বয়েসে নবদ্বীপাধিপতির আশ্রয়ে তাঁর সভাসদরূপে 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করে 'রায় গুণাকর' উপাধি ভূষিত হবার পর ভারতচন্দ্রকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর পরিবার কোথায়, তিনি বাটীর তত্ত্বাবধান করেন কিনা। উত্তরে ভারতচন্দ্র জানান যে তাঁর স্ত্রীকে পিতৃগৃহে রাখতে হয়েছে কারণ তাঁর ভাইদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই এবং বাড়িতে যাবার তাঁর ইচ্ছেও নেই। গঙ্গাতীরে কোথাও একটু স্থান পেলে সেখানে বাড়ি তৈরি করে সপরিবারে সে বাড়িতে বসবাসের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে মহারাজা তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করেন। কবির পরম হিতৈষী ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছাকাছি থাকবার বাসনা প্রকাশ করলে মহারাজার ব্যবস্থা মত ও তাঁরই অর্থে মূলাযোড়ে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করিয়ে নিয়ে রায় গুণাকর সস্ত্রীক সেখানে বাস করছিলেন এবং গঙ্গাতীরের সে বাড়িতেই তাঁর বৃদ্ধ পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ দেহ রাখেন। মাত্র ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্বে ভারতচন্দ্র সমগ্র মূলাযোড় গ্রামখানি ইজারাও পেয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে। কিন্তু সে সুখও তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

বর্গীদের হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে বর্ধমানের মহারাজ্ঞী তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মহারাজ তিলকচন্দ্র রায়কে নিয়ে মূলাযোড়ের নিকটবর্তী কাউগাছী গ্রামে

যেয়ে গড়বন্দী প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। সেই প্রাসাদেই মহাসমারোহে মহারাজ তিলকচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র পাশের গ্রাম মূলযোড় ইজারা নিয়ে সেখানে বাস করছেন জেনে তাঁর আশঙ্কা হলো যে, কাউগাছী থেকে মহারাজ্ঞীর গরু, ঘোড়া, হাতি গিয়ে মূলাযোড়ের বৃক্ষাদি নষ্ট করলে সে গ্রামের ব্রাহ্মণ ইজারাদার ভারতচন্দ্রের ব্রহ্মশাপ মহারাজ্ঞীকে ভোগ করতে হবে। তাই তিনি নবদ্বীপাধিপতিকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে নিজ কর্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় গ্রামখানি পত্তনি নিয়ে নিলেন।

এ সংবাদ পেয়ে ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গিয়ে এই পত্তনি দেওয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে যখন বললেন, 'এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্তব্য হয় না।' তখন রাজা তাঁকে জানালেন, 'যদি মূলাযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি 'গুস্তে' নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।' এই বলে সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা ভারতচন্দ্রকে 'গুস্তে' গ্রামে ১০৫ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬ বিঘা নিষ্কর জমি ব্রহ্মত্র হিসাবে দান করে দিলেন। সেই দান পেয়ে কবি মূলাযোড় ছেড়ে গুস্তে গ্রামে যাবার উদ্যোগ করলে মূলাযোড়ের অধিবাসীরা সকলে সমবেত হয়ে তাঁকে এসে এমনভাবে বাধা দিলেন যে তাঁকে মূলাযোড়েই সপরিবারে থেকে যেতে হলো।

কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে মূলাযোড়ে থেকে গেলেও সেখানে বাকি জীবন শান্তিতে কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি কবি ভারতচন্দ্রের পক্ষে। পত্তনিদার রামদেব নাগ ভারতচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকদের ওপর এমন দৌরাত্ম্য শুরু করে দিয়েছিলেন যার বিরুদ্ধে কবিকে তাঁর শাণিত লেখনী-অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'অথ নাগাষ্টকং' নামে এক আত্মকথামূলক কৌতুক-কাব্য রচনা করে একখানি সংস্কৃত-পত্র সহযোগে নবদ্বীপাধিপতিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং মহারাজের অনুরোধে শেষপর্যন্ত অবশ্য নাগের দৌরাত্ম্য নিবারিতও হয়েছিল।

এখানে দেখা যাচ্ছে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের আমলে বাঙালী সমাজ একদিকে যেমন বর্গীদের হাঙ্গামায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের তখন জমিদার-পত্তনিদারদের অত্যাচারে ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। সেই পরিবেশে সমাজে ব্রাহ্মণের আধিপত্য এমনি দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে বর্ধমানের মহারানীকেও ব্রহ্মশাপের ভয় করতে হতো এবং ব্রহ্মত্র দান করে কৃষ্ণনগরের মহারাজাও পরম কৃতার্থবোধ করতেন যদিও ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে সেটা ছিল গুণীজন সমাদরের ব্যাপার।

প্রথম মুঘল সম্রাটের আত্মকথায়

ভারতে পাঠান রাজত্বের অবসানে মুঘল শাসনের সূত্রপাত। সেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর যিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত আত্মচরিতে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ভারতের তৎকালীন সমাজজীবনের পরিচয়ও কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য একাধারে কবি-দার্শনিক, বীর যোদ্ধা ও গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী সুশাসক এই প্রথম মুঘল সম্রাট বার বার ভারত বিজয়ে এসে এবং দিল্লীশ্বর হিসাবে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় হিন্দুস্থানের যেরূপ তিনি দেখেছেন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই বিবরণও রয়েছে তাঁর আত্মকথায়।

হিন্দুস্থান অধিকার তাঁকে করতেই হবে—এই ছিল এশিয়া মহাদেশের অন্যতম ধ্বংসকারী ও ভারতলুণ্ঠনে বিভীষিকা-স্রষ্টা তৈমুরলঙের ষষ্ঠ পুরুষ ও পারস্যের পূর্বসীমান্তবর্তী ছোট্ট রাজ্য ফারগানার তরুণ অধিপতি জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবরের স্বপ্ন—তাঁর প্রতিজ্ঞা। সে স্বপ্ন, সে প্রতিজ্ঞা তাঁর সফল হয়েছিল পঞ্চম বারের চেষ্টায়। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁর আমন্ত্রণে বাবর পঞ্চমবার ভারত আক্রমণে উদ্যোগী হন এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে দিল্লীর পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দৌলত খাঁর মতো বিশ্বাসঘাতক তখন অনেকেই ছিল দেশে।

আত্মচরিতের প্রায় মধ্যভাগ থেকে হিন্দুস্থানের বিষয় উল্লেখ করতে থাকেন বাবর। ১৫০৪ সালে কাবুল ও গজনী অধিকার করে বাবর সে দেশটা ভাগ করে দেন সেই সব আমীর ও বেগদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং গজনী ও তার অধীন প্রদেশগুলি তিনি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যম ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মির্জাকে। কান্দাহার জয় করে সে রাজ্যের ভার দিয়েছিলেন কনিষ্ঠ ভাই নাসির মির্জাকে। অনুরক্তদের মধ্যে এধরণের অনেক অনুগ্রহ তিনি বিতরণ করেছেন, এ প্রসঙ্গেই এইসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

কাবুলের বিষয় আলোচনা করতে করতে এক জায়গায় বাবর লিখেছেন তাঁর আত্মকথায়—'কাবুলে হিন্দুস্থান থেকে বছরে কুড়ি হাজার বস্ত্রখণ্ড ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসে। হিন্দুস্থান থেকে ক্রীতদাস, শ্বেতবস্ত্র, আখ, ওষুধ এবং মশলাও আমদানি করা হয়ে থাকে। কাবুলে চলতি এগার রকমের ভাষার মধ্যে হিন্দী

অন্যতম। অন্য দশটি ভাষা হলোঃ আরবি, ফারসী, তুর্কি, মোগলি, আফগানী, পাশাই, পরাচী, গেবেরি, বেরেকি ও লামখানি।'

কাবুলেই পরামর্শ সভায় স্থির হয় যে হিন্দুস্থান হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই বাবর বাহিনী হিন্দুস্থান অভিযানে যাত্রা করে। সেই দেশের প্রথম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বাবর লিখেছেন—'ইতিপূর্বে কখনো আমি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ দেখিনি—হিন্দুস্থানের কোনো অংশও দেখিনি। সেই সব অঞ্চলে এসে মনে হলো যেন নতুন জগতে এসেছি। এখানকার তৃণ-গুল্ম সব পৃথক জাতের, বনের পশুরাও অন্য ধরণের, পাখিদের পালকও বিচিত্র এবং যাযাবর জনজাতিগুলির আচার-আচরণ এবং রীতিনীতিও পৃথক রকমের।

কোহাটে পৌঁছে বাবরের লুটেরার দলগুলি বহু ষাঁড় ও মেষ সংগ্রহ করে। তাঁর সৈন্যরা অনেক আফগানকে বন্দী করে আনে এবং বাবর তাদের সকলকেই ছেড়ে দেন। পরে কিন্তু আফগানদের প্রতি বাবরের এরূপ উদারতা আর দেখা যায় না। দু'দিন দু রাত কোহাটে কাটিয়ে বাজু আক্রমণে বাবর বাহিনী অগ্রসর হলে প্রথম চোটেই শ দেড়েক আফগানকে খতম করে ফেলা হলো। এই আক্রমণ সম্পর্কে আত্মকথায় বাবর লিখেছেন—'কয়েকজন আফগানকে আমার কাছে জীবন্ত নিয়ে আসা হলো। পরাজিত আফগানরা দাঁতে তৃণ নিয়ে বিজয়ী বিপক্ষীয়দের সামনে এসে দাঁড়ায়। সম্ভবত এর দ্বারা তারা জানাতে চায় যে আমরা তোমার আশ্রিত। আফগানদের এই রীতির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয় বুঝেই আফগানরা দাঁতে খড় নিয়ে আমাদের সামনে আসতে লাগলো। জীবন্ত ধরে আনা আফগানদের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলাম এবং ঐসব কাটামুণ্ডুগুলো দিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরী করা হলো আমাদের পরবর্তী বিশ্রামস্থলে।'

কাবুল ও গজনীর কথা থাক। বাবরের পঞ্চম সাফল্যমণ্ডিত হিন্দুস্থান অভিযানের বিষয়ে তিনি আত্মচরিতে যে কয়েক পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট করেছেন তার মধ্যেই তখনকার ভারতীয় শাসক মণ্ডলী ও জনসমাজের যেমনি একটা পরিচয় পাই, তেমনি তা পাঠে তাঁর নিজের সম্বন্ধেও একটা চিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবর লিখেছেন যে, মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে এক শুভ শুক্রবারে তিনি ভারত আক্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সেই অভিযানের পথে পথে প্রচুর সুরাপান ও ভাং খাওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায় বাবরের আত্মকথায়, তার সঙ্গে তাঁর অতীতের মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্পের কোনো মিল নেই। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের আত্মকথায় ২৪ বছর বয়সে বাবর একস্থানে লিখেছেন যে, বাল্যে

মদ্যপানের কথা তাঁর মনেই হতো না। সুরাপানের আনন্দ-বেদনা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তাঁর পিতা ওমর শেখ অনেক সময় তাঁকে সুরাপান করতে বললেও বাবর তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে স্থান ত্যাগ করতেন। এমন কি যৌবনে প্রবৃত্তির তাড়নায় মদ্যপানের ইচ্ছা জাগলেও সে ইচ্ছাকে অনেক দিন পর্যন্ত তিনি দমন করে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভারত অভিযানের বর্ণনায় দেখা যায় বাবর সুরাপানে বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, ভাং খাওয়ার নেশাও তাঁর চেপে যায় সেই সময় থেকে। ঐ সময়েরই আরেক দিনের আত্মকথায় তিনি লিখেছেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে সুরাপান তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই সে সময়ে উনচল্লিশ বছর বয়সে প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করতে থাকেন। কিন্তু মদ্যপান বিষয়ে তাঁর জীবনের সংযমের পরিচয় যেমন আর পাওয়া যায় নি, তেমনি চল্লিশ বছর বয়সে তিনি পুরোপুরি মদ্য বর্জন করবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে সিদ্ধান্তও তিনি কার্যকর করতে পারেন নি। বাবর তাঁর পঞ্চম ভারত অভিযানের বিবরণে লিখেছেন—'যে ক'দিন আমাদের এখানে (বাগ-ই-ওয়াফাতে) অপেক্ষা করতে হয়েছে ততদিন প্রত্যেকটি বৈঠকেই প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করতে হয়েছে, এমন কি ভোরের পেয়ালাও কোনোদিন আমার বাদ যায়নি। যখন সুরাপানে বিরত থাকতাম, তখন চলতো ভাং খাওয়ার বৈঠক।'

অনেক মহৎ গুনের অধিকারী হলেও পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের দুই পূর্বপুরুষ যথাক্রমে তৈমুরলঙ ও চেঙ্গিজ খানের ন্যায় লুঠতরাজ এবং নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্তে বাবরও বড়ো কম যাননি। বাজুর রাজ্যের অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ না করায় এবং ইসলাম বিরোধী বলে প্রথম ভারত আক্রমণ অভিযানে বেরিয়ে বাবর সে রাজ্য দখল করে সেখানকার তিন সহস্রাধিক লোকের শিরশ্ছেদের আদেশ দেন এবং তাদের স্ত্রী ও পরিজনদের বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করেন। এই বাজুর অভিযানের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে বিজয়ী সমর-নায়ক বাবর নিহত বাজুরীদের মুণ্ডুগুলো দিয়ে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। কোহাটে জীবন্ত ধরে-আনা আফগানদের হত্যার আদেশ কার্যকর হলে সেই মুণ্ডুগুলো দিয়েও যে একটি ছোট স্তম্ভ তৈরী করানো হয়েছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরূপ নিষ্ঠুরতায় বাবর কিন্তু রীতিমতো গৌরব অনুভব করতেন। আবার অন্যদিকও আছে। বেহের দেশের লোকদের ধনসম্পদ লুঠ করায় ও তাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করায় তাঁরই কিছু সৈন্যকে ধরে এনে বাবর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

হিন্দুস্থান জয়ের সঙ্কল্প করার পর বাবরের এরূপ একটা বিশ্বাস দেখা দেয় যে, হিন্দুস্থান বিজয় অভিযানে রওনা হয়ে যে সব দেশ বা রাজ্য তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হচ্ছিল সেগুলো পূর্বে তুর্কিদের শাসনাধীন ছিল বলে তাঁর রাজত্বের অংশ বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। এই দাবী জানিয়ে তিনি দিল্লীশ্বর সুলতান ইব্রাহিম এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁকে চিঠি দেন এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে একজন দূত প্রেরণ করেন। এই বিবরণ দিতে গিয়েই বাবর হিন্দুস্থানের লোকদের সম্বন্ধে তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—'হিন্দুস্থানের মানুষ বিশেষ করে আফগানরা এক অদ্ভুত নির্বোধ জাত। তাদের চিন্তাশক্তিও নেই, দূরদৃষ্টিও নেই। তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধও করতে পারে না এবং মৈত্রীবদ্ধ হয়ে থাকতে নারাজ। আমার প্রেরিত দূতকে দৌলত খাঁ লাহোরে আটক করে রাখেন, অথচ নিজে তার সঙ্গে দেখা করেন না, সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা করতেও তাকে যেতে দেন না। তাই কোনো উত্তর না নিয়েই আমার দূতকে পাঁচ মাস পর কাবুলে ফিরে আসতে হয়।'

এখানে ভারতীয় আফগান অর্থাৎ পাঠানদের সম্পর্কে বাবরের মতামত স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। এ হলো প্রথম ভারত অভিযানে লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা। শেষবারের হিন্দুস্তান আক্রমণ বিষয়ে লিখতে গিয়ে বাবর বলছেন যে, দিল্লী অভিযানে এগিয়ে চলতে চলতে তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনীসহ বাহ্‌লালপুর (ভাওয়ালপুর) রাজ্যের চতুর্দিক এবং চেনাব নদীর তীরে সে রাজ্যের দুর্গ এলাকা পর্যবেক্ষণ করে এত মুগ্ধ হন যে শিয়ালকোটের লোকজনদের তিনি সেখানে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করেন। সেখান থেকে শিয়ালকোট পৌঁছানোর ও দখলের খবর লিপিবদ্ধ করে বাবর স্থানীয় জনসাধারণের দুঃখকষ্টের উল্লেখ করে লিখেছেন—'হিন্দুস্থানে আমরা যতবার প্রবেশ করেছি ততবারই লক্ষ্য করেছি, দলে দলে অসংখ্য জাঠ আর গুর্জর ষাঁড় মোষ লুঠ করতে পাহাড় অঞ্চল ও বনভূমি থেকে লোকালয়ে চলে আসে। দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের অনেকটার জন্যেই দায়ী এসব শয়তানের দল। এরা জনগণকে নির্যাতিত করার দোষে দোষী। এসব দেশ বরাবরই বিদ্রোহী এবং এদের কাছ থেকে অল্প রাজস্বই আদায় হতো। এখন এদেশ যখন আমার দখলে তখনো তারা আগের চালচলনই বজায় রেখে চলছে। শিয়ালকোট থেকে আমার অর্ধনগ্ন ক্ষুধিত প্রজারা যখন অতি কষ্টে আমার শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে সে সময় পথেই তাদের ওপর আক্রমণ চলে এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে যায়। অত্যাচারীদের খুঁজে বার করে আমি তাদের দু'তিনজনকে টুকরো করে কেটে ফেলার আদেশ ঘোষণা করি।'

এর পরেই বাবর তাঁর আত্মজীবনীর শেষাংশে লোদী আফগান বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'এসময়ে হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন সুলতান ইব্রাহিম। এক লক্ষ সৈন্য ছিল তাঁর এবং নিজের ও আমীরদের মিলিয়ে মোট হাতি ছিল এক হাজার।'

আরো পরে যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অপদার্থতা নিয়ে আলোচনা করে বাবর লিখেছেন, 'সম্রাট তাঁর পিতা (সম্রাট ইস্কান্দর) ও পিতামহের (সুলতান বাহ্‌লুল) সমস্ত ধনরত্নের উত্তরাধিকারী তো বটেই, তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করার মতো নগদ অর্থও তাঁর রয়েছে প্রচুর। হিন্দুস্থানে এমন একটা রীতি চালু আছে যে, আমার শত্রুপক্ষীয়রা যে অবস্থায় এখন পড়েছে সে অবস্থায় পড়লে সঞ্চিত মুদ্রায় ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করে শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। সম্রাট এই পথে অগ্রসর হয়ে আরো দু'এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করে নিতে পারতেন। (অন্যত্র বলা হয়েছে, ইব্রাহিম আরো পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করতে পারতেন।) তবে সর্বশক্তিমান আল্লা যা করেন তা ভালোই করেন। নিজের নিয়মিত সৈন্যদের সন্তোষ বিধানের উদারতাই ছিল না সম্রাটের, তিনি ভাড়াটে সৈন্য আনবেন অর্থব্যয় করে, সে অনেক দূরের কথা। ...নিজে এক নম্বরের কৃপণ, অর্থ সঞ্চয়ই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এক অনভিজ্ঞ যুবক, একটা অবহেলার মনোভাব নিয়ে সব কাজই তিনি করতেন দায়সারা ভাবে। সৈন্য চালনায় তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন না, কোনো স্থির সিদ্ধান্ত না করেই যত্রতত্র তিনি গতি থামিয়ে দেন। আবার এমনভাবে যুদ্ধ শুরু করে দেন যাতে দূরদর্শিতার কোনো পরিচয়ই মেলে না।'

সাত-আট দিন পানিপথে থেকে অতি সহজে কিভাবে তিনি অর্ধদিনের যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন তার বিবরণে বাবর লিখেছেন যে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং অর্ধ দিনের মধ্যে তাঁর সৈন্যদল বিপুল শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করেছে। যুদ্ধান্তে আগ্রায় পৌঁছে হিন্দুস্থানের লোকদের কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছেন তার উল্লেখ করে নতুন ভারত সম্রাট বাবর জানিয়েছেন যে, পানিপথের ঐ অর্ধ দিনের যুদ্ধে পঞ্চাশ-ষাট হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও বাবরের আত্মকথায় দেখা যায়, যুদ্ধ শেষে পলায়নপর শত্রুসৈন্যদের অনুসরণ করে অনেককেই হত্যা ও বন্দী করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য হতাহতদের মধ্যে নিহত সুলতান ইব্রাহিমকে দেখে তাঁর মাথাটি কেটে আগ্রায় নিয়ে এসে বাবরের কাছে দেওয়া হয়েছিল।

এমনি অনেক নিষ্ঠুরতারই উল্লেখ করেছেন বাবর। তেমনি অনেক উদারতার দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ রয়েছে তাঁর আত্মকথায়। সেই সব উদারতার উদাহরণ হিসাবে বাবরের কথাতেই বলা যাক, 'আগ্রা দুর্গে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে মালিক দাদ কেরানি ছিল অন্যতম। জালিয়াতির অভিযোগে সে অভিযুক্ত হয় এবং তাকে শাস্তি দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক মধ্যস্থের অনুরোধে তাকে মার্জনা করা হয় এবং তার প্রতি অনুগ্রহও প্রদর্শিত হয়।' নিহত সম্রাট ইব্রাহিমের মায়ের প্রতি যথেষ্ট করুণা দেখিয়েছিলেন বাবর। তাঁর ভরণ পোষণের জন্যে মোট সাত লক্ষ মুদ্রা করের একটি জেলা তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল এবং আগ্রার মাইল খানেকের মধ্যেই তাঁর বসবাসের স্থান ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আমীরদেরও অপর একটি জেলার ভার দিয়েছিলেন নতুন সম্রাট। আগ্রায় সুলতান ইব্রাহিমের শূন্য প্রাসাদেই নতুন সম্রাট বাবরের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এসব তথ্যের পরে বাবর তাঁর আত্মজীবনীর উপসংহারে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাবুল বিজয়ের পর থেকে সংঘটিত ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যায়, কাবুল অধিকারের পর থেকেই বাবর 'হিন্দুস্থান জয় করবোই করবো', এই আশা পোষণ করে আসছেন। কিন্তু আমীরদের অসদাচরণ এবং ভ্রাতৃবর্গের ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধতায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাল তিনি তাঁর সেই আশা পূর্ণ করতে পারেন নি। অবশেষে সমস্ত বাধা কিভাবে দূর হলো এবং কিভাবে তিনি ভারত সাম্রাজ্য করায়ত্ত করলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বাবর লিখেছেন, 'একটি সৈন্যদল গঠন করে ১৫১৯ সালে আমি বাজুর অধিকার করে সে রাজ্যের দুর্গরক্ষীদের শিরশ্ছেদ করি। সেখান থেকে যাই বাহের দখলে। সেখানে লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ রাখি। ···সেখান থেকে কাবুলে ফিরে এসে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত সাত-আট বছর হিন্দুস্থান বিজয়ে আমার সমস্ত চিন্তা ও ইচ্ছা নিয়ে আমি যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছি। আমার সেনাবাহিনীর অধিনায়করূপে আমি পাঁচ পাঁচ বার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চমবারে মহান আল্লার করুণায় সুলতান ইব্রাহিমের মতো প্রবল শত্রুকে পর্যুদস্ত করে বিশাল হিন্দুস্থানের সিংহাসন অধিকারের যোগ্য হয়েছি।'

বাবরের ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর আত্মবিশ্বাসের মতোই গভীর ও অকৃত্রিম, তাঁর আত্মকাহিনী পড়তে পড়তে, একথাটি মনে হবেই। হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে আত্মকথার শেষ দু'টি বাক্যের মধ্যে তাঁর সে মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সেখানে বলেছেন, 'আমার এই সাফল্য নিজের ক্ষমতায় সম্ভব

হয়েছে বা এ সৌভাগ্য আমি নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছি, এমন আমি কখনো ভাবতে পারি না। খোদার অপরিসীম দয়া এবং অনুগ্রহেই এ গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।'

প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের চিন্তা তো এধারায়ই চলে থাকে। বাবরের কাল থেকেই একটি জনশ্রুতি চলে আসছে, সম্রাট বাবর নিজের জীবনের বিনিময়ে অসুস্থ পুত্র হুমায়ুনের রোগমুক্তির জন্যে আল্লার কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং আল্লা তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা পূরণও করেছিলেন। হুমায়ুন তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেন এবং বাবর চিরবিদায় নিলেন তারপরেই।

আত্মকথা কবে থেকে বাবর লিখতে শুরু করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। মাঝে মাঝে লেখা বন্ধও রেখেছেন। তা হলেও পিতা ওমর শেখ মির্জা ও পুত্র হুমায়ুনের বিষয় উল্লেখ থাকায় এই আত্মজীবনী গ্রন্থখানি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। পিতৃ-পরিচয় দিতে গিয়ে তৈমুরলঙ থেকে ও মাতৃ-পরিচয় দিতে গিয়ে চেঙ্গিজ খাঁ থেকে বাবর তাঁর পিতৃ-বংশনামা ও মাতৃ-বংশনামার বিবরণ দিয়েছেন। পিতার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, তিনি ছিলেন উচ্চভিলাষী ও জমকালো জীবন যাপনে অভ্যস্ত এক রাজা। রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সমরখন্দ উদ্ধারে গিয়ে বার বার তিনি পরাস্ত হন। বাবর তাঁর খর্বাকৃতি বলিষ্ঠ পিতাকে উদার চরিত্রের লোক ও 'মানুষের মতো মানুষ' বলে বর্ণনা করেছেন। পিতার রাজ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বাবর লিখেছেন যে, ওমর শেখ তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রথমে পান কাবুল রাজ্য, তারপরে ফারগানা প্রদেশ, বড় ভাই সুলতান আমেদ মির্জার কাছ থেকে পান তাসখন্দ ও সৈরাম এবং ধাপ্পা দিয়ে সারুখিয়া প্রদেশও দখল করে বসেন। তবে ফারগানা, খুজেন্দ এবং উরাতিপা ছাড়া সবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। বাবর বর্ণিত ওমর শেখ মির্জার পুত্র-কন্যা এবং পত্নী-উপপত্নী ও রক্ষিতাদের পরিচয় থেকে জানা যায় যে বাবররা ছিলেন তিন ভাই ও পাঁচ বোন। বাবর ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মায়ের নাম কুতলুক নিগার খানুম। বাবরের পাঁচ বছরের বড়ো বোন ছিলেন খানজাদা বেগম যিনি বাবর দ্বিতীয়বার সমরখন্দ ছেড়ে আসতে বাধ্য হলে তাঁর চিরশত্রু মহম্মদ সেবানি খাঁর হাতে পড়ে নিগৃহীতা হন ও সেবানির ঔরসে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়ে অল্প বয়সেই মারা যায়। ওমর খাঁর দ্বিতীয় পুত্র জাহাঙ্গীর মির্জার জন্ম তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী আরেক মুঘল-কন্যা ফতেমা সুলতানের গর্ভে এবং তৃতীয় পুত্র নাসির মির্জা ও দুই কন্যা মেহের বানু ও সেহের বানু আন্দেজানবাসিনী উপপত্নী উমিদের গর্ভজাত। ওমরের অপর দুই কন্যাও

আরো দুই উপপত্নীর সন্তান। অনেক রক্ষিতাও ছিল ওমর খাঁ মির্জার হারেমে। বাবরের সৌখীন পিতা পাহাড়ের ওপর বসে পায়রা ওড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন।

সম্রাট বাবরের জন্ম তাতার জাতিতে। আর তিনি যে ভাষায় তাঁর আত্মচরিত লিখেছেন সেটি হচ্ছে সেই সব উপজাতির ছাগতাই তুর্কি ভাষা যারা কাস্পিয়ান উপসাগরের উত্তরের ও পূর্বের মরুভূমিতে বসবাস করতো। এভাষা বাবরের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ তাঁদের বংশেরই ভাষা।

এই মরুভূমির এক কিনারায় তাঁর জন্ম, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তিনি কখনো হয়েছেন গৃহহীন ভবঘুরে, কখনো বা আশ্রয়প্রার্থী, লজ্জায় অবমাননায় কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে পালিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে আবার কখনো বা তিনি এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশ বিজয়ী বীর। এক সময়ে ভাগ্যের সন্ধানে তিনি চীনে চলে যাবারও মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

বলতে গেলে বাবরের গোটা জীবনটাই বিভ্রান্তির মধ্যে কেটেছে। সেকালে সিংহাসনে আরোহনের কোনোও সুনির্দিষ্ট আইনবিধি না থাকায় তা নিয়ে বারবার যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে এবং দেশে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

সম্রাটের মৃত্যুর পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন সেটা যুবরাজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতো,—সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর স্বভাবতই এ নিয়ে বিবাদ বাধতো। মৃত রাজার উইল শক্তিশালী মন্ত্রীর ষড়যন্ত্র কিম্বা চতুর সেনাপতির তরবারির মুখে ভেসে যেতো।

বাবরের আত্মচরিতে দেখা যায়, রাজদরবারে বিভিন্ন দলের মুখপাত্রগণ নিজ নিজ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দীদের বক্তব্য রাখতেন। এবং যদিও নিজেদের মনোমত প্রার্থীর পাশেই এইসব সমর্থক বসতেন, এরা কিন্তু আনুগত্যের ধার ধারতেন না। আনুগত্যকে কোনো একটা আবাশ্যিক গুণ বলে তাঁরা মনেই করতেন না। যে যুবরাজের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন এবং যে যুবরাজ তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বিরোধী শিবিরে চলে যাওয়া এদের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র ছিলনা। অর্থাৎ এধরণের রাজদ্রোহকেও দণ্ডিত করার ক্ষমতা সম্রাটের বা রাজার ছিল না। দলের লোকেরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার তালে থাকতো,—রাজানুগত্যের মধ্যে দিয়ে বিন্দুমাত্র দেশাত্মবোধ প্রকাশের আগ্রহ বা শিক্ষা তাঁদের ছিলনা। পদমর্যাদা, ধনসম্পদ এবং সমকালীন স্ফূর্তি, এই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

রাজা বা যুবরাজ বুঝতে পারতেন যে, স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা নেই এবং সে

কারণেই নিজেও সেইভাবে নিতান্ত যুদ্ধবিগ্রহের রোমাঞ্চক ধারায় গড়ে উঠতেন। তাঁর চারদিকে যারা থাকতেন তিনি তাঁদের নিছক ক্ষমতার হাতিয়ার রূপেই গণ্য করতেন।

বাবরের সময়ে যুবরাজদের ক্ষমতাও অনেকখানি সঙ্কুচিত ছিল। মৌলভী-মৌলানা এবং পুরোহিত গোষ্ঠীও প্রচুর প্রভাব খাটিয়ে রাজার প্রভাব খর্ব করতেন। জনসাধারণের আনুগত্য যাতে ছিল সেটি হলো নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম। ধর্মীয় গুরুদের তারা সম্মান ও সমীহ করতো। এই সব গুরুদের কিছু কিছু আবার অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করতো আর সরল-বিশ্বাসী জনগণ এই সব গুরুর মুখের কথাকে দৈববানীরূপে গ্রহণ করতো। ইতিহাসে বিস্তর নজির আছে, বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক ধর্মগুরু বিপুলভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং শুধু তাঁদের প্রভাবে ও তাঁদের প্রতি জনসমর্থনে বড়ো বড়ো নগরীর পতন ঘটেছে। ভণ্ড সাধু ও গুরুদের ভাওতার কিছু কিছু উদাহরণের উল্লেখ পাওয়া যায় বাবরের আত্মকথায়।

এ সময়ে সাহিত্যের কাব্য বিভাগটি প্রভূত পরিমাণে অনুশীলিত হতো এবং বহু ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টিও হয়েছে এই সময়ে। আত্মকথায় বাবর তাঁর নিজের অনেক কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বাবর তাঁর আত্মচরিতে কতকগুলো পূর্বাগত অনুশাসনের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, এগুলো বাবরের মাতৃকূলের পূর্বপুরুষ বহুদেশজয়ী দুর্দ্ধর্ষ মুঘল সর্দার চেঙ্গিজ খাঁ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং পুরুষানুক্রমে অনুসৃত। এগুলোকে বলা হতো 'তুরেহ্' (Tureh) বা 'জাসী' (Yasi)। অনুমান এই, চেঙ্গিজ খাঁ তাঁর বিপুল বিজয়ের পর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে এই বিধি সমষ্টি জারী করেন। মূলত এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মুঘল উপজাতিতে প্রচলিত রাজ্য-শাসন, অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে প্রাচীন নিয়মবিধি এবং বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ বিশেষ দণ্ডের নির্দেশ।

দণ্ড ছিল মোটামুটি দু'টি—মৃত্যু ও লাঠ্যাঘাত। অপরাধের তারতম্য অনুসারে অপরাধীর ওপর লাঠির আঘাত সাত থেকে সাতশ পর্যন্ত হতে পারতো। মুঘল শাস্তির বিধান অনেকখানি ছিল চীনা ধরণের। এমন কি অপরাধী যুবরাজকেও রাজাদেশে লাঠ্যাঘাতে ধরাশায়ী হতে হতো।

পূর্বদেশগুলোর পোষাক-পরিচ্ছদের প্রাচীন ঐতিহ্য ইতিহাসসম্মত বলা চলে। বাবরের আমলে অনুসৃত পোষাক বা গাত্রাবরণাদি পরম্পরা অনুযায়ী প্রচলিত এবং অদ্যাবধিও তার বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটেনি। এ বিষয়ে বাবর

আত্মকথায় লিখেছেন, 'পূর্বপুরুষ পরম্পরায় আমার পরিজনর্গব নিষ্ঠার সঙ্গেই চেঙ্গিজ খাঁ প্রবর্তিত নিয়মাদি অনুসরণ করে আসছেন। সভা-সম্মেলন, উৎসবানুষ্ঠান ও সম্বর্ধনাদির সময়ে তাঁদের আসন গ্রহণ ও উঠে দাঁড়ানোর কায়দা কানুনে চেঙ্গিজ-এর রীতি লঙ্ঘন করানো তাঁরা ঘটতে দেননি। চেঙ্গিজ খাঁ নির্দেশিত ঐসব বিধি-বিধান দৈবনির্দেশ বলে মনে করা হতো না যে সেগুলো অগ্রাহ্য করলে তা অপরাধ বলে ধরা হবে। তবুও সমস্ত মানুষ যারা সদাচরণ বিধি অনুসরণে বিশ্বাসী তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর (চেঙ্গিজের) নির্ধারিত ব্যবহার বিধিগুলো অনুসরণ করে চলেছেন—অবশ্য পিতার কোনো কাজ খারাপ হলে পুত্রের অবশ্যই তা' সংশোধন করে নেওয়া উচিত।'

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো, চেঙ্গিজ খাঁ প্রবর্তিত রীতিনীতি নির্ধারিত হয়েছিল মুঘলদের অর্থাৎ মুঘল নায়ক চেঙ্গিজের সময়কার ও তাঁর পরবর্তী মুঘল বংশীয়দের জন্যে। তা হ'লেও ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত বাবর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন সবাই তুর্কি বংশীয় হয়েও বাবরের মাতৃকুলের রীতিনীতিই মেনে এসেছেন। বাবর নিজে তো মুঘল ননই, বরং তিনি মুঘল জাতিকে ঘৃণাই করতেন। তবু যে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা মুঘল বলে পরিচিত হয়ে আসছেন তার কারণ আর কিছু নয়, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মুঘল চেঙ্গিজ খাঁ থেকে শুরু করে যারাই উত্তরাপথে ভারত আক্রমণ করেছে ভারতবর্ষের মানুষ তাদের সকলকেই মুঘল বলে ধরে নিয়েছে। বাবর সে হিসাবেই ভারতে মুঘল শাসনের প্রবর্তক ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কারণ তৈমুরলঙ্গ বা চেঙ্গিজ খাঁ উভয়েই ভারত লুণ্ঠন করেই ধনসম্পদ নিয়ে এবং ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দিয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছেন, রাজত্ব করতে চেষ্টা করেন নি।

সেই সময়ে অনেক দেশেই যুদ্ধের কৌশল বলতে গেলে কাঁচাই ছিল। স্থায়ী বড়ো সৈন্যবাহিনী তেমন একটা রাখা হতো না। কে কত দ্রুত শক্তিশালী সৈন্যদল সংগঠিত করে প্রতিপক্ষকে আকস্মিক আক্রমণে কাবু করতে পারবে, সেটাই ছিল সেকালের রাজকীয় সমর-কৌশল। অবস্থার গতি-প্রকৃতি বুঝে নিয়ে রাজা বা যুবরাজ হঠাৎ হঠাৎ সৈন্যদের নিয়োগ করে বসতেন এবং জবরদস্তি করে তাদের নিয়ে খামখেয়ালী ভাবেই লুঠতরাজে মেতে উঠতেন। সেই অস্থায়ী সৈন্যদের নিয়েই তাঁরা অনেক সময় প্রতিবেশী রাজ্যে ঢুকে পড়ে জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতেন। আক্রান্ত ব্যক্তিরা যতটা সম্ভব দেয়াল-ঘেরা শহরে ছুটে গিয়ে আত্মরক্ষা করতো। এখানে তারা বহুলাংশে নিরাপদ থাকতো। কিন্তু দুইদেশের মধ্যে হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ পারস্পরিক লাঞ্ছনা

দীর্ঘস্থায়ী হতো। এই ছিল মোটামুটি হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরদিকের দেশগুলোর অবস্থা। আর দক্ষিণ দিকে ছিল বাবরের রাজত্ব।

হঠাৎ তাঁর আত্মচরিত লিখতে আরম্ভ করে বাবর বলছেন, তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে ফারগণার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রারম্ভিক পর্যায়েই তাঁর আত্মচরিতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর রাজকাহিনী বিবৃত করেছেন, অর্থাৎ কী পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাঁকে ঘিরে ছিল তাই দেখাতে চেয়েছেন। এইসব রাজ-রাজড়ার মধ্যে আছেন তৈমুর বেগ, উলু বেগ, বাবর মির্জা, আবদাল লতিফ, আবুসৈয়দ মির্জা, সুলতান হোসেন মির্জা প্রভৃতি এবং তাঁদের লড়াই ও উত্থান-পতনের কাহিনী।

সুলতান ওমর শেখ মির্জা ছিলেন ফারগাণার রাজা। ইনিই বাবরের পিতা। ওমর শেখের রাজ্যের রাজধানী ছিল সমরখন্দে কিম্বা আন্দেজানে এবং ভারতেও তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল কিনা, এ নিয়ে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বাবর দু'বার তাঁর পিতৃরাজ্য সমরখন্দ উদ্ধার করেছেন, আত্মচরিতে এ তথ্য পাওয়া যায়।

১৪৯৩ সালে বাবরের পিতার মৃত্যু হয়, জ্যেষ্ঠপুত্র বাবরের তখন বয়স মাত্র বারো বছর। ঐ বয়সেই রাজাসনে অধিষ্ঠিত হলেন বাবর। সেটা ছিল রমজান মাস (৯ই জুন থেকে আরম্ভ)।

ফারগানা দেশটির আয়তন ছোট, কিন্তু ফলে-ফুলে ও শস্যে ভরা। পশ্চিম ছাড়া বাকি তিন দিকেই পাহাড় মাথা উঁচু করে ফারগানাকে পাহারা দিচ্ছে। পশ্চিমে সমরখন্দ আর খোজেন্দ, আর শুধু এই পথেই বহিঃশত্রুর সুযোগ রয়েছে এ রাজ্যে প্রবেশ করার।

সাতটি জেলা নিয়ে এই দেশ। উত্তর-পূর্ব থেকে প্রবাহিত সেইহুন নদীর দক্ষিণে হচ্ছে পাঁচটি জেলা আর উত্তরে দু'টি। দক্ষিণের জেলাগুলোর একটি হচ্ছে আন্দেজান, কেন্দ্রীয় অবস্থানের জন্যে যার গুরুত্ব ছিল অসামান্য। এই গুরুত্বের দরুণই এটি ছিল ফারগাণার রাজধানী। ফল ও শস্যের বিপুল সম্ভার এদেশে। ফলের মরশুমে ফলের এলাকায় সাধারণত ফল বিক্রী করা হতো না, পথিক যদৃচ্ছই তা খেতে পারতো। এখানকার ন্যাসপাতি ফলের কোনো তুলনা নেই। এখানে পশু-পাখির বসতিও বিস্তর এবং সেই কারণে শিকারীদের সখের জায়গা।

দেশের সকলেই প্রায় তুর্কি এবং শহরে বা বন্দরে এমন কোনো লোক ছিলনা যে তুর্কিভাষা জানতো না।

ফারগাণার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই, গোটা দেশের পার্বত্য এলাকার স্থানে স্থানে সুন্দর গ্রীষ্মাবাস ছিল।

সম্পন্ন ফারগাণার এরূপ সামর্থ্য ছিল যে, দেশের লোকদের ওপর কোনো প্রকার পীড়ন মূলক চাপ না দিয়েও সে তিন-চার হাজার সৈন্য পোষণ করতে পারতো। বাবর আত্মকথার শুরুতেই বলেছেন, ফারগানার আদায়ী রাজস্বে অনায়াসে চারহাজার সেনা রাখা চলে।

বাবরের আত্মকথায় তৎকালীন জীবন ও রীতিনীতির বিচিত্র সব সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন, কারুর মৃত্যু হলে কোনো শিক্ষিত মুসলমান সরাসরি তাকে 'মৃত্যু' বলতো না, বলতো খোদাতাল্লার দয়া লাভ করেছে, খোদাতাল্লার করুণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইত্যাদি। বাবর নিজেও আত্মকথায় তেমনি ভাষায় মৃত্যুকে ও মৃত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। এই দিক থেকে অনুভব করা যায়, আদিতে জীবনদর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তার মধ্যে কোনো মৌলিক ভেদ নেই। কোনো সম্প্রদায়ই মৃত্যুকে চিরকালের শেষ বলে গণ্য করেনা। অতীতের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদই মৃত্যু সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বিচ্ছেদ কালস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। যিনি এই কালস্রোতের নিয়ন্তা, জীবন-মরণ দুই দ্বারেরই তিনি অতন্দ্র প্রহরী, মৃত্যু আমাদের জীবনকে তাঁরই হাতে সঁপে দেয় এবং তিনি তার জন্য যথাযোগ্য ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন।

সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতির মধ্যে বাবরের আত্মকথায় বর্ণিত একটি মজার বিষয় হলো—তুর্কিজাতির মেয়েরা বিয়ের পরে নিজ পরিবারেও কিছুদিনের জন্যে ঘোমটা পরে থাকতো। তারপর হঠাৎ একদিন একটি শিশু এসে বধূর অগোচরে তার ঘোমটা টেনে খুলে ফেলতো, আর তখন থেকে তার মুখমণ্ডল অনাবৃতই থাকতো।

যুদ্ধোদ্ভূত ভয়ঙ্কর শত্রুতা সত্ত্বেও দুই পক্ষ বা দুই দেশের মধ্যে এক ধরণের গণতান্ত্রিক মিত্রতা বা খোলামনের পরিচয় পাওয়া যেতো। যেমন, কোনোস্থান শত্রুর হাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বিজয়ী ও বিজিত দেশের লোকদের মধ্যে নানা রকম বিনিময় হতো, বিজিত দেশের লোকদের বিচিত্র উপহারে জয়ী রাজার শিবির ভরে যেতো। এ বিনিময় যে নিছক ভয় থেকে হতো তা নয়, এর মধ্যে নবাগতের প্রতি আতিথেয়তার একটি মনোভাবও থাকতো। বাবরের কাব্যানুরাগ ও ধর্মবুদ্ধি যে কত প্রবল ছিল, তাঁর আত্মকথায় উদ্ধৃত বিভিন্ন উক্তি তারই পরিচয় বহন করে।

যেমন, সমরখন্দে সুলতান আমেদ মির্জার পঁচিশ বছরের শান্তিপূর্ণ

সুশাসনের পর নতুন যুবরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে জর্জারিত প্রজাকুল, ছোট-বড়ো, ধনী-নির্ধন সকলে মির্জার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিশাপ ও কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে।

আর্ত ও ক্ষুব্ধ এই প্রজাকুলের মনোভাব চারটি পারশি পংক্তিতে বাবর ব্যক্ত করেছেন,—যার মানে হলো :

অন্তর্দাহের ধোঁয়া সম্বন্ধে সাবধান থেকো ;
কেননা, প্রচ্ছন্ন হলেও ক্ষত একদিন বিস্ফোরিত হবেই ;
পার, যদি, একটি চিত্তকেও ক্লিষ্ট করো না ;
দেখছ না, গোটা পৃথিবীকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে
একটি করুণ আর্তনাদই যথেষ্ট।

আর এক জায়গায় বলছেন :

যখন কোনো অন্যায় করেছ,
দুর্দৈব থেকে রেহাই পাবে
এমন আশা করো না ;
কারণ, প্রত্যেক কাজেরই সঙ্গে
রয়েছে তার প্রতিফল।

এই অলৌকিক প্রবণতা এবং সমাজে ও রাজ্যের বিভিন্ন পরিস্থিতি বাবরকে ব্যক্তিগত জীবনেও মিতাচারী করে তুলছিল। তিনি খুব অল্প বয়সেই আহারাদিতে সংযমী হয়ে ওঠেন। তাঁর নিজের কথায়ই রয়েছে—

'আমি নিষিদ্ধ বা সন্দেহজনক মাংস ভক্ষণ বন্ধ করলাম এবং ছুরি, চামচ ও টেবিল-ক্লথ সম্পর্কে সতর্ক হলাম। আমার মধ্যরাত্রির প্রার্থনাও আমি কদাচিৎ বাদ দিতাম।'

আত্মকথায়, বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুন সম্বন্ধে যে সমস্ত টুকরো বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে ভবিষ্যতের এই দ্বিতীয় মুঘল সম্রাটের একটা ছবি. ভারতীয় জনসাধারণের সামনে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

বাবরের আত্মচরিত পাঠে হুমায়ুনকে বীর যোদ্ধা এবং উদার চরিত্রের শাসক বলেই মনে হবে। তবে প্রজার মনোরঞ্জনে উদারতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সময় সময় শাসনকার্যের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতারও আশ্রয় নিতে হয়। বাবর নিজ পুত্র হুমায়ুনকে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখন হুমায়ুনের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ।

বাবর-বাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে দিল্লী অভিযানে। আম্বালা

থেকে যাত্রা করে হুমায়ুনকে বিপুল সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ অংশের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন বাবর। অশিষ্ট ও মূর্খ আফগানদের ব্যবহারে উত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠলেও হুমায়ুন সেনাপতি হয়েই একটি রণাঙ্গণে যেভাবে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেছেন তাতে সে সংবাদ পেয়ে বাবর অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেন এবং পুত্রকে উৎসহিত করার জন্যে একসেট সম্মানের পোষাক, নিজের একটি ঘোড়া এবং কিছু নগদ মুদ্রা পাঠিয়ে দেন। এর পর পিতাকে সম্মান জানাবার জন্যে হুমায়ুন যখন বাবরের শিবিরে একশ'বন্দী ও সাত-আটটি হাতি নিয়ে হাজির হলেন তখন পুত্রের সামনে কঠোরতার একটা দৃষ্টান্ত রাখবার জন্যে বাবর ঐ একশ' বন্দীকে গুলী করে হত্যার আদেশ দেন। এটাই হুমায়ুনের প্রথম যুদ্ধ যাত্রা ও যুদ্ধ বিজয়। হুমায়ুনের হাল্কা বাহিনী সহজেই হিসার-ফিরোজ রাজ্যটি দখল করে নিলে সমস্ত জেলাসহ সে রাজ্যটি ও দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার মুদ্রা বাবর তাঁকে উপহার স্বরূপ দান করেন।

পানিপথের যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুনকে আগ্রার কোষাগার রক্ষায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবর। সেই কোষাগার ও আগ্রায় দুর্গ রক্ষায় অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন পিতৃভক্ত হুমায়ুন। একজনকেও পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। একশ' বছরের হিন্দু রাজ্য গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিৎ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গেই পানিপথের সমরাঙ্গনে নিহত হন। কিন্তু রাজার পরিবারবর্গ ছিলেন তখন আগ্রায়। তাঁরা পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও এবং তাঁদের আটক করা হলেও হুমায়ুন তাঁদের ধনরত্নাদি লুণ্ঠিত হতে দেননি। তাঁরাই স্বেচ্ছায় তাঁদের মৈত্রীভাব ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে অনেক ধনরত্ন ও বহুমূল্য অনেক পাথর হুমায়ুনকে উপহার দেন যার মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন সংগৃহীত প্রায় তিনশ' কুড়ি রতি ওজনের পৃথিবীপ্রসিদ্ধ সেরা হীরকখণ্ড কোহিনুরও ছিল।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবেই বাবরের আত্মজীবনীখানি পাশ্চাত্যের নানা ভাষায় বার বার অনূদিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি বাস্তবিকই ষোড়শ শতাব্দীর একখানি সামরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস হিসাবেই সর্বত্র গণ্য হয়ে আসছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কালের সমাজরূপ

যে সামাজিক কুপ্রথার জন্যে সভ্য জগতের কাছে ভারতকে অশেষ লজ্জায় অবনত হয়ে থাকতে হয়েছে এবং যে ঘৃণ্য ব্যবস্থা রাজা রামমোহনের তীব্র আন্দোলনের ফলে বৃটিশ আমলে লর্ড মিণ্টোর শাসন কালে এক আইন বলে রহিত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ-ধ্বনি তুলেছিলেন মুঘল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর। এই বাদশাহ্ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—

'হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আমি এর আগেই এক আদেশ প্রচার করেছিলাম যে, মৃত স্বামীর সহগমনে ইচ্ছুক হলেও সন্তানবতী জননীদের এভাবে জীবন বিসর্জন দিতে দেওয়া হবে না। এখন আমি পুনরায় এই আদেশ দিলাম যে, কোনো নারীকেই বলপ্রয়োগে স্বামীর সঙ্গে একচিতায় জীবন্ত দাহ করা যাবে না। অন্যদিকে এ আদেশও দেওয়া হলো যে, হিন্দুদের কোনো ধর্মানুষ্ঠান বা অপর কোনো কাজ জোর করে কেউ নষ্ট করতে বা তাতে কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। এরূপ আদেশ দেবার কারণ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাকে তাঁর প্রতিচ্ছায়ারূপে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। দয়া তাঁর অসীম, সমস্ত সৃষ্ট জীবই সমভাবে তাঁর দয়ার অধিকারী। কাজেই বিশাল একটি জাতির উচ্ছেদ সাধন আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায় ও অকর্তব্য। সমগ্র হিন্দু সাম্রাজ্যের সমুদয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সমস্ত শিল্প তাদের দ্বারাই পরিচালিত। তাদের সত্যধর্মে আনতে হলে কোটি কোটি লোককে হত্যা করতে হবে। কিন্তু মানুষের প্রাণ নাশ করা আমার কর্তব্য হতে পারে না।'

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আত্ম-চরিতের পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীখানি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিতা আকবর বাদশাহ্‌র মতোই উদারপন্থী মানুষ ছিলেন জাহাঙ্গীর এবং তিনি সকল ধর্মের প্রতিই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর রাজ্য শাসন প্রণালী, দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং ধর্মীয় পরিবেশ ইত্যাদি বর্ণনার জন্যে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীখানি ভারত ইতিহাস পর্যালোচনায় এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত।

আগ্রা নগরীতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর দ্বি-প্রহরে আটত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনারোহণের ঘটনা নিয়েই সর্বসিদ্ধিদাতা, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর এই আত্মজীবনীখানি লিখতে আরম্ভ করেন। পিতা আকবরের মতোই জাহাঙ্গীরও ছিলেন গভীর ঈশ্বর-

বিশ্বাসী এবং সাধু-সন্ত ও ফকির-দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া দৈব-নির্ভরতা ও শুভ-অশুভ লক্ষণাদির ওপরেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। আত্মজীবনীর 'রাজ্যাভিষেক' অংশে লেখা হয়েছে, 'আমি যেই সিংহাসনে আরোহণ করলাম অমনি সূর্যোদয় হলো। আমি একে অতুলনীয় সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং জয়ের শুভ চিহ্ন বলে গ্রহণ করলাম। এ জন্যেই আমি জাহাঙ্গীর বাদশা (বিশ্ববিজয়ী সম্রাট) এবং জাহাঙ্গীর শা (বিশ্বজয়ী রাজা) উপাধি গ্রহণ করলাম।...আমার রাজ্যাভিষেকের শুভসমাচার চতুর্দিকে ঘোষণা করার জন্যে চল্লিশ দিন ও রাত্রি রাজকীয় বাদকদের বাদ্য বাজাবার আদেশ দিলাম।'

সে সময়ে নতুন সম্রাট তাঁর পিতার সিংহাসন 'অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় ব্যয়ে' সজ্জিত করেছিলেন এবং সেই সিংহাসন তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন ১৬৫ কোটি টাকার মণি-মুক্তো-জহরত ও সোনা দিয়ে আর তা পরিপূর্ণ করিয়েছিলেন দেড়শ' মন সুগন্ধ দ্রব্যে। নতুন সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্যে পিতার নির্দেশে নির্মিত দ্বাদশ কোন যুক্ত রাজমুকুটের প্রত্যেকটি কোনে বসানো হয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের এক একটি হীরকখণ্ড, মধ্যস্থলে ঐ মূল্যেরই একটি মুক্তো এবং ছ'হাজার টাকা করে দামের দু'শটি চুণী। খরচ ও সমারোহের এ সব বিবরণ পড়ে আঁৎকে ওঠারই কথা।

ফকিরাদির ওপর যে কিরূপ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েরই তা জাহাঙ্গীরের 'জন্মকথা' আলোচনা প্রসঙ্গেই আত্মজীবনীর প্রথমাংশে প্রকাশ পেয়েছে। জাহাঙ্গীর লিখেছেন, 'আমার পিতার আটাশ বছর বয়সের পূর্বে যেসব সন্তান হয়েছিল তাদের কেউ এক ঘণ্টা কালের অধিক জীবিত থাকেনি। এতে পিতা সব সময়ই বিষণ্ণ থাকতেন। এই রকম অবস্থায় একদা একজন আমীর সম্রাট আকবরকে আজমীর নগরের এক ফকিরের সন্ধান দিলে সম্রাট তাঁর পরবর্তী সন্তানের দীর্ঘ জীবনের আশায় পদব্রজে সেই শিশুকে নিয়ে আজমীরে গিয়ে ঐ সাধুকে পূজো দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। ছ'মাসের মধ্যে নবজাত শিশুর জন্ম হলে আকবর প্রতিদিন পাঁচক্রোশ পথ হেঁটে আগ্রা থেকে ১৪০ ক্রোশ দূরবর্তী আজমীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, শিশু সন্তানকে বক্ষে নিয়ে তিনি অতঃপর পূর্বোক্ত সাধুর কাছে হাজির হয়ে তাঁকে তাঁর শিশু পুত্রটির দীর্ঘায়ুর জন্যে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর আর ক'টি সন্তান হবে তাও জানতে চাইলেন। সে প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আত্মকথায় লিখেছেন, সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সাধু প্রশ্নোত্তরে জানালেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনার তিনটি

পুত্র-সন্তান হবে। পিতা বললেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথমটিকে আপনার কোলে তুলে দিয়েছি। উত্তরে ফকির বললেন, তার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, আপনি যখন একে আমার কোলে তুলে দিয়েছেন তখন আমার নামেই এই শিশুর নাম রাখলাম মহম্মদ সেলিম।···এই সাধুর সঙ্গে পিতার চৌদ্দ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। পিতা আমাকে কখনো 'সেলিম' বলে ডাকতেন না, সর্বদাই আমাকে 'বাবা' বলে ডাকতেন। হয়তো শেষ জীবন অবধি আমি সুলতান সেলিম নামেই পরিচিত হতাম কিন্তু তুর্কি সাম্রাজ্যের অধিপতিদের সমকক্ষতা লাভের জন্যে আমি জাহাঙ্গীর বাদশা উপাধি গ্রহণ করলাম।'

এর পরের অধ্যায়টি লিখিত হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 'দ্বাদশ আদেশ' নিয়ে। সিংহাসনে আরোহন করেই জাহাঙ্গীর ১৪০ গজ দীর্ঘ ও আশিটি ঘণ্টা-যুক্ত একুশ মণ ভারি স্বর্ণ-নির্মিত এক 'ন্যায়ের শৃঙ্খল' তৈরির নির্দেশ দিলেন এবং তা তৈরি হয়ে গেলে সেটি বেঁধে দেওয়া হলো আগ্রার রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ও যমুনা-তীরবর্তী এক প্রস্তর-স্তম্ভের মধ্যে। এরপরেই ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন সম্রাট যে দ্বাদশ আদেশ ঘোষণা করলেন তা পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে, তখনকার রাজশক্তি জনসমাজের কতটা কল্যাণকামী ছিল।

সম্রাটের বারোটি হুকুমের প্রথমটিতেই প্রজাদের তিন রকমের কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো যা থেকে ষোলো হাজার মণ সোনা রাজস্ব পেতেন আকবর। দ্বিতীয় আদেশে কোথাও চুরি-ডাকাতি হলে অপহৃত বা লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধারে জেলাবাসিগণকে বাধ্য করা হয়েছিল। কোনো অঞ্চল জনশূন্য থাকলে সেখানে নতুন নগর নির্মানে ও প্রজাবর্গকে সর্বপ্রকার উৎপীড়ন ও ক্ষতি থেকে মুক্ত করার জন্যেও সর্ববিধ উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হলো। পরিত্যক্ত স্থানগুলিতে নিরাপদ গমনাগমনের জন্যে জায়গীরদারদের ওপর স্থানে স্থানে রাজকোষের অর্থে মসজিদ পান্থনিবাস ও বিশ্রামাগার ইত্যাদি নির্মানেরও আদেশ দিয়েছিলেন সম্রাট। সওদাগরদের পণ্যদ্রব্যের বস্তা বিনানুমতিতে খোলা বা কোনো দ্রব্যে হাত দেওয়াও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই তৃতীয় আদেশে আরো বলা হয়, সওদাগরেরা তাদের দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ে উদ্যোগী হলেই সেসব বিনা গোলমালে কেনা যাবে। চতুর্থ আদেশ উত্তরাধিকার নিয়ে। তাতে বলা হয়েছে, কোনো বেসরকারী ব্যক্তি সন্তান রেখে পরলোক-গমন করলে তার সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল করা চলবে না, কিংবা তার সন্তানদের ওপর কোনোরূপ উৎপীড়ন করাও চলবে না। কোনো উত্তরাধিকারী না

থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রার্থণাগৃহ নির্মাণে, পুকুর খননে বা অন্য কোনো প্রকার জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হবে এবং তাতে পরলোকগত আত্মার কল্যাণও হবে। এসব আদেশ নিঃসন্দেহে সমাজকল্যাণমূলক।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পঞ্চম আদেশটি ভারতীয় জন সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে আদেশের বিশ্লেষণটিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ঐ আদেশে বলা হয়েছে, কেউ কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করতে বা বিক্রয় করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গেই জাহাঙ্গীর বলেছেন, 'যদিও আমি যোলো বছর বয়েস থেকে মদ্যপান করছি, তবুও আমি এই বিধি প্রবর্তন করছি এজন্যে যে, অতিরিক্ত মদ্যপানে মানুষের সব রকম দুর্বলতা প্রকাশ পায়, শারীরিক শক্তি নষ্ট হয় এবং তা মিথ্যা বাসনার উদ্রেক করে। আমি স্বীকার করছি যে, আমারও এসব দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। মদ্য পানে আমি এত আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এক ঘণ্টা মদ না খেলেই আমার হাতদু'টি কাঁপতে থাকতো এবং আমি বিশ্রামও করতে পারতাম না। প্রত্যহ আমি মদ্যপান করতাম কুড়ি পেয়ালা করে এবং তার প্রতি পেয়ালায় আধ সের করে মদ থাকতো। সময় সময় কুড়ি পেয়ালার বেশিও মদ আমি পান করতাম। কিন্তু অত্যধিক মদ্য পানের কুফল লক্ষ্য করে আমি খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়লাম এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস দেখা দিল যে, এই বদভ্যাস বদ্ধমূল হলে আমার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই সময় থাকতে এ বদভ্যাস ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হলাম। বিশেষ চেষ্টা করে ছ'মাসের মধ্যে মদের পরিমাণ হ্রাস করে দৈনিক কুড়ি পেয়ালার জায়গায় পাঁচ পেয়ালায় নিয়ে এলাম। নিয়ম করে নিলাম, সন্ধ্যার দু'ঘণ্টা আগে মদ্যপান করবো, অন্য সময়ে নয়। কিন্তু ইদানীং রাজ্যশাসনের কাজে আমাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, এখন সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা সেরে আমি মদ্যপানে বসি। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে আমি বলছি, আমার পিতামহ হুমায়ুনের মত আমিও ৪৫ বছর বয়েসের আগেই মদ্যপান একেবারে ত্যাগ করতে পারবো। যে কাজে ঈশ্বর তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, সে কাজ না করতে চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য এবং তা করলেই অনন্ত মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে।' মদ্যপান নিষিদ্ধ করবেন বলে কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর এ অংশটুকু বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ আদেশে যা বলা হয়েছে তাতেও প্রজাহিতৈষী শাসকেরই মনোভাবের

পরিচয় পাওয়া যায়। এ আদেশটিতে জাহাঙ্গীর বলেছেন, 'আমার রাজ্যে কোনো প্রজার গৃহে তাঁর বিনানুমতিতে কেউ এসে জোর করে বাস করতে পারবে না। সৈনিকগণকেও কোনো নগরে এসে সম্মতি নিয়ে ও ভাড়া দিয়ে কারো গৃহে বাস করতে হবে। তেমন গৃহ না পাওয়া গেলে বাধ্য হয়েই তাদের তাবু খাটিয়ে থাকতে হবে। কারণ কোনো অপরিচিত লোক অন্য পরিবারের মধ্যে জোর করে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করলে হয়তো তারা বাটীর ভালো অংশটিই দখল করে বসবে এবং বাড়ির স্ত্রীপুত্রসহ সকলেরই তাতে কষ্ট হবে।' সপ্তম আদেশেও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মানবতাবোধের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। সে আদেশে বলা হয়েছে যে, কোনো অপরাধেই কারো নাক বা কান কাটা চলবে না। চোরকে কাটার চাবুক মারতে হবে কিংবা কোরাণ স্পর্শ করিয়ে তাকে চুরির পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রজার জমি কেড়ে নিতে এবং তাতে চাষবাস করতে ক্রোরী (তৎকালীন রাজস্ব আদায়কারী অফিসার) ও জায়গীরদারগণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে ও অন্য জেলার পালিত পশু বা মানুষকে নিজের জেলায় নিয়ে আসা নিষিদ্ধ করে দিয়ে সম্রাট অষ্টম নির্দেশ জারী করেছিলেন এবং নিজ নিজ জেলার সর্ববিধ উন্নতি বিধানে এবং কৃষি উন্নয়নে অভিনিবিষ্ট থাকতে বলে দিয়েছিলেন। পরের আদেশটি ছিল এরকম—বিষ-নাশক ওষুধ যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা চলবে না। দশম আদেশেও রোগগ্রস্ত প্রজাদের প্রতি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন নতুন সম্রাট আকবর-তনয়। এ আদেশে তিনি বলেছেন, প্রধান প্রধান সমস্ত নগর-শাসককে হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে এবং সে সব হাসপাতালে রুগীদের বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রেখে তাদের সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে হবে। আরোগ্য লাভ পর্যন্ত রুগীদের যাবতীয় ব্যয় দেওয়া হবে রাজকোষ থেকে এবং রোগমুক্তির পর প্রত্যেক রুগীকে কিছু টাকা হাতে দিয়ে বিদায় দিতে হবে। এরকম বিধান কি আজও আমরা আশা করতে পারি?

জাহাঙ্গীরের একাদশ আদেশটিও সামাজিক দিক থেকে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে এই জন্যে যে, পশু সংখ্যা হ্রাস নিবারণের কারণে কতগুলি নির্দিষ্ট দিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। এ কালেও আমাদের দেশের অনেক রাজ্যে সপ্তাহের কোনো এক দিনে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা চালু আছে। এতৎসংক্রান্ত আদেশে সম্রাট জাহাঙ্গীর বলেছেন, 'আমার জন্মমাসে সমগ্র রাষ্ট্রে মাংসাহার নিষিদ্ধ এবং বছরের এমন কতগুলি দিন নির্দিষ্ট থাকবে যে সমস্ত দিনে কোনো পশু হত্যাই চলবে না। আমার রাজ্যারোহণের দিন বৃহস্পতিবার,

সেদিন এবং রবিবার কেউ মাংসাহার করতে পারবে না। যেদিন জগৎ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়েছিল সেদিন প্রাণীহত্যা করা অন্যায়। এগারো বছরের অধিককাল আমার পিতা এ নিয়ম মেনে চলেছেন, এ সময়ের মধ্যে কোনো রবিবারেই তিনি মাংসাহার করেননি। কাজেই আমিও আমার রাষ্ট্রে ঐ দিনটি মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করছি।' এরপর সর্বশেষ অর্থাৎ দ্বাদশ আদেশে নতুন ভারত সম্রাট তাঁর পিতা আকবরের আমলের ছোটবড়ো সমস্ত রাজ-কর্মচারীকে বহাল রাখার এবং বিশেষ গুণীদের উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পরেই জাহাঙ্গীরের ঘোষিত এই দ্বাদশটি আদেশের মধ্যে দিয়ে আমরা শুধুমাত্র তাঁর হৃদয়বত্তা, সুবিচার, সংযম ও প্রজা-কল্যাণ সাধনের মনোভাবেরই পরিচয় পাই না, এতে সে সময়ের সমাজরূপও অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই মুঘল শাসকের প্রজানুরাগ বিষয়ে আরো বিবরণ পাওয়া যায়। আত্মকথার সে অধ্যায়ে জাহাঙ্গীর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ও তাঁর দলভুক্ত লোকদের প্রতিকূলাচরণ এবং গোলমাল ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস সত্ত্বেও সমস্ত রাজকর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন। এর কারণ সম্বন্ধে আত্মকথায় তিনি লিখেছেন, 'সমস্ত ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত এবং প্রজাবর্গ তাঁরই ভৃত্য। সেই প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, তাদের দুঃখ দূর করতে এবং বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করতে আমি বাধ্য। এর অন্যথায় পরলোকে আমার কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।' বর্তমান যুগের শাসক-কুলের মধ্যে এধরণের চিন্তাধারা বিরল।

রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্বগ্রহণ করে জাহাঙ্গীর রাষ্ট্রের সমুদয় বন্দীর মুক্তিও ঘোষণা করেছিলেন। গোয়ালিয়র দুর্গ থেকেই সাত হাজার কয়েদী মুক্তি পেয়েছিল এবং একমাত্র বঙ্গদেশেরই দু'হাজার চার শ' দুর্গ একেবারে বন্দীশূন্য হয়ে গিয়েছিল। গোয়ালিয়র দুর্গের মুক্ত বন্দীদের মধ্যে এমন সব কয়েদীও ছিল যারা চল্লিশ বছর কারাগারে কাটিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙলার দুর্গগুলির বিষয় উল্লেখ করতে হয় বিশেষ কারণে। তখনকার সামাজিক একটা ব্যাধির চিত্র পাওয়া যায় এ থেকে। বঙ্গের দু'হাজার চার শ' দুর্গ নির্মিত হয়েছিল, সে রাজ্যের শাসনকর্তা রাজপুত বীর রাজা মানসিংহের দু'শ'আশিজন পুত্রের দ্বারা। বিদ্রোহী পুত্রগণকে দমন করতে মানসিংহ যুদ্ধ ঘোষণা করলে ছেলেরা একের পর এক দুর্গ নির্মাণ করে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু মানসিংহ অবিরাম চার বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে

পুত্রদের সব দুর্গই তিনি অধিকার করেন এবং সেই যুদ্ধে শুধু একজন ছাড়া সব ছেলেই তাঁর নিহত হন। রাজা মানসিংহকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র ভাউ সিংহকে পাঁচ শ' থেকে পনেরো শ' সৈন্যের অধিনায়কতায় উন্নীত করে দিয়ে সে প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, 'মানসিংহের পনেরো শ' স্ত্রী বর্তমান। তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর দু'তিনটি করে সন্তান জন্মেছিল। কিন্তু একমাত্র ভাউ সিংহ ছাড়া কেউ জীবিত নেই।' রাজাই হোন বা অন্য যেই হোন, ব্যক্তি বিশেষের যে শ' শ' স্ত্রী এবং হাজার সন্তানও থাকতে পারতো সেকালে, এযুগের মানুষের কাছে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার।

ঠিক মানসিংহের মতো এত বেশি সংখ্যায় স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি না থাকলেও আকবর এবং জাহাঙ্গীরেরও ছিল বহুবিবাহ এবং তাঁরাও ছিলেন অনেক সন্তানের জনক। পিতা-পুত্রের মধ্যে আরেক দিকেও খুব মিল ছিল। জাহাঙ্গীরের আত্মকথার বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, বিবি পাঙ্গরাইয়ের গর্ভে আকবরের কুড়ি বছর বয়সে যে প্রথম সন্তান ফতেমা বানু জন্মগ্রহণ করে একবছর বয়সে সে মারা যায়। এরপর বিবি আরামবক্সের গর্ভজাত দুই পুত্র হাসান ও হোসেন জন্মেছিল যথাক্রমে দশদিন ও আঠারো দিনের পরমায়ু নিয়ে। আকবর-পত্নী মিহার সেন্নার কন্যা মিঠি বেগম আটমাস হতেই প্রাণত্যাগ করে। বিবি ক্ষীরার গর্ভজাত আকবর-তনয় সুলতান মুরাদ (ফতেপুরের পর্বতে জন্মেছিলেন বলে অপর নাম পাহাড়ী) ও আকবর-মহিষী যোধবাইয়ের পুত্র শাহজাদা (জাহাঙ্গীরের সহোদর) ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নান বিবির গর্ভেও আকবরের এক কন্যা হয়েছিল, পিতা তার নাম রেখেছিলেন লাল বেগম, সেই কন্যারও মৃত্যু ঘটে জন্মের আঠারো মাস পরেই। শুধুমাত্র মহিষী যোধবাইয়ের পুত্র জাহাঙ্গীর, বিবি সেলিমার কন্যা শাহজাদী খাউনাম (ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণা ও জাহাঙ্গীরের প্রতি অতি যত্নশীল), বিবি মিরিয়ামের পুত্র (জাহাঙ্গীরের শ্বশুর রাজপুত রাজা ভরমল পালিত, অজ্ঞাতনামা) এবং বিবি দৌলতসার গর্ভের কন্যা আরামবানু বেগম যার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আকবর নিজেই জাহাঙ্গীরের ওপর অর্পণ করেছিলেন— সম্রাট আকবরের এ কয়জন পুত্র-কন্যাই বোধহয় অপেক্ষাকৃত একটু বেশি পরমায়ু লাভ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আত্মকথা থেকে সংগৃহীত এ বিবরণের মধ্যেই দেখা যায় যে, আকবর ছিলেন বহু-পত্নীক এবং অনেক সন্তানের জনক।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরের খুবই মিল তাঁর পিতার সঙ্গে এবং আত্মজীবনীতে 'পুত্র-কন্যার বিবরণ' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন যে, রাজপুত সামন্তরাজা ভরমলের কন্যার গর্ভে তাঁর পুত্র খসরুর জন্মকালে তাঁর বয়েস ছিল মাত্র সতেরো বৎসর।

খসরু অপেক্ষা এক বছরের বড়ো এক কন্যা তাঁর প্রথম সন্তান। অর্থাৎ মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি পিতা হয়েছিলেন। কত কম বয়সে সেকালে বিয়ে হতে পারতো, এ তার এক দৃষ্টান্ত। পিতা আকবরের মতো জাহাঙ্গীরেরও বহুসন্তানের অকাল বিয়োগ ঘটেছে। কাসোবার রাজ-পরিবারের কন্যার গর্ভজাত ঔফেৎবানি বেগম তিন বছর বয়সে এবং লাহোরের এক রাজকুমারীর সন্তান দৌলতনিসা বেগম সাতমাস বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে। মাত্র দু'মাস জীবিত থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করে বিবি করমিতির কন্যা বাহারবানু বেগম। রাণা উদয় সিংহের কন্যার গর্ভজাত পুত্র খুরমের (পরবর্তী সম্রাট শাহ্‌জাহান) জ্যেষ্ঠা সহোদরা ও কনিষ্ঠা সহোদরা বেগম সুলতান ও লাজেত-উল্‌-নিসা বেগম যথাক্রমে এক বছর ও পাঁচ বর্ষের বয়সে পরলোক গমন করে। এছাড়া আরো তিন পত্নীর গর্ভজাত তিন কন্যার অকাল বিয়োগের শোকও সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ভোগ করতে হয়েছে। প্রিয় পুত্র পারভিজ ও জাহান্দরের মাতা (জাহাঙ্গীরের কাবুলী পত্নী) সাহেব জমালের কথাও রয়েছে জাহাঙ্গীরের আত্মকথায়। 'আমার চার শ' স্ত্রীর মধ্যে নুরজাহান সর্বশ্রেষ্ঠ', এও জাহাঙ্গীরের নিজের স্বীকৃতি। নুরজাহান বিবি ছিলেন ত্রিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়িকা এবং প্রকৃত শাসনকর্ত্রী।

রাজা মানসিংহ, আকবর ও জাহাঙ্গীরের বিয়ের বহর দেখে এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিবাহে সে যুগের পুরুষদের কোনো অরুচি ছিল না এবং এ যে একটা নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার, এ বোধও তাঁদের ছিল না। বহু সন্তান যে শোক-দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে চিন্তারও অবকাশ ছিল না তাঁদের।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুকালীন পরিবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে, আসন্ন মৃত্যুর পূর্বে পিতার সামনে কলমা (মুসলমানদের মূলমন্ত্র 'ঈশ্বর এক, দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই') পাঠ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ শুরু হলে তিনি জাহাঙ্গীরকে কাছে টেনে নিয়ে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি সামাজিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আকবর শেষবারের মতো পুত্রকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'প্রিয় পুত্র, এবার শেষ বিদায় দাও; কারণ এই পৃথিবীতে আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না। তুমি আমার অন্দর মহলের সমস্ত মহিলাকেই রক্ষণাবেক্ষণ করে যেও এবং নিয়মিতভাবে তাদের মাসিক বৃত্তি দিও। আমার চিরবিদায়ে তুমি শোকার্ত হয়ে পড়বে জানি, কিন্তু আমি তোমায় যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছি সেগুলি বিস্মৃত হবে না আর আমার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাও ভুলে যেও না এবং চিরকাল আমার ভৃত্যবর্গ ও পোষ্যদের

পালন করো। এ পর্যন্ত আমি তোমায় যে সব উপদেশ দিয়েছি তার প্রত্যেকটির মূল্য চিন্তা করে কাজ করবে, আমাকে বিস্মৃত হবে না।'

পিতার আদেশ-উপদেশ জাহাঙ্গীর যতদূর সম্ভব রক্ষা করেই চলেছেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের ক'দিন পূর্বেই পৌত্র খসরুর পক্ষীয় আমীরদের ষড়যন্ত্র বরবাদ করে দিয়ে আকবর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীরকেই 'সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী' ঘোষণা করে বলে যান, "আমাদের বংশের চিরপ্রথা এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসন লাভ করে। বাঙলা-দেশের শাসনভার আমি খসরুকে অর্পণ করলাম।'

এই সিংহাসন প্রাপ্তিকে নিতান্তই ঈশ্বরের করুণা বলে মনে করতেন জাহাঙ্গীর। আত্মকথায় সে প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমার পিতার মৃত্যুকালে রাষ্ট্রের বেশির ভাগ আমীরই আমার বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করে খসরুকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিল। আসলে খসরুকে নামে মাত্র সম্রাট করে তারাই সাম্রাজ্য শাসনের সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর আমার পক্ষে থাকায় আমারই জয় সূচিত হলো। এই রাজমুকুটটি আমি কোনো মানুষের সাহায্যে লাভ করিনি। যে অজর, অমর ভগবান আমার হাতে এই গুরু কর্তব্যভার অর্পণ করেছেন, আমার সমুদয় শাসনকার্যে এবং অনাথ, অসহায় ও দরিদ্রদের রক্ষণাবেক্ষণে এবং প্রতিপালনে তাঁর সাহায্যই আমি প্রার্থনা করব, তাঁর দিকেই সবসময় আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, আত্মীয় পরিজন কিংবা সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নয়—এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

সম্রাট জাহাঙ্গীর আজীবন তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রাখার চেষ্টা করেছেন। পুত্র বলে বিদ্রোহী খসরুকে দমন করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ রাত দ্বিপ্রহরে কুচক্রীদের প্ররোচনায় পিতার স্নেহময় ভবন ও বিশ্বস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে পাঞ্জাবের দিকে খসরুর পলায়নের খবর পেয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আমীর-ওল-ওমরাহকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে তা উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'যদি বিনাযুদ্ধে এর কোনো মীমাংসা না হয় তা হলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যেন যুদ্ধই করা হয়। সাম্রাজ্য রক্ষায় পুত্র-মিত্র আত্মীয়-স্বজন কেউ আপন বলে বিবেচ্য নয়। হাজার পুত্র ও পরিজনের চেয়ে সম্পর্কহীন বিশ্বস্ত লোকের মূল্য অনেক বেশি বলে আমি মনে করি। প্রভুর স্বার্থে যে সর্বস্ব ত্যাগেও কুণ্ঠিত নয়, সে যথোপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত হবার যোগ্য। আর পুত্র হয়েও যে পিতার অতুলনীয় স্নেহ ও অযাচিত করুণা বিস্মৃত হয়ে পিতার প্রতি কর্তব্য পালনে

বিমুখ হয় সে পুত্র পরিচয়ের অযোগ্য। তাকে অপরিচিত বলেই ধরে নিতে হবে। এ পুত্রই (জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু) আমার উত্তরাধিকারী ও সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রক্ষাকর্তা, কিন্তু সে যেরূপ অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে উদ্যোগী হয়েছে, তাতে তাকে আমার আত্মজ ও উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা চলে না। সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও শান্তি শৃঙ্খলার জন্যে পুত্রের বিদ্রোহাচরণ দমন অবশ্যই করণীয়। নিজ কর্তব্য ভুলে যে পুত্র বিপথে চলতে শুরু করেছে তাকে কোনো দায়িত্ব ভার দিলে জগদীশ্বরের কাছে আমি অপরাধী বলে গণ্য হবো এবং তিনি আমাকে যে কর্মভার অর্পণ করেছেন তা সুসম্পাদিত হবে না।'

সম্রাটের এই নির্দেশ পেয়ে আমীর-ওল-ওমরাহ্ খসরুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা খুররমকে (পরবর্তী কালের সম্রাট শাহ্‌জাহান) সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করলে জাহাঙ্গীর নিজে সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাই সাম্রাজ্যের সমস্ত আমীর-ওমরাহ্ আর মনসবদারদের মধ্যে তাঁর নিজের চল্লিশ হাজার অশ্ব ও একলক্ষ উষ্ট্র বিতরণ করে তাঁদের রণক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও অশ্বপৃষ্ঠে সদলবলে রওনা হয়ে গেলেন। পথে সংবাদ পাওয়া গেল, ত্রিশ হাজার অনুচর নিয়ে খসরু পাঞ্জাবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। 'খসরুর বিদ্রোহাচরণ' অধ্যায়েই পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ম্রিয়মাণ জাহাঙ্গীর লিখেছেন, 'আমার হতভাগ্য এই পুত্র কী ভীষণ কষ্টের মধ্যেই না এখন দেশ-দেশান্তরে পলায়ন করে বেড়াচ্ছে, তা ভেবে বুক ভেঙে যাচ্ছে।'

একদিকে পিতৃ-হৃদয়ের এই গভীর বেদনাবোধ এবং অন্যদিকে পুত্রের অনুশোচনার সংবাদ এ অধ্যায়টিকে যথার্থই মর্মস্পর্শী ও আকর্ষনীয় করে তুলেছে। মথুরা নগরীতে তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলের যথেচ্ছ অত্যাচার দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে খসরু নাকি বলেছিলেন, 'কোন্ পাপের পথে আমি এলাম! আমার সঙ্গীদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আমার পিতাকে পর্যন্ত আমি ত্যাগ করলাম।···আমার এতখানি অধঃপতন হয়েছে যে, পিতৃ-প্রজাবর্গের ওপর নিপীড়নকারী এসব দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদেরও দমন করতে আমি অক্ষম।' পুত্রের এই বিলাপোক্তির খবর জেনে জাহাঙ্গীরের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তার ভারি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে আত্মকথার ঐ অধ্যায়ের শেষাংশে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি অনুতপ্ত হয়ে হতভাগ্য খসরু আমার কাছে আসতো আমি তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে তার পূর্বগৌরব ও সম্মানে স্থাপন করতাম। আমি যে তাকে মার্জনা করতাম, এ সে নিশ্চয়ই

জানে। আমার পিতার অসুস্থতার সময়ে সে একবার আমার বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু পরে সে জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করেছিলাম।'

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর অপরিসীম ঈশ্বর-নির্ভরতার বর্ণনা এমন ভাবে তাঁর আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছেন যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সর্বপ্রকার বিরোধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্বেও তিনি যে সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের অধিকার লাভ করেছিলেন তা একান্তভাবেই ঈশ্বরানুগ্রহে, এ তিনি গভীর ভাবেই বিশ্বাস করতেন। 'আকবরের মৃত্যু' শীর্ষক অধ্যায়ের শুরুতেই জাহাঙ্গীর লিখেছেন, 'পিতার অসুস্থতার সময়ে কয়েকজন দুর্দান্ত আমীর আমার বিরুদ্ধাচরণ করলেও ঈশ্বর অনায়াসেই হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমাকেই অর্পণ করেন।'

রোগ শয্যায় শায়িত পিতার পরিচর্যায় রোজ বিকেলে দু-তিন ঘণ্টা করে কাটাতেন জাহাঙ্গীর। কিন্তু খসরুর সিংহাসন-দাবীর সমর্থক রাজা মানসিংহ ও মির্জা কোকা প্রমুখ আমীরেরা রুগ্ন পিতার কক্ষে জাহাঙ্গীরের যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন নানা প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। কিন্তু এইসব ষড়যন্ত্রকারী আমীরদের নিরাশ করে দিয়ে আকবর রোগশয্যা থেকে একদিন ঘোষণা করলেন, 'সেলিম আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ; কাজেই সে-ই সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কারণ আমাদের বংশের চিরকালীন প্রথাই এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসন লাভ করে থাকে। খসরুকে আমি বাঙলাদেশের শাসনভার দিয়ে গেলাম।' এই ঘোষণার পর আমীরেরা একে একে সবাই এসে জাহাঙ্গীরের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। শেষ সময় উপস্থিত বুঝতে পেরে আকবর তাঁর আমীরদের তাঁর কাছে উপস্থিত করার আদেশ দিয়ে পুত্র জাহাঙ্গীরকে বলেছিলেন, 'সুদীর্ঘকাল ধরে যারা আমাকে সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাহায্য করেছেন এবং আমার গৌরবের অংশীদার হয়েছেন, তাঁরা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।' ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর আমীরবর্গ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলে সম্রাট আকবর তাঁদের যে কয়টি কথা বলেছিলেন কবি জাহাঙ্গীর পিতার সে কথা কয়টি কবিতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যার উপসংহারে বলা হয়েছে—

আজ শেষ দিনে এই ভিক্ষা মাগি আমি
তোমাদের কাছে—প্রার্থনা করিও মোর
আত্মার কল্যাণে প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়।

আমার সমাধি পরে করো বরিষণ

এক বিন্দু প্রেম-অশ্রুকণা !

*　　*　　*　　*

এ দেহ-পিঞ্জর ভেঙে আত্মা মোর চলে যেতে চায়

ধরণীর দুঃখ ত্যাগি, পেতে চায় অনন্ত বিশ্রাম !

এর পরেই আত্মকথায় জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে পিতার মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে তিনি পুত্রের শেষ কর্তব্য হিসাবে পিতৃ-পদযুগল ধারণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এবং তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে এলে পিতা তাঁর নিজের প্রিয় তরবারি 'ফতাউল-মূল্ক' (সাম্রাজ্য বিজয়ী) তাঁকে অর্পণ করেন এবং তাঁর কণ্ঠদেশে বাহুবেষ্টন করে এমন কতকগুলি উপদেশ দেন সামাজিক দিক থেকে যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সে সমস্ত চিরবিদায়কালীন পিতৃ-উপদেশ আলোচনায় পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রতি আকবর তাঁর বক্তব্য শেষ করে ধীরে ধীরে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন সদর জাহানের মুখে মুসলমান সমাজের মূলমন্ত্র কলমা পাঠ শুনতে শুনতে।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ভালো করে পাঠ করলে দু'টি বিষয় বিশেষ করে মনে গেঁথে যায়। একটি তাঁর গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ও প্রকৃত সাধু-দরবেশদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপোষণ এবং অপরটি রাজধর্মের প্রধান অঙ্গ হিসাবে প্রজা-কল্যাণ সাধনে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ। এই মুঘল সম্রাটের ঈশ্বর নির্ভরতা ও ফকির-দরবেশ ভক্তির কথা পূর্বেই কিছু কিছু আলোচিত হলেও বার্ধক্যে উপনীত হবার পর তাঁর মনে যে সমস্ত মহৎভাব দেখা দিয়েছে, আত্মকথার 'আত্মচিন্তা' অধ্যায়ে সংক্ষেপে তা অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে জাহাঙ্গীর বলেছেন, 'ঈশ্বর যাঁকে মহিমান্বিত রাজশক্তির অধিকারী করেছেন, তাঁর প্রধান কাজ অত্যাচার, অবিচার ও লাঞ্ছনা থেকে প্রজাদের রক্ষা করা। এ একেবারে সত্যি কথা যে, 'বিলাস-মত্ত হয়ে এবং পার্থিব সুখে এ কর্তব্য কখনো আমি বিস্মৃত হইনি।' একথা যে কতটা আন্তরিক তা প্রমাণের জন্যে আত্মকথা থেকেই অনেক উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া যেতে পারে। একথা ঠিক, খসরুর বিদ্রোহ দমনে, কাবুলের দস্যু দলনে এবং রাজপুত ও মগ বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে অসংখ্য লোকের প্রাণহননের কারণ হতে হয়েছিল জাহাঙ্গীরকে, তা হলেও একথা তিনি যথার্থই বলেছেন, 'নিজ স্বার্থসাধনে কিংবা কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে কখনো আমি নিষ্ঠুর আচরণ করিনি।'

এ বিষয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর নিজের ধারণা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এই

বলে, 'ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীকুলের সুখ-সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না রেখে যদি আমি কাজ করতাম, তা হলে নিকৃষ্টতম অত্যাচারী শাসক বলেই আমাকে পরিচিত হতে হতো!'

মানুষের দুঃখকষ্ট নিবারণে সম্রাট জাহাঙ্গীর যে কতদূর সচেতন ছিলেন তাঁর সিংহাসন অধিরোহন কালের ঐতিহাসিক 'দ্বাদশ-আদেশ'-এর মতো জনকল্যাণ-মূলক আরো কয়েকটি আদেশ ও কিছু মন্তব্যেও তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। খসরুর বিদ্রোহ দমনের পর আগ্রায় ফিরে আসার সময় জাহাঙ্গীর যেসব নির্দেশ জারী করেছিলেন সে প্রসঙ্গে আত্মকথায় তিনি লিখেছেন 'লাহোর থেকে আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথে চারদিকের জমিদারবর্গকে রাস্তার দু'পাশে এবং প্রত্যেকটি নগর, গ্রাম ও আমার বিশ্রামের স্থানগুলিতে তুঁতগাছ ও অন্যসব বড়ো বড়ো গাছ রোপণের আদেশ দিলাম। এতে গ্রীষ্মের দাবানল থেকে শ্রান্ত পথিকেরা রক্ষা পাবে বলেই এমনি আদেশ দেওয়া। আগ্রা থেকে লাহোর অবধি পথে প্রতি দুই ক্রোশ অন্তর একটি করে ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত মজবুত পান্থশালা প্রতিষ্ঠারও আদেশ দেওয়া হলো এবং তার প্রত্যেকটিতে থাকবে একটি করে স্নানাগার ও একটি করে পুকুর। প্রস্তাবিত পান্থশালাগুলি দেখাশুনা করার জন্যে আমি কতকগুলি কর্মচারীও নিয়োগ করে দিলাম। কর্মরত পথিকদের কাজে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে জন্যে প্রত্যেক নদীতে লোক যাতায়াতের পথে সেতু নির্মাণেরও আদেশ দিলাম। এভাবেই আগ্রা থেকে বাঙলাদেশ—এই ছ'মাসের পথেও সর্বত্র বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে এবং পান্থশালাও নির্মিত হয়েছে। সেই সকল গাছ এখন বড়ো হয়ে গেছে, ক্লান্ত পথিকজনেরা সে সব গাছের ছায়ায় এখন বিশ্রাম লাভ করে থাকে। এদিকে আমার অনুরাগ লক্ষ্য করে ধনপতিরা আমার অনুগ্রহ লাভের জন্যে পথের পাশে নানাস্থানে বিবিধ রকমের পুষ্পোদ্যান তৈরি করে দিয়েছেন। এখন যারা আমার এই বৃহৎ সাম্রাজ্য সফর করবেন তাঁদের কোনোরূপ অসুবিধায় পড়তে হবে না।'

এ ধরণের সুযোগসুবিধা প্রজা সাধারণের জন্যে করে দেওয়ার আগ্রহ প্রত্যেক শাসকেরই থাকা উচিত বলে সম্রাট জাহাঙ্গীর মনে করতেন। তাই তিনি আত্মকথায় লিখেছেন, 'আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি, ইহকালের সুগতির জন্যে এরূপ কার্যকলাপই সঙ্গত।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, "রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে রাজাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে, তাঁর পরামর্শদাতাগণকে নয়। যাঁর হাতে রাজদণ্ড ও মাথায় রাজমুকুট, তিনি যদি প্রজাবর্গের সব সুখ-দুঃখের-

বিষয়ে অবহিত থাকেন, তাহলে তা কতই না ভালো হয়! এমনি কর্তব্য পরায়ণ কর্ণধার থাকলে সাম্রাজ্যের প্রজাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার শীঘ্রই হতে পারে।'

অতীতের এক ভারত-সম্রাটের এইসব বক্তব্য আজকের ও ভবিষ্যতের ভারত শাসকদের অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। প্রজারঞ্জন ও জনসাধারণের দুঃখকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা করাই প্রত্যেক সরকারের প্রধান কর্তব্য। সেদিক থেকে এ ধরণের এক একখানি আত্মজীবনী শাসকদের কাছে পথনির্দেশক স্বরূপ।

মুঘল যুগের একটি করুণ চিত্র

কবি বায়রণের যৌন-জীবন সীমাহীন অসংযমের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেটাই যে ছিল সেকালের ইংল্যাণ্ডের তথা ইয়োরোপের অনেকটা যুগরীতি, তাও অস্বীকার করা চলে না। কাজেই শুধুমাত্র সেই কারণেই যে বায়রণের আত্মচরিতের মতো একখানি অমূল্য গ্রন্থকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তা নয়, অনেকে মনে করেন এর পিছনে কোনো বড়ো ষড়যন্ত্র আছে। সে যাই হোক না কেন, ফল একই—বায়রণ-পাঠকদের তাঁর আত্মজীবনী পাঠের সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকতে হলো।

কোনো কিছু ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেওয়ার এই বিপদ। সম্রাট শাহ্‌জাহান-নন্দিনী কবি জাহানারা বেগমের আত্মকাহিনীও সম্পূর্ণ না হলেও তার অনেকাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এও কম দুঃখের কথা নয়।

আগেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষে মুঘল যুগে সম্রাট পরিবারের লোকজনদের মধ্যে আত্মজীবনী রচনার একটা রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল। সে সব আত্মকাহিনী যেমনি নিজের এবং পারিবারিক ইতিহাস ও সমকালীন সংস্কৃতির পরিচয়সূত্র হিসাবে গণ্য, তেমনি লেখক বা লেখিকার সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার এক একটি দর্পণরূপেও সেগুলি বিবেচিত।

জাহানারার আত্মকাহিনী রচনার পটভূমিকাটি বড়ো মর্মস্পর্শী। সম্রাট শাহ্‌জাহান পক্ষাঘাতগ্রস্ত। পত্নীবিয়োগকাতর রুগ্ন সম্রাটের সেবায় প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। মায়ের মৃত্যুর পর মুঘল রাজ-অন্তঃপুরে জাহানারাই হয়ে উঠেছিলেন সর্বেসর্বা অর্থাৎ 'বাদশাহ বেগম' এবং রাজকার্য পরিচালনায় স্বয়ং সম্রাট এবং যুবরাজ দারা বহু বিষয়েই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। চার ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ দারার সঙ্গে ছিল তাঁর অনেক মিল। উদারতায়, চিন্তায় এই দুই ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে মিল থাকায় এঁদের সৌহার্দ্য যেমন গভীর হয়ে উঠেছিল, তেমনি কুচক্রী তৃতীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁদের উভয়েরই বিরোধের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছিল।

দাক্ষিণাত্যের সুবেদার আওরঙ্গজেব যেমনি ধূর্ত তেমনি বিচক্ষণ। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় এবং জাহানারাও দারার সহায়। কাজেই অবিলম্বে প্রতিরোধে উদ্যোগী না হলে দারাই সম্রাট হয়ে বসবেন, এই চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন আওরঙ্গজেব। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং আশা ও আশ্বাস দিয়ে তিনি বাঙলার সুবেদার জ্যেষ্ঠ সুজাকে এবং গুজরাটের সুবেদার কনিষ্ঠ মুরাদকে বশীভূত করবার পর দারার সমুদয় বিরুদ্ধ-শক্তিকে সুসংহত করে নিলেন। এ কাজে

তিনি সহযোগিতা পেলেন তাঁর প্রিয় ভগ্নী রোশন-আরার। জাহানারাকেও নানা প্রলোভন দেখিয়ে এবং হঠকারিতায় হাত করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সম্রাটের অসুস্থতার সুযোগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনভাই তাঁদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে বাঙলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য থেকে রাজধানী দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য দিল্লীর মসনদ ও ভারত সাম্রাজ্য। দারার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো। এদিকে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ ও পঙ্গু পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করলেন। পিতার পরিচর্যায় সেখানেও জাহানারাই তাঁর সঙ্গিনী। একের পর এক পুত্র ও পৌত্রাদির মৃত্যুর এবং হত্যার সংবাদ অসহায় শাহ্‌জাহান কিভাবে গ্রহণ করছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে তাঁকে নিঃসন্দেহ করবার জন্যে দারার ছিন্নমুণ্ড যখন আওরঙ্গজেব পিতার কাছে পাঠালেন তখনই বা কী অভাবনীয় মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, সে সবেরই নীরব সাক্ষী হতভাগিনী জাহানারা। প্রিয় সহোদরের ছিন্নমুণ্ড দেখে তিনিও শিউরে উঠলেন। সবই যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। তাঁর জীবনেরও সমস্ত আশাভরসা ধূলিসাৎ। একাকিনী নিজের কাছেই নিজের যত দুঃখের কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, লেখা হতে লাগলো 'জাহানারার আত্মকাহিনী'।

'জাহানারার আত্মকাহিনী'র প্রথম স্তবকেই বলা হয়েছে যে আওরঙ্গজেব পিতার ক্ষমতা অধিকারের এক বছরের মধ্যেই এই আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন শাহ্‌জাহান-নন্দিনী জাহানারা। সে কথাই তিনি লিখেছেন, 'এখনো এক বছরও পেরোয়নি আমাদের যে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আজও যেন আমি দেখতে পাচ্ছি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুবরাজ দারার যুদ্ধযাত্রা।' তার পরেই হৃদয়-বিদারক ভাষায় দারার পরাজয়ের কথা লিখেছেন লেখিকা এবং কঠিন-কঠোর ভাষায় অভিসম্পাত দিয়েছেন নিষ্ঠুর সুচতুর বিজয়ী নতুন সম্রাট আওরঙ্গজেবকে। আগ্রার দুর্গে দারার পরাজয় সংবাদ প্রচারিত হলে, জাহানারা লিখেছেন, 'আমি আকুলভাবে কেঁদেছি, কেবল কেঁদেছি। সে কান্না আমার আজো শেষ হয়নি। কী ভীষণ দুর্ভাগা আমার এই ভাই! তাঁর নামোচ্চারণও পর্যন্ত আমি করতে পারিনি।' একটু পরে দারাকে সম্বোধন করেই তিনি লিখেছেন, 'যুবরাজ দারা! তুমি ছিলে অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত, সম্রাট আকবরের মৈত্রী-মিলনের সুর ধ্বনিত হতো তোমার অন্তরে।'

কী সেই মৈত্রী-মিলনের সুর? সেই কল্যাণ-বার্তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে জাহানারার লেখনী মুখে তাঁর আত্মকাহিনীর সপ্তম স্তবকে। সেখানেই একস্থানে বলা হয়েছে, 'এক সময়ে এই ফতেপুর-শিকরীই ছিল ভারতের হৃদ্‌পিণ্ড স্বরূপ আর আমার সামনের এই ক্ষুদ্র প্রাসাদটি ছিল যেন ফতেপুর-শিকরীর প্রাণ যেখানে মহামতি আকবর তাঁর ব্রাহ্মণ-বন্ধু বীরবলের সঙ্গে বাস করতেন। এখানে এসে বাদশাহ হুমায়ুনের শিবিরের কথা আমার মনে পড়ে গেল যে শিবিরে আকবরের জন্ম হয়েছিল।'

এর কিছু পরেই আত্মকথায় জাহানারা লিখেছেন, 'কল্পনায় দেখছি, বাদশাহ আকবর অতীতের মতোই তাঁর বিচারাসনে—অত্যন্ত বিনম্র ও বিনীত রাজশ্রী। কিন্তু তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ দৃষ্টিতে অত্যাচারী মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং নিপীড়িত জনেরা আশ্রয়ের আশ্বাস পায়। আত্মার দীপ্তি তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত। এই বিদেশাগত বংশীয় রাজকুমারের (সম্রাটের) রাজ্যসীমা সহস্র যোজন ব্যাপ্ত—পূর্বে ঢাকা নগরী ও পশ্চিমে কাবুল, উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণে আহম্মদনগর। এই বিশাল রাজ্যের প্রজাবর্গের কল্যাণে কীরূপ সতত চিন্তা তাঁর!·· হৃদ্‌পিণ্ড থেকে শিরা যেমন সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে, অমাত্যগণ তেমনি দেশ শাসন করতেন সম্রাটের আদেশ নিয়ে। সম্রাট আকবরের অভিপ্রায়—আমার প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র নামে নিবেদিত হোক, এই ইচ্ছা নিয়েই সম্রাট সমস্ত অংশগুলিকে সংহত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। সূর্যের আলো যেরূপ পাতার শিরায় শিরায় বৃক্ষে প্রাণরস সঞ্চারিত করে, আকবরও তেমনি সমগ্র রাজ্যের প্রতি অংশে প্রাণশক্তি প্রবাহিত করেছেন। রাজ্যের প্রজাবর্গ তাই বিশ্বপালক বিষ্ণুর স্থলবর্তী প্রতিপালক আকবরের প্রতি কৃতজ্ঞ অর্ঘ্য উৎসর্গ করতো। জিজিয়া কর তুলে দিলেও সম্রাটের রাজকোষ পূর্ণই ছিল।'

সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী আকবরকে এত বড়ো করে দেখিয়েছেন জাহানারা যে তাঁকে বিশ্বপালক বিষ্ণু দেবতার সঙ্গে তুলনা করতেও তাঁর মোটেই বাধেনি। এমন কি আকবর-তনয় জাহাঙ্গীরও পিতাকে আত্ম-জীবনীতে এতখানি উঁচুতে স্থান দেননি। এর পরেই জাহানারার চিন্তা স্রোতে ভেসে আসছে তাঁর সম্রাট পিতা শাহ্‌জাহান যিনি তাঁর পূর্ব-গৌরবের ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন থেকেও সত্যি যেন একটি পিঞ্জরে আবদ্ধ!

এমনভাবে জাহানারা তাঁর স্মৃতিচারণ করে চলেছেন তাঁর আত্মকথায় যা পড়তে পড়তে এক এক স্থানে মনে হয় লেখিকা যেন কোনো স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। একের পর এক মহল পেরিয়ে ফতেপুর

শিকৃরীর মূল প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলে জাহানারার মনে হলো, ও যেন একটি সুমধুর কাব্য। ঐ প্রাসাদই ধর্মসমন্বয়ী আকবরের শিল্পসমন্বয় প্রয়াসেরও সাক্ষ্য, বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য রীতি অনুসরণে নির্মিত ওর পাঁচমহল। সেই পাঁচমহলের স্মৃতি স্মরণ করে জাহানারা লিখেছেন, 'আমি অভিভূত অবস্থায় প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। প্রথম কক্ষে আমি দীন্-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের শিষ্যদের দেখতে পেলাম যাদের মধ্যে অনেককে আগেই আমি দেওয়ান-ই-খাসে দেখেছিলাম।' আকবর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য অতঃপর বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছে, সম্রাট আকবর মানুষকে সংসার ত্যাগ করার উপদেশ দেননি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতো। প্রথম স্তরের নির্দেশ অনুযায়ী ইলাহী-শিষ্যগণকে তাদের যাবতীয় পার্থিব বস্তু সম্রাটকে সমর্পণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হতো। সম্রাটের জন্যে প্রাণত্যাগের প্রস্তুতির নির্দেশ ছিল দ্বিতীয় স্তরে। এক এক তলে এক এক স্তরের নির্দেশ ছিল শিষ্যদের লক্ষ্য করে। দ্বিতলের ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ জাহানারাকে একদিকে সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ অমাত্য-বর্গের কথা এবং অন্যদিকে তাদের শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শৈশব-স্মৃতি প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন, 'আমরা ভাই বোনরা তো (দ্বিতলের) এই প্রাঙ্গণেই শৈশবের খেলাধূলা করেছি। সেদিনগুলির কথা আমার স্পষ্টই মনে পড়ে। কেমন করে দারা শেকো একদিন একটি ময়ূর পুচ্ছ উষ্ণীষে পুরে নিয়ে বার বার মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে 'রাজা রাজা' খেলছিলেন, আওরঙ্গজেব প্রাসাদের কোনে বসে বসে কি রকম মালা জপছিলেন আর তাঁর ছোট ছোট বোনেরা কি ভাবে গোলাপী পোষাক পরে স্তম্ভের চারদিকে লুকোচুরি খেলতো, সেই বর্ণনা দিয়ে জাহানারা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা তখনো শিশু—ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা কেউ আমরা তখন চিন্তা করিনি।'

আর যেন স্মৃতি রোমন্থন করতে পারছিলেন না জাহানারা। তাই অতীত ও বর্তমানকে বিস্মৃত হবার জন্যে দ্বিতল থেকে ত্রিতলে তিনি চলে গেলেন তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন কাঁপতে শুরু করেছিল বলে। যে আত্মসম্মান মানুষের কাছে প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান সেই আত্মসম্মান সম্রাটকে নিবেদন করতেন ইলাহী-শিষ্যগণ এই তৃতীয় স্তরে। ত্রিতলেই জাহানারার দেখা হয়ে গেল অতুলনীয় সেই চিত্রশালা যেখানে ভারতের নানা প্রান্তের ইলাহী-শিষ্যরা আমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হয়েছিলেন, পৃথিবীর নানাদেশের জ্ঞানী-গুণীরাও যেখানে এসেছিলেন —গজনীর মতো বিশ্ববিশ্রুত এই নগরীর এমনি ছিল খ্যাতি। ঐ ত্রিতলে রক্ষিত গ্রন্থাগারের বর্ণনায় জাহানারা লিখেছেন, 'সেখানে রয়েছে বাদশাহ বাবর

কর্তৃক ইরান থেকে ভারতে আনীত অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত পাণ্ডুলিপি—ইতস্ততঃ ছড়ানো তৈমুরের রত্নরাজি। সম্রাট আকবরের ভারত সাম্রাজ্য থেকে তো বটেই পারস্য, আরব, গ্রীস ও প্যালেস্টাইন থেকে সংগৃহীত কাব্য ও দর্শনাদি এত গ্রন্থের সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে যে আকবরের পূর্বে বা পরে কোনো সম্রাটের পক্ষেই এমনি বিরাট সংগ্রহ করা আর সম্ভব হয়নি।' এই গ্রন্থাগারের দু'খানি গ্রন্থ বিষয়ে জাহানারা বিশেষ উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মকথায়। তার মধ্যে প্রথমটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তৈমুরের জীবন ও বিধান বিষয়ক একখানি সুঅলংকৃত পুস্তক যাতে তৈমুর নিজে একস্থানে লিখেছেন, 'নিজ স্বার্থে কখনো আমি আমার আত্মীয়তার বন্ধন বা দানের মর্যাদা নষ্ট হতে দিই নি এবং আত্মীয় স্বজনদের হত্যা বা শৃংখলিত করতে আদেশ জারী করিনি।'

আত্মজনদের প্রতি এতটা দয়াপ্রবণ হলেও তৈমুরের ধ্বংসোন্মত্ততা তুলনাহীনই বলা চলে। সেই তৈমুর বংশেরই সন্তান আকবর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জাহানারা তাই আত্মচরিতকথায় লিখেছেন, 'সম্রাট আকবর রাজ্যজয় করার জন্যে তৈমুরের মতো দেশের পর দেশ ধ্বংস করে বেড়াননি। আকবর চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষ তার সুপ্রাচীন ভিত্তির ওপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোক, দিল্লীর চারপাশে তৈমুরের বংশধরেরা শান্তিকেন্দ্র স্থাপন করুক।'

দ্বিতীয় যে বইখানি জাহানারা ঐ গ্রন্থাগারে তাঁর 'অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন' করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন 'সর-ই-আমরার' (উপনিষদের সারসংগ্রহ) বা বেদের জ্ঞানকাণ্ড, শাহজাদা দারা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এইতো দীন-ই-ইলাহী শিষ্যের যোগ্য কাজ। এই গ্রন্থেই দারা সম্রাট আকবরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।' সে ঘটনা স্মরণ করে তাঁর দারা ভাইয়ের জন্যে আল্লাহর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন জাহানারা এবং চারতলায় দ্বাদশ স্তম্ভের কক্ষে চলে গেলেন যে চতুর্থ স্তরে বাদশাহের ধর্মানুসরণ করতে হতো দীন-ই-ইলাহী শিষ্যদের।

এরপরে কতকটা যেন স্বপ্নাবেশের মতোই জাহানারা লিখে গিয়েছেন কিছু উপলব্ধির কথা যাতে একস্থানে বলা হয়েছে, 'এই বিশ্বে অলক্ষ্য কতগুলি শাশ্বত বিধান আছে আর আছে স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে এমন একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ ভাষায় যা অবর্ণনীয়। এ বিষয়ে সম্রাট আকবরের উপলব্ধির সঙ্গে আমার উপলব্ধি অভিন্ন। সেই বিরাট এক, সেই একের পরে আর কিছু নেই।'

অতঃপর সম্রাটের সিংহাসনের জন্যে নির্ধারিত পঞ্চমতলার কথা বলে

জাহানারা তাঁর আত্মকথার সপ্তম স্তবক শেষ করেছেন। পঞ্চম তলার ঐ সিংহাসনে সমাসীন হয়েই আকবর নগর পরিদর্শন করতেন।

আত্মকাহিনীর অষ্টম স্তবকেও জাহানারা আকবরের অনেক মহিমা কীর্তন করেছেন। তাঁর মনের মতো মানুষ না হলে যে তৈমুর তাদের মানুষ বলেই মানতেন না, আরেকবার সেই তৈমুরের সঙ্গে তুলনা করে আকবর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'সম্রাট আকবর অর্থ বা তরবারির সাহায্যে কাউকে তাঁর ধর্মমতের দিকে টানতে চাননি। তিনি মনে করতেন, সব ধর্মেই কল্যাণবুদ্ধির মানুষ আছেন। প্রত্যেক দেশেই অলৌকিক শক্তির মানুষও আছেন। যিনি কোনো মহাপুরুষকে অনুসরণ করেন, তিনি সেই মহাপুরুষেরই সমকক্ষ। নরমুণ্ডের পাহাড়ের ওপর দিয়ে রচিত হয়েছিল তৈমুরের পথ আর সম্রাট আকবরের সামনে প্রজারা উপস্থিত হতেন অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে এবং প্রার্থনার সুর ধ্বনিত হতো তখন তাদের কণ্ঠে।'

সকল শ্রেণীর প্রজাদের কথাই ভাবতেন আকবর। সে জন্যেই তিনি যোগীদের জন্যে যোগীপুরা, দরিদ্রদের জন্যে খয়রাত পুরা এবং বারাঙ্গনাদের জন্যে শয়তানপুর নামে আবাস তৈরি করে দিয়েছিলেন যেগুলি তিনি নিজে পরিদর্শন করতেন। এ বিষয়ে জাহানারা একস্থানে লিখেছেন, 'অনাথ আশ্রমের চারদিক ঘিরে রয়েছে ক্ষুধিত মানুষেরা। যোগীদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল অন্য আশ্রম। আমি কল্পনায় দেখলাম, আমিও যেন তাঁদেরই একজন। প্রতি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশের সমস্ত অংশ থেকে সাধু-যোগীরা এসে সমবেত হতেন এই যোগী আশ্রমে। সম্রাট আকবরও আসতেন এবং তিনি সাধুদের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করতেন।'

সেই মহান আকবরকেও কিভাবে তাঁর পরম প্রিয় পুত্র যুবরাজ সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেই জাহাঙ্গীর-তনয় সম্রাট শাহ্‌জাহানকে কী মর্মান্তিক পরিবেশে যে বন্দী অবস্থায় আগ্রাদুর্গে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তার অতি করুণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন শাহ্‌জাহান-কন্যা মাতৃহীনা জাহানারা পঙ্গু ও বন্দী পিতার সেবায় যিনি শেষ পর্যন্ত আত্মনিযুক্ত ছিলেন। মহামতি আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয় ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনাদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী জ্যেষ্ঠপুত্র দারাই হবেন পরবর্তী সম্রাট, বৃদ্ধ বাদশাহ শাহ্‌জাহানের সেই ছিল আকাঙ্ক্ষা এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে ভগিনী জাহানারাও ছিলেন দারার একান্ত অনুরক্ত ও নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ তৃতীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। এই কারণেই 'জাহানারার আত্মকাহিনী' পাঠে দারার জন্যে বিলাপে

আমাদের মন যেমন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তেমনি মন বিষিয়ে ওঠে আওরঙ্গজেবের নির্দয়তার নানা কাহিনী পড়ে। আত্মকথার প্রথম স্তবকেই জাহানারা আওরঙ্গজেবকে সম্বোধন করে লিখছেন, 'আওরঙ্গজেব! তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হতভাগ্য দারাকে পদদলিত করেছ, তাঁকে নিরীশ্বরবাদী অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছ। আওরঙ্গজেব! কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদেরও তুমি গোয়ালিয়র দুর্গে আফিঙের বিষ খাইয়ে হত্যা করেছ। মিলনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন বাদশাহ আকবর আর ধ্বংসের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছ তুমি। তোমায় আমি এই অভিশাপ দিচ্ছি, পিতার প্রতি তোমার ব্যবহারের কথা কখনো তুমি ভুলতে পারবে না। সারা জীবন ধরে তোমার ছায়া তোমাকে পেছনে ফেলে চলবে এবং তোমায় ভুল পথে চালিত করবে। পবিত্র কোরাণের কোনো বাণীই তোমায় ছায়ার আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি দেবে না।'

চিরকুমারী জাহানারার এই অভিসম্পাত থেকে বাস্তবিকই কখনো মুক্তি পাননি ঘৃণ্যষড়যন্ত্রকারী ও ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেব। উৎকোচ দিয়ে সিংহাসনের এবং অন্যান্য নানা রকমের লোভ দেখিয়ে ভাই ও ভগ্নী রোশন-আরা প্রভৃতি অন্য বহুজনকে বশীভূত করে ক্ষমতা করায়ত্ত করলেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পক্ষে স্বস্তিলাভ কখনো সম্ভব হয়নি। বার বার সে কথারই উল্লেখ রয়েছে জাহানারার স্মৃতিচারণে। তিনি তাঁর আত্মকথার প্রায় উপসংহারে এসে লিখেছেন, যতদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের একজন সন্তানও মুঘল রাজবংশে জীবিত থাকবে ততদিন আওরঙ্গজেবের স্বস্তি নেই। তাই দু'বছরের মধ্যে সমস্ত মুঘল বংশীয় কুমারদের বন্দী করা হলো এবং তাদের হত্যা করা হলো গোয়ালিয়র দুর্গে।' এমন কি নিজ পৌত্র সুলতান মহম্মদকেও আওরঙ্গজেব বিষাক্ত 'পপী'র সরবৎ পান করাতে দ্বিধা করেন নি, কারণ তাঁর সেই পৌত্রের ছিল তীব্র আত্মসম্মানবোধ। আত্মকথায় আরো লিখেছেন জাহানারা, 'আমার সহোদর আওরঙ্গজেব প্রায়ই পিতাকে পত্র লিখতেন। কিন্তু বৃদ্ধ সম্রাট কখনো আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করতে পারেন নি। কারণ, একদিন যে দারার ছিন্নমুণ্ড তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিল, তা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। তারপরে সেই ছিন্নমুণ্ড আগ্রা দুর্গের বিপরীত দিকে তাজমহলে প্রোথিত করা হয়েছিল।' কী মর্মন্তুদ! মানুষ কতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে আওরঙ্গজেব যে তার প্রধান দৃষ্টান্ত জাহানারার আত্মকাহিনী পড়তে পড়তে সেটাই বার বার মনে হয় এবং ভারতাত্মার অবমাননার জন্যে পাতায় পাতায় লেখিকার বেদনা প্রকাশ পায়।

জাহানারা ও রোশন-আরা দুই বোন। অথচ দুইজনে কী পার্থক্য! একজন

ন্যায়-ধর্ম ও দারার পক্ষে, অন্যজন আওরঙ্গজেবের ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রের মূল সহায়। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-বিনিময় হতো রোশন-আরার। সে সব পত্রের ওপর নির্ভর করেই আওরঙ্গজেব তাড়াতাড়ি তাঁর ন্যায়নীতি-বহির্ভূত চক্রান্তজাল বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন।

যাইহোক, জাহানারার আত্মকাহিনীতে মুঘল রাজবংশের ভ্রাতৃবিরোধের ষড়যন্ত্র ও কদর্য হানাহানির বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের সামাজিক অবস্থার বিবরণও যেমন কিছু কিছু পাওয়া যায়, তেমন মানব-কল্যাণের কিছু কিছু কথাও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেখানে।

দারাই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন, অনেকদিন পর্যন্ত জাহানারা সেই আশাই পোষণ করতেন ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত থেকে। তাইতো তিনি পরিত্যক্ত ফতেপুর শিক্রী সম্বন্ধে লিখেছেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করলে তিনি আবার ফতেপুরে সম্রাট আকবরের ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশ পুনঃপ্রবর্তন করবেন, জুম্মা মসজিদে পুনরায় প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হবে, জ্ঞানপিপাসু তরুণেরা গবেষণাগারে নক্ষত্রমণ্ডলী পরীক্ষা করবে এবং রাজপ্রসাদ আবার প্রেমমুখর হয়ে উঠবে। সেই চিন্তা থেকে জাহানারার মন চলে গেল সোন্‌হারা (সোনার) প্রাসাদের দিকে, সেখান থেকে অন্তঃপুরে মহিলা মহলে। তা ভাবনায় আসতেই তিনি লিখলেন, 'শুনেছিলাম, সম্রাটের অন্তঃপুরে পাঁচ হাজারেরও বেশি মহিলা বাস করতেন। এখনো আমি শুনতে পাচ্ছি, ঐ ক্ষুদ্র প্রাসাদটিতে একটি ঘোষণা ধ্বনিত হচ্ছে, 'এক ঈশ্বর, এক স্ত্রী।' যে পুরুষ এক স্ত্রীর বেশি কামনা করে সে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। এই ছিল সম্রাট আকবরের শেষ জীবনের উপলব্ধি। ফতেপুরে আমাদের জয়লাভ ঘটলে আমি ঐ সোন্‌হারা প্রাসাদে একলিঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো।' ভারতীয় মন্দির-সৌন্দর্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো জাহানারাকে। তাঁর একটি কথায় তা চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং সেখানে হিন্দু দর্শনের এক পরম তত্ত্বও যেন ভাষা পেয়েছে! তিনি বলেছেন, 'মনে হয় এশিয়ার কল্পনা-জগৎ এসে যথার্থ রূপ পেয়েছে আকবর বাদশাহ্‌র হিন্দু রাজ্যে। সমস্ত সৌন্দর্যই যেন সে জগতে ঈশ্বরের চরণে এসে মিলিয়ে যায়। ঈশ্বরের বাইরে অন্য কোনো কিছুরই যে সত্তা নেই!'

কুমারদেবীর সুন্দর চিত্র দেখে এবং সেই রাজপুত নারীর কাহিনী শুনে (যে রাজকুমারকে তিনি স্বামীত্বে বরণ করেছিলেন পিতা তাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ না করে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করলে বিয়ের যাত্রাপথে কুমারদেবী নিজে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিন্নকরে তাঁর পিতৃ-নির্বাচিত বরের পিতাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই লিখে

এই ছিল আপনার পুত্রবধূ! অপর হাতখানি অন্য এক সৈনিক দিয়ে ছিন্ন করিয়ে সেটি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিজের পিতাকে এবং তারপর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।) বিস্ময়াবিষ্ট জাহানারা বলেছেন, 'হঠাৎ আমার মনে হলো, সম্রাট আকবরের এই অন্তঃপুরে আমি এক বহিরাগতা। আকবর বৃথাই চেষ্টা করেছিলেন মুঘল ও হিন্দুস্থানের রক্ত সংমিশ্রনের। হিন্দুস্থান হিন্দুরই রয়ে গেল। এই তো হিন্দুস্থানের নারী, স্বামীর সঙ্গে চির মিলনের আশায় যে অকুণ্ঠ চিত্তে জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে পারে। সে কোনো বিদেশিনীকে তার সুখের অংশভাগিনী হতে দিতে নিশ্চয় রাজী হবে না, তাকে ঘৃণা করবে এবং তার সঙ্গে কখনো এক চিতাশয্যায় প্রাণ দিতে যাবে না। তার স্বামীর সন্তানের জননীতো সে-ই, সে যে তাকে ঘৃণা করবে সে তো স্বাভাবিক।' এ-পর্যন্ত লিখেই ভগ্নমনোরথ জাহানারা কান্না শুরু করলেন এবং বললেন যে, মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আর কোনোদিন অমন করে কাঁদেন নি। তার পরেই চিত্রাধারটি খুলতেই আর একটি চিত্র তাঁর চোখে পড়লো যাতে ছিল, 'একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহস্র গোপিনীর কাছে একাকী উপস্থিত। যে তাঁকে যেভাবে পেতে চান তাঁর কাছেই তিনি সেভাবে গিয়ে থাকেন'—এ তারই চিত্র।

পরে জাহানারা আকবরের রাজকবি তথা সেকালের অদ্বিতীয় কবি ফৈজী ও তাঁর ভ্রাতা উজীর আবুল ফজলের মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। সম্রাটের পরম বন্ধু ও দীন-ই-ইলাহীর মূল সমর্থক হলেও এ দুই ভাই কখনো অনুগ্রহ প্রার্থী হন নি আকবরের কাছে। ফৈজী এমন একজনের (মিথ্যা বলায় রাজরোষে কর্মচ্যুত ধর্মান্ধ বাদায়নী) জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন সম্রাটের কাছে, যে ব্যক্তি ফৈজীর ও আবুল ফজলের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করতেন। সেই লোকটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে ফৈজী আকবরকে বলেছিলেন, 'সিংহাসনের চারধারে যে সব শুদ্ধ আত্মা ঘুরে বেড়ায়, যে সব সাধুসজ্জন জননী বসুধার স্তব গান করেন তাঁদের নামে আমি এই প্রার্থনা নিবেদন করছি।' তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর হয়েছিল। কী অপূর্ব! আর অপূর্ব গ্রন্থকার আবুল ফজল সম্পর্কে কি লিখেছেন জাহানারা? তিনি বলছেন, 'আবুল ফজল প্রচার করেছিলেন—ভারতের বহু ঈশ্বরের ওপরে রয়েছেন এক পরমেশ্বর যিনি সমস্ত মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও পালক।...এখানে সমস্ত বিবাদের বীজ নষ্ট হয়ে শান্তির পুষ্পোদ্যান রচিত হবে।' সব ধর্মে সব ভাষায় একই ঈশ্বর-বন্দনা ধ্বনিত হয়ে থাকে, আবুল ফজলের এইতো কথা। তিনি সাধু-সন্তদের দর্শন করে বেড়াবেন মঙ্গোলিয়ায়, লেবাননে—এমনি ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু নিজ প্রভুকে অর্থাৎ সম্রাটকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে বরণ

করে নেওয়ায় তিনি তাঁর সর্বাধিক প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন আর তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে প্রিয় শাহজাদা সেলিম (পরবর্তী কালের জাহাঙ্গীর) তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর সেই শোকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন সম্রাট আকবর, আবুল ফজলকে তিনি এমনি ভালো-বাসতেন।

এমনি কত আনন্দ ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী স্থান পেয়েছে 'জাহানারার আত্মকাহিনী'তে। মুক্তাবিন্দুর মতোই সেখানে স্থানে স্থানে ঝরে পড়েছে চিরকুমারী জাহানারার অপূর্ব প্রেমকথা, রাজপুত নরনারীর বীরত্ব ও সতীত্ব গাথা।

শোককাতর শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর পরে আরো চৌদ্দবছর কাল আগ্রা দুর্গে বন্দিনী-জীবন যাপন করতে হয়েছে জাহানারাকে। সেই অখণ্ড অবসরে কেবলই স্মৃতি রোমন্থন চলেছে তাঁর। চলেছে স্মৃতির পর স্মৃতি সংযোজন। হঠাৎ একবার তাঁর মনে হলো, এ জীবন অসার। 'আত্মকাহিনী'র কিছু অংশ নিজ হাতেই তিনি নষ্ট করে ফেললেন। পরে অবশ্য মত পরিবর্তিত হলে সমস্ত বিচ্ছিন্ন অংশকে কোনোরকমে সংযোজিত করে জাহানারা তাঁর আত্মকথার পাণ্ডুলিপি ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেবার জন্যে 'জেসমিন প্রাসাদে'র পাষাণতলে চাপা দিয়ে রাখলেন।

তারপরে দু'শ বছর কেটে গেছে। এক বিদেশিনী আন্দ্রিয়া বুটেনশন ১৮৮৬ সালে আগ্রা দুর্গের এক শিলাতল থেকে উদ্ধার করলেন সম্রাট নন্দিনী জাহানারার সেই অমূল্য স্মৃতিকথা। ইংরেজি ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি সেই পরম সম্পদ তুলে দিয়েছেন সারা পৃথিবীর মানুষের হাতে। মাঝে মাঝে অনেক পৃষ্ঠার হদিস না পাওয়া গেলেও এমন কাব্যরসমণ্ডিত সুখপাঠ্য আত্মজীবনী গ্রন্থ সত্যই বিরল।

'জাহানারার আত্মকাহিনী'তে দারা শিকোর শিরশ্ছেদের বর্ণনাটি বড়োই মর্মন্তুদ। শক্তিমান দারা, অতিথি বৎসল ও পরোপকারী দারা এবং জাহানারার মতোই হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীতে বিশ্বাসী দারা পরাজয় বরণের পর নিতান্ত অপমানিত অবস্থায় একজন সাধারণ বন্দীর মতো রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তাঁর সেই অবস্থা দেখে রাস্তার দু'পাশের পথিক সাধারণ অশ্রু সংবরণ করতে পারছে না। বিজয়ী আওরঙ্গজেবের আদেশে বন্দী দারার বিচার হবে। জনতা সে ভাবনায় আকুল।

দারার বিচার শেষ হলো। 'মূর্তিপূজা ইসলাম বিরোধী'। কিন্তু দারা

মূর্তিপূজার বিরোধী নন, এই অপরাধে তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ হলো। সে আদেশ কার্যকর করতে ঘাতক উদ্যোগী হতেই দারা চিৎকার করে বলেছিলেন, 'মহম্মদ আমার প্রাণ হরণ করছেন, ঈশ্বরের পুত্র আমায় জীবন দান করেছেন।'

জাহানারা তাঁর এই আত্মকাহিনীতে নতুন সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতার দিকটাই যে দেখিয়েছেন তাই নয়, তাঁর দুর্বলতার দিকগুলিও একের পর এক ঘটনার উল্লেখ করে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

দারার প্রথমা স্ত্রী নাদিরা বেগম স্বামীর পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু ঘাতকের হাতে দারার প্রাণ দেবার পর তাঁর অপর দুই পত্নীর দিকেই আওরঙ্গজেবের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। তিনি দু জনকেই আহ্বান জানালেন তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতে। জর্জিয়া দেশের খৃষ্টান-কন্যা উদীপুরী বেগম তাতে রাজী হলেন, কিন্তু রুখে দাঁড়ালেন দারার নর্তকী স্ত্রী রাণাদিল। জাহানারা অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রাণাদিলের সেই কাহিনীকে।

'আওরঙ্গজেব রাণাদিলকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে বললে, রাণাদিল পত্রোত্তরে জানতে চাইলেন কেন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। আওরঙ্গজেব বললেন, তিনি তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আবার রাণাদিলের প্রশ্ন, কেন কি পেয়েছেন সম্রাট তার মধ্যে? সম্রাট উত্তর দিলেন, 'তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম আমাকে মুগ্ধ করেছে।' রাণাদিল তাঁর কেশদাম পাঠিয়ে দিলেন সম্রাটকে। আওরঙ্গজেব তাতে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তিনি বললেন, 'তোমার রূপে আমি মুগ্ধ।' রাণাদিল অস্ত্র দিয়ে তাঁর মুখ ক্ষতবিক্ষত করে রক্তসিঞ্চিত কাপড় সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে রূপের পিপাসায় সম্রাট তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন তা তাঁর আর নেই।'

আওরঙ্গজেব অন্তত একজন নারীর কাছে এভাবে পরাজয় স্বীকার করলেন।

তবু বুঝি জাহানারা মানুষের ওপর শেষ বিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। তাঁর আত্মকাহিনীর শেষে এক জায়গায় তিনি লিখছেন, 'আমি যদি কখনও কারামুক্ত হই এবং আওরঙ্গজেব যদি কখনও আমার উপদেশ চান, তাহলে আমি তাঁকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উপদেশে দেব। তাঁর নির্যাতিত শত্রুদের মধ্যে অনেকেই আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় ছিল। তাদের হয়ে আমি আওরঙ্গজেবকে বলবো, রাজ্যলাভের আশায় আর রক্তপাত করোনা। দানবের দুর্গ মনে করে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করো না। বিজয়ী ইসলাম স্ফূর্ত হয়ে উঠুক জ্ঞানের আলোকে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় শকট পরিচালিত করো না।'

শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর কাহিনীটিকে পড়ে পাঠকের চক্ষু সজল হয়ে উঠবে। জাহানারা লিখছেন, 'আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। একটি আলোকশিখা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেই আলোকশিখা অদৃশ্যলোকে আবার জ্বলে উঠবে। পিতার দেহ নিয়ে গেছে সেই শ্বেতমর্মর প্রাসাদে যেখানে আমার মাতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সমাধিতে দুজনের জন্যে আলো জ্বলে উঠবে, দুজনের জন্যেই কোরাণ আবৃত্তি করা হবে।' প্রজাকুল স্নেহময় সম্রাটের শব দেখে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে ভয়ে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে দিনের আলো দেখা না দিতেই বিনা সমারোহে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, জাহানারা অতি দুঃখে বেদনার্ত ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন।

জাহানারা নিজেকে পরম দুর্ভাগিনী হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যাঁর হৃদয় রাজ্য মহামূল্যবান মানবিক রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, তিনি কিভাবে দুর্ভাগিনী হতে পারেন?

কোমল করুণ স্বভাবের জাহানারার জীবনেও প্রেম এসেছিল। সে প্রেম তাঁর জীবদ্দশায় চরিতার্থতা লাভ করতে পারেনি। জাহানারাও কখনো জীবনে দ্বিতীয় অপর পুরুষের প্রেম গ্রহণ করেননি বা আর কাউকে প্রেম নিবেদনও করেননি। দুলেরা তাঁর প্রেমিক। শাহ্‌জাহানের বিশ্বস্ত রাজপুত সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রশাল এই দুলেরা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। জাহানারা দুলেরার সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, 'দেওয়ান-ই-আম'-এর সঙ্গীত নিস্তব্ধ, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এক করুণ সুর। মনে হচ্ছে যেন রক্তগোলাপের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে দুলেরার সঙ্গীত। সঙ্গীতের ছন্দের শিহরণ এই দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে আমার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছোয়। আমি দুলেরার নাম দিয়েছি রাজা। দুলেরার বাহুপাশে আমি উত্তেজনাকে আনন্দ মুহূর্ত বলে কল্পনা করেছিলাম……আমি ভয়ে শিউরে উঠছি, আমার কল্পলোকে পৌঁছোবার আগেই যদি আমার রূপ ম্লান হয়ে যায়, তখন তো আর সেই বেগম জাহানারা থাকবো না। আমার প্রিয়তমের হৃদয়রাণী হয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত শেষ করতে পারবো না। ভাগ্যদেবীর পানপাত্র পান করেছি আমি আকণ্ঠ।'

এমনি সব টুকরো টুকরো কথা 'জাহানারার আত্মকাহিনী'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে শীতের নিস্তব্ধ সকালের অজস্র উজ্জ্বল শিশির বিন্দুর মতো।

নিজের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি-সজ্জা কিরূপ হবে সে নির্দেশ সুফী চিস্‌তী-

শিষ্যা, শাহ্‌জাহান-কন্যা জাহানারা নিজেকে ক্ষণভঙ্গুর ও বিনতা বলে ঘোষণা করে পারস্য ভাষায় একটি ছোট্ট শ্লোকে লিখে রেখে গেছেন। জাহানারার সমাধির ওপর লেখা সেই শ্লোকটি ঐ সম্রাট-দুহিতার সারল্য, উদারতা ও নির্মলতার পরিচয় বহন করে চলেছে। জিলকদা, ১০৯২ হিজরী অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রচিত জাহানারার ঐ শ্লোকটি বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়—

আমার সমাধি'পরে অন্য কোনো
আচ্ছাদন আস্তরণ নয়,
চির-অবনতা আমি আমার সমাধি-শয্যা
তৃণগুচ্ছে যেন ঢাকা রয়!

এ বাস্তবিকই তুলনাহীন।

শুদ্ধিপত্র

১।	রবার্ট সাদে ১৮০৯ সালে সর্বপ্রথম 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটি ব্যবহার করেন। (পঞ্চম প্যারার তৃতীয় লাইন)	৪ ও ১৫	পৃষ্ঠায়
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (প্রথম প্যারার প্রথম লাইন)	১৮	"
৩।	স্বভাবসিদ্ধ (প্রথম প্যারার পঞ্চম লাইন)	২০	"
৪।	অনাসক্ত (শেষ প্যারার প্রথম লাইন)	২২	"
৫।	কণিষ্কের পর বাশিষ্ক (দ্বিতীয় প্যারার চতুর্থ লাইন)	২৯	"
৬।	রচয়িতা (দ্বিতীয় লাইন)	৩৩	"
৭।	জার্মাণ পণ্ডিত ওয়েবার (তৃতীয় প্যারার দ্বিতীয় লাইন)	৩৩	"
৮।	জাতুকর্ণী-তনয় (চতুর্থ প্যারার চতুর্থ লাইন)	৩৮	"
৯।	মহাবীর চরিত (দ্বিতীয় প্যারার ষষ্ঠ লাইন)	৩৯	"
১০।	অমাত্যগণ (শেষ লাইন)	৪২	"
১১।	দর্দুরক (তৃতীয় প্যারার চতুর্থ লাইন)	৪৩	"
১২।	ধূর্ত (চতুর্থ প্যারার তৃতীয় লাইন)	৪৩	"
১৩।	নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ (তৃতীয় প্যারার নবম লাইন)	৫৭	"
১৪।	স্মার্ত তিলক (তৃতীয় প্যারার সপ্তম লাইন)	৫৯	"
১৫।	১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ (দ্বিতীয় প্যারার দশম লাইন)	৬০	"
১৬।	গৌরববোধ (দ্বিতীয় প্যারার ষষ্ঠ লাইন)	৬১	
১৭।	আবির্ভূত (চতুর্থ প্যারার দ্বিতীয় লাইন)	১০৯	